ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি

এক জীবন্ত কাহিনি

লেখক – মহেশ ভাট

অনুবাদক – ডঃ সব্যসাচী গুহ

ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি – এক জীবন্ত কাহিনি
মহেশ ভাট
ভাষান্তর – ডঃ সব্যসাচী গুহ
U G Krishnamurti
Ek Jibanto Kahini
Mahesh Bhatt
Translated by Dr. Sabyasachi Guha

প্রথম প্রকাশ – ২০১১

প্রকাশক
ছায়া পাবলিকেশন, কলকাতা

সম্পাদনায়
রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
১৫, দেশবন্ধু নগর রোড,
হিন্দমোটর, হুগলি–৭১২২৩৩, পঃ বঙ্গ, ইন্ডিয়া।
চলভাষ–৯৮৩৬৬৪৪৩৪৭

প্রচ্ছদ
শ্রীসোমনাথ পাল

প্রচ্ছদে এবং পুস্তকে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলি
জুলি ক্লার্ক থেয়ার–এর সৌজন্যে প্রাপ্ত

মূল্য টাকা

ভাষান্তরের নেপথ্যে

আমার আধ্যাত্মিক সাধনা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার পর আমার মা ঁসুলেখা দেবী ভয় পেয়েছিলেন। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারালে আমাদের অমঙ্গল হতে পারে এই ধারণা এবং মায়ের মমতা ছিল সেই ভয়ের কারণ।

ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি–র জীবনকথা ইংরেজি বই থেকে পাঠোদ্ধার করার মতো ইংরেজি ভাষার জ্ঞান মায়ের ছিল না – তাই আমি এই বই অনুবাদ করি – মাকে পড়ানোর জন্য। মা'র এবং ইউ জী–র মৃত্যুর পর আমি হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি আমার প্রিয় বন্ধু রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জির হাতে তুলে দিই। রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতায় গভীর আগ্রহ এবং নিরলস পরিশ্রমের পরিণতি এই পুস্তক। এছাড়া স্বপন মজুমদার, শুভাশিস ভট্টাচার্য (বুবু), পার্থকৃষ্ণ ঘোষ, তাপস চক্রবর্তী, সঙ্গীতা চক্রবর্তী, শঙ্কর চক্রবর্তী, দীপঙ্কর ঘোষ, উৎপল চক্রবর্তী, কমল পাল এবং রজত পাল বিভিন্নভাবে একাজে সাহায্য করেন। পিনাকী চক্রবর্তী গভীর আগ্রহের সঙ্গে ডিটিপি এবং প্রিন্টিং সম্পর্কিত সমস্ত কাজে সাহায্য না করলে হয়তো এ বই এ রূপ পেত না।

– সব্যসাচী গুহ

সূচিপত্র

ভূমিকা vii-xiii

প্রথম খণ্ড

সাক্ষাৎকার ৩

বাল্যকাল ২০

থিওসফিস্টদের মধ্যে জীবনকাল ৩৩

মুখোমুখি ৫৭

লন্ডনের পথে পথে ৮১

শেষ সময় ৯৭

কী সেই অবস্থা? ১০৬

বিপত্তি ১১৪

পরবর্তী ফল ১৩১

পরবর্তী বছরগুলো ১৪১

কখনোই শেষ না হওয়া গল্প ১৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড

কথোপকথন ১৭৭

তৃতীয় খণ্ড

মৃত্যুর স্বাদ ২৪৫

ভূমিকা

"মানব জাতিকে শোনাবার মতো কোনও
বাণী আমার নেই"
– ইউ জী

'আবার আমার জীবনী লেখা কেন?' বলেছিলেন ইউ জী, যখন আমি প্রথমবার তাঁর জীবন কাহিনি লেখার আগ্রহ প্রকাশ করি। "আমাকে বলুন কীভাবে আপনি একজনের জীবনী লিখতে চান যে সবসময় বলছে গল্প লেখার মতো তার জীবনে কিছুই নেই। যদি আমার জীবনী কোনওদিন লেখা না হয় তাহলে পৃথিবীর অবস্থার কোনও অবনতি ঘটবে না। যাঁরা জীবনী পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পান এবং উপকৃত হন, তাঁরা এই বই পড়ে খুবই হতাশ হবেন। আমার জীবনের মধ্যে তাঁরা যদি এমন কিছু খোঁজার চেষ্টা করেন যার প্রয়োগে তাঁদের জীবনে উন্নতি ঘটবে, তাহলে আগে থেকে একথা বলে রাখা ভালো যে সে সবের কোনও সম্ভাবনাই নেই। আমার জীবনকে আপনি অবশ্যই বাচ্চাদের ছড়া "সলোমান গ্রান্ডির" ধাঁচে মিলিয়ে দিতে পারবেন। সংক্ষেপে আমার আপনার এবং অন্য সমস্ত লোকের জীবনের একই গল্প। এর বেশী কোনও জীবনীর মধ্যে আর বিশেষ কিছুই থাকে না।"

'আপনি কি, ইউ জী?' আজ থেকে দশ বছর আগে খাবার টেবিলে বসে এ প্রশ্ন করেছিলেন চুরাশি বছর বয়স্কা সুইজারল্যান্ডবাসী প্রবীণা ভদ্রমহিলা ভ্যালেন্টাইন ডি কারভীন। গত কুড়ি বছর ধরে এই ভদ্রমহিলা ইউ জী–র সর্বক্ষণের সাথী। তাই এ প্রশ্ন শুনে আমরা সবাই সেদিন তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। কারণ ভ্যালেন্টাইনের প্রশ্ন ঠিক একই প্রশ্ন যা অন্য সবাই জিজ্ঞাসা করেন

যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে আসেন। আমার সঙ্গে ইউ জী–র পরিচয় হওয়ার পেছনে যে বন্ধুর সবচেয়ে বেশী অবদান সেই বন্ধুও বছরের পর বছর ধরে একই সমস্যার সমাধান করার প্রচেষ্টা করে চলেছে, 'কে' এবং 'কি' এই ব্যক্তি যাঁকে সবাই ইউ জী বলে জানে। প্রতি পদক্ষেপে তার সমস্ত প্রচেষ্টা বারবার বিফল হয়েছে। হতাশ হয়ে অবশেষে সে একদিন 'ইচিং'–এর শরণাপন্ন হয়েছিল। যে উত্তর সে পেয়েছিল সেদিন তা ছিল এরকম ঃ

তিনি গুরু নন, পূজারী নন, শিক্ষক নন। তাঁর অন্যকে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত করানোর কোনও ইচ্ছা নেই এবং বস্তুত তাঁর কোনও কিছু করারই কোনও ইচ্ছা নেই। প্রবল জীবনশক্তি সহযোগে তিনি প্রজ্বলিত, দীপ্তিমান, কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্য বিহীন। আপনার জীবন যেমন তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্যর্থ, তাঁর জীবনও আপনার অনুপস্থিতিতে ঠিক তেমনই নিরুদ্দিষ্ট। তাঁর আলো যেমন আপনার দ্বারা প্রতিফলিত না হলে হারিয়ে যায়, ঠিক তেমন তাঁর আলো ছাড়া আপনার জীবনও অন্ধকার। আমি এর সঙ্গে আরও একটু যোগ করে বলতে পারি যে তাঁর জীবনশক্তিকে কোনওভাবেই একজন ভগবত বাক্য প্রচারকের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

১৯৬৭ সালের ৯ জুলাই সুইজারল্যান্ডের সানেন উপত্যকায় তাঁর ৪৯তম জন্মদিনে ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির মৃত্যু ঘটেছিল। কি ছিল এই মৃত্যুর কারণ? কি তাঁকে পুনরায় জীবিত করে তুলেছিল? ''আমি জানি না। আমি সেই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না। কারণ যে সত্ত্বার অভিজ্ঞতা লাভ হয় আমার মধ্যে তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। সেই মৃত্যুকে জানার মতো কোনও সত্ত্বাই সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল না'' বলেছিলেন ইউ জী। সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বেশ জোর দিয়েই একথা বলেন, ''যা ঘটেছিল তা কোনও মনস্তাত্ত্বিক মৃত্যু নয়, সম্পূর্ণ শারীরিক ব্যাপার।'' সেই সময় থেকে তাঁর জীবন আর নিজের অধীনে নেই বা অন্য কোনও রকম সত্ত্বাও তাঁকে পরিচালিত করে না। ''যা নিয়ে এখন আছি তাকে সম্পূর্ণ প্রজ্বলনের পরবর্তী অবস্থা বলা যেতে পারে। অগ্নিশিখা অবশ্য এখনও প্রদীপ্ত। জীবনের এই নির্বাণপ্রায় শিখা কোনও ব্যক্তিকে বা সমাজকে প্রভাবিত করবে কিনা তাতে আমার কোনও উদ্বেগ নেই।''

এই প্রথম হয়তো কোনও একজন জ্ঞানালোক প্রাপ্তিকে বা নির্বাণলাভকে স্নায়ু জীববিজ্ঞানভিত্তিক (neurobiological) অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে

এই অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ধার্মিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং অতীন্দ্রিয় তাৎপর্যবর্জিত। এটা সম্পূর্ণ এক নতুন ধারণার প্রতীক, অভিজ্ঞতাকে পরখ করার এক নতুন এবং বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী। ইউ জী পবিত্র জিনিসের প্রতি আমাদের আসক্তির উপহাস করেন। ধর্মসংক্রান্ত বিষয় এবং বিশেষভাবে নির্বাণ বা মোক্ষ লাভের ধারণাকে সর্বদা ব্যঙ্গ করেন। যাঁরা ধর্মকর্ম নিয়ে জড়িত তাঁদের পক্ষে ইউ জী-র এই অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া, অসহনীয় মন্তব্য ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিবৃতি মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাঁদের মনে হবে যেন তিনি ভয়ঙ্কর আত্মগর্বের বশে নিজের বিচারের দ্বারা এ সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অথচ যাঁরা প্রকৃতই সত্যদর্শনের বা নির্বাণলাভের প্রয়াস করে চলেছেন তাঁদের কাছে ইউ জী-র মন্তব্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। তিনি নিজে কোনও কিছু লেখেন না বা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন না, উপরন্তু যাঁরা তাঁর কাছে আসেন তাঁদের তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'আপনারা যদি এমন কোনও একজনের অন্বেষণে এখানে এসে থাকেন যিনি আপনাদের ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেবেন, তাহলে বলে রাখা ভালো যে আপনারা ভুল লোকের কাছে এসেছেন।'

আমাদের প্রায় সকলেরই এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময় আসে যার মধ্য দিয়ে কোনওরকমে জীবন অতিক্রান্ত হলে আমাদের জীবন চিরদিনের জন্য পরিবর্তিত হয়ে যায়, ১৯৯৫ সালের জুলাই মাসে আমি সেরকমই কয়েকটা দিনের স্বাদ পেয়েছিলাম। কোনওরকম পূর্বাভাষ ছাড়াই, ইউ জী আমাকে মুম্বই-এর ভয়ঙ্কর ব্যস্ত-সমস্ত শ্যুটিং-এর কর্মসূচি থেকে বিরতি নিয়ে, সুউচ্চ আল্পস পর্বতের কোলে অবস্থিত সুইজারল্যান্ডে তাঁর মনোরম গ্রীষ্মাবাসে কিছুদিন তাঁর সঙ্গে থাকার আদেশ দিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালীন আমার ডায়েরিতে লেখা অংশটি এই নতুন সংস্করণে যুক্ত করা হয়েছে, যার নাম 'মৃত্যুর স্বাদ।'

ইউ জী-কে ষোলো বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জানার পরেও এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ ক্রোধাগ্নি যা মানুষের শতাব্দীব্যাপী সৃষ্ট সংস্কারগুলোকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে তার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সত্ত্বেও আমার এমন একজন ব্যক্তিত্বের কাছ থেকে আত্মরক্ষার্থে যথাযথভাবে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, যিনি আমার মতে মানব ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বিধ্বংসী মানুষ। আমি কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম না। তখন আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না ইউ জী-র সঙ্গে একমাস একই ছাদের নীচে বসবাসকালীন আমার অন্তরটা অগ্নিস্নাত হয়েছে বলে এক ধারণার জন্ম হবে। আমি কল্পনাই করতে

পারিনি যে সেই গ্রীষ্মকালে গেস্টাডের চোখধাঁধানো অনিন্দ্যসুন্দর পরিবেশে আমি মৃত্যুর স্বাদ পাব।

ইউ জী-র সঙ্গে প্রতিদিন কফি খাওয়ার সময় ক্ষণকালীন বা কোনও আলোচনার অন্তিমে যে কথোপকথন হত তা যেন আমাকে গভীর স্তব্ধ ভোরের প্রাক্কালে হালকা আলোয় সর্বত্র দেখাত মৃত্যুর ছায়া। একদিন ভোরবেলা গেস্টাডের গাড়ি-ঘোড়া মুক্ত সুগন্ধে ভরপুর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমি দেখতে পেলাম কীভাবে মৃত্যু ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলছে। দেখলাম কীভাবে এ এক প্রাচীন বৃক্ষকে হত্যা করল, যা বহু ঝড়-তুফানের মধ্যেও পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখলাম কীভাবে এ মানুষের দুঃস্বপ্নে প্রবেশ করে। কীভাবে এ আমার জানালার বাইরে অপূর্ব সুন্দর ফুলটাকে ধীরে ধীরে মলিন করে শেষ করে দিল। কীভাবে এ কোনও ব্যক্তিকে, কোনও সংস্কৃতিকে এবং অবশেষে পুরো একটা সভ্যতাকে যন্ত্রণা দিয়ে নিঃশেষ করে দিল। হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম প্রকৃতপক্ষে শুধুমাত্র একটা গভীর ভীতি সারা জীবন ধরে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করে রেখেছে তা হল এই জ্ঞান যে আমার নিজের জীবনটাও একদিন শেষ হয়ে যাবে। এমনকী আমার বাল্যকালেও আমাদের বাড়ির নিকটবর্তী সমুদ্রের পাড়ে একটা শ্মশানঘাটে আমি মাঝে মাঝেই গিয়ে হাজির হতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্মশানের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। দেখতাম কীভাবে মানুষের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আগুন যখন মৃতদেহকে সম্পূর্ণরূপে জ্বলন্ত অঙ্গারে রূপান্তরিত করে, চিতার শেষ অগ্নিশিখা যখন ধীরে ধীরে নিভে যায়, তখন আমি আকাশের দিকে মিলিয়ে যাওয়া একটুকরো ধোঁয়ার দিকে সন্দেহভরা বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে ভাবতাম, এই যে ব্যক্তি আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেন, তিনি কি সত্যি সত্যিই শরীর থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন যা বয়োঃজ্যেষ্ঠরা বিশ্বাস করেন, নাকি ছাইভস্ম হয়ে ধূলায় মিশে গেলেন। সেই শ্মশান ঘাটে আমার অন্তরে এক ভাবনা দৃঢ়মূল হয়, আমার এই দেহ একদিন এভাবেই চিতাভস্মে পরিণত হবে। ধীরে ধীরে আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলাম আমাদের পুরাতন সভ্যতার মতো আমিও এই পৃথিবীর বুকে এক ক্ষণিকের অতিথি।

গেস্টাডের আবরণহীন অনমনীয় সৌন্দর্যের মধ্যে কেটে যাওয়া দিনগুলো মিলেমিশে সপ্তাহের পর সপ্তাহে পরিণত হতে লাগল। আমি ক্রমশঃ গভীরভাবে

অনুভব করতে লাগলাম আমার চতুর্দিকে মৃত্যু যেন ঘনীভূত হচ্ছে, যেমন ভয়ংকর ক্রোধের সময় হৃদয়ের রক্ত প্রবল বেগে মস্তিষ্কের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ঠিক যেন সেরকমই যেকোনও আলোচনা সে যেভাবেই শুরু হোক না কেন, অবশেষে মৃত্যুর আলোচনায় এসে সমাপ্ত হত। তিনি আমার অস্তিত্বের কেন্দ্রমূলে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন। যা কিছু আমি ভেবেছিলাম, অনুভব করেছিলাম, জানতাম এবং আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সবকিছু এই মানুষটি জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো কোনও কর্মশক্তিই আমার ছিল না। তিনি আমার চতুর্দিকে এক উন্মত্ত দাবানলের মতো অধিষ্ঠান করতে লাগলেন। সুরক্ষিত একটা দুর্গ নির্মাণ করে নিজেকে বিপদমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। লিখতে শুরু করলাম আমার দৈনিক জীবনযাত্রার কাহিনি। এই মৃত্যুর দিনলিপি।

মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয়, ইউ জী-র অগ্নিকুণ্ডে নিজেকে সমর্পণ করে পরিপূর্ণভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়ে যাওয়া হয়তো আমার এই অনুভূতিগুলোকে বাস্তবায়িত করে দিনলিপিতে পরিণত করার চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনেক মঙ্গলময় কর্ম। সারাজীবন ধরে মানুষের গভীর আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলোকে নিজের অন্তরে লুকিয়ে রাখতে অসমর্থ হওয়ার ঘটনা আমাকে সর্বদা মানসিকভাবে যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে। একথা ভেবে আমি সর্বদা বিস্মিত হতাম কেন আমরা অসহ্য বিশৃঙ্খল জীবন থেকে বাঁচার জন্য জীবন সম্পর্কে আলোচনা করি এবং লেখালেখি করি! শব্দের প্রয়োগে জীবনকে শৃঙ্খলা রূপ দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ বাক্যে তথা অধ্যায়ে রূপান্তরিত করাটাই হয়তো আমাদের এক ক্ষুদ্রাংশকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায়।

যে সমস্ত ব্যক্তি মৃত্যু সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন তাদের প্রত্যেকেই একটা গভীর ভয়কে অনুভব করেছেন। আমাদের ভীতির প্রধান কারণ হল আমরা অস্তিত্বহীনতাকে ভয় পাই এবং লেখার মাধ্যমে আমরা সেই অন্ধকার করাল গর্ভে যাওয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি যেখানে মৃত্যু আমাদের সর্বদা নিক্ষিপ্ত করার প্রয়াস করে চলেছে। সর্বোপরি এ সমস্ত কিছুই 'আমি' কে সুরক্ষিত রাখার প্রয়াস মাত্র। কারণ যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ মৃত্যু নেই, আর একবার মৃত্যু স্পর্শ করে দিলে আর কোনও 'আমি' থাকতে পারে না।

এই দিনলিপি আমার অন্তরের গভীর অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয়েছে। আমি

মৃত্যুর অভিজ্ঞতার যে স্বাদ গ্রহণ করেছি তা পাঠকের কাছে আনতে চাই এই কারণে যে, এই কয়েকটা পাতার মধ্যেই আমি আশ্চর্যজনকভাবে জীবিত হয়ে উঠি। আমার জীবিত হয়ে ওঠার একমাত্র কারণ হল এক অফুরন্ত ভালোবাসা যা আমি ইউ জী-র কাছ থেকে ক্রমাগত পেয়ে এসেছি। সেই গ্রীষ্মের ছুটিতে ইউ জী আমার দিকে ক্রমাগত অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারে এমনই এক ব্যক্তি যিনি আপনাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। সেই অন্ধকার অতল গহ্বরে যেখানে ইউ জী আমাদের সভ্যতা বাঁচিয়ে রাখা সংস্থাগুলোকে বিধ্বংস করছিলেন, সেখানেই আশ্চর্যভাবে আমাদের হৃদয় পুনরায় স্পন্দিত হতে শুরু করল। মৃত্যুর পরবর্তী এই উদ্ভাসিত ভাবাবেগের মধ্যে আমার গভীর আশঙ্কা জাগে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আবিষ্কার করলাম যখন আমাদের মৃত্যু ঘটে তখন থেকে আমরা নতুনভাবে বাঁচতে শুরু করি।

কফির দোকানে বসে একদিন ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আমার কাছ থেকে আপনি কি কিছুই প্রত্যাশা করেন না?' উত্তরে ইউ জী বলেছিলেন, 'শুধু একটা জিনিস। আমার মৃত্যুর পর আপনার অন্তরে এবং বাইরে আমার সমস্ত প্রভাব যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়।' তাঁর এই পরিপূর্ণ আত্ম অবলুপ্তিতে আমার সমগ্র অস্তিত্ব থরথর করে কেঁপে উঠল। এই জগতে তাঁর একা দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা এবং বিনা-আড়ম্বরে নিঃশব্দে মৃত্যুকে বরণ করার প্রবল ইচ্ছাশক্তির এহেন প্রকাশে আমার সত্তা নির্মল হয়ে গেল। এখানে আমি এই মুহূর্তে এই শুভক্ষণে এমন এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি যিনি শুধু অনস্তিত্বকে বরণ করেননি উপরন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন শূণ্যগর্ভ। আমি সর্বদা বিনাপ্রশ্নে আমার সম্পূর্ণ সম্মতিতে ইউ জী যখন যা বলতেন তাই করতাম, কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই যে তাঁর শেষ ইচ্ছা তিনি আমায় জানালেন, তা আমি কোনওদিন পূরণ করতে পারব কিনা! কারণ আমি একটা কথা নিশ্চিতভাবে জানি, যেদিন ইউ জী আমার মন থেকে, আমার হৃদয় থেকে মুছে যাবেন, সেদিন আমার এবং আমার সমস্ত জ্ঞানের সমাপ্তি ঘটবে, আর আমি কিছুতেই শেষ হতে চাই না।

ইউ জী-র সঙ্গে কাটানো হাজারো গতকালের সন্ধ্যারাগ আমার অন্তরে নিরন্তর ঝিলমিল করে চলেছে। হৃদয়ের গভীর অনুভূতি অন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করানোর প্রবল ইচ্ছা ও অদম্য আগ্রহের ভেতর থেকেই হয়তো সৃষ্টি হয়

অসামান্য সাহিত্যের। প্রত্যেক সাহিত্যিকের মনের গভীরে এক প্রেরণার উৎস থাকে। সমস্ত জীবন ধরে সেই উৎসস্থল থেকে তিনি যা তুলে আনতে পারেন তা হল তাঁর নিজের এবং তিনি যা লেখেন তা হল তার প্রতিফলন মাত্র। সেই উৎস যখন নিঃশেষিত হয়, তখন তাঁর কাজ নির্জীব হয়ে ভগ্নপ্রাপ্ত হয়।

মানুষ স্বভাবতই গল্প বলতে ভালোবাসে। সে তার এবং অন্য সবার জীবন কাহিনীর মধ্যে বসবাস করে। আমার স্মৃতিপটে লেখা বিভিন্ন ঘটনাকে আজ একত্র করে আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমার এই কাহিনীটি। সংক্ষেপে সেটাই হল আমার বলা এই ক্ষণজন্মা অনন্য পুরুষ ইউ জী-র জীবনের গল্প।

প্রথম খণ্ড

সাক্ষাৎকার

"আপনারা যদি এমন কোনও একজনের অন্বেষণে এখানে এসে থাকেন যিনি আপনাদের ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেবেন, তাহলে বলে রাখা ভালো যে আপনারা ভুল লোকের কাছে এসেছেন।"

– ইউ জী

১৯৯১ সালের ২৭ আগস্ট আমাদের মুম্বাই থেকে লন্ডন যাওয়ার ফ্লাইট ঠিক সময়মতোই ল্যান্ড করেছে। প্রিয়জন এবং ঘরবাড়ি ছেড়ে অল্প সময়ের জন্য হলেও কোথাও যাওয়া বেশ কষ্টকর বলে মনে হয়। তাই ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগে কীভাবে ইউ জী জীবনের এই সমস্ত অভিজ্ঞতাগুলো চিরকালের জন্য উপেক্ষা করে সবকিছু ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত ইউ জী-র সঙ্গে থেকে তাঁর জীবনী লেখার জন্য রওনা দিলাম। প্রথমে লন্ডনে তারপর ইউ জী-র সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া যাব। প্লেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ের অনুভূতি আমাকে গ্রাস করে ফেলল। ইউ জী-কে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার যে দায়িত্ব নিজেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি আমি কি তার যোগ্য? ভাবতে সত্যিই আশ্চর্য লাগছে।

'নিউ রাইটিং' পত্রিকায় হঠাৎ গ্রিক পৌরাণিক গ্রন্থের 'ইকারাস'-এর গল্প চোখে পড়ল – পৌরাণিক কাহিনি ঃ

ডেডলাস গোপনে দু'জোড়া ডানা (কাল্পনিক পাখনা) বানিয়েছিল–এক জোড়া নিজের জন্য আর এক জোড়া পুত্র ইকারাসের জন্য। মৌচাকের মোমের মধ্যে পাখির পাখনা লাগিয়ে অত্যন্ত চাতুর্য ও নিপুণতার সঙ্গে সেই ডানা বানানো

হয়েছিল। পিতা পুত্রকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে সেই ডানার উপযোগে উপরে উড়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সাবধান করে দিয়েছিলেন খুব উঁচুতে না উঠতে, কারণ সূর্যের তাপে মোম গলে যেতে পারে। ডেডলাস পুত্রকে নিয়ে সর্বোচ্চ মিনারের উপর আরোহণ করলেন। তারপর ডানার সাহায্যে তাঁরা পাখির মতন উড়তে লাগলেন। সে উড়ান কারোর পক্ষেই থামানো সম্ভব ছিল না। মূর্খ যুবক ইকারাস অনেক অনেক উপরে ওঠার প্রলোভন থেকে নিজেকে সংযত করে রাখতে পারল না। সমস্ত পৃথিবী যেন তার পদতলে পড়ে আছে বলে মনে হল। যখন সত্যিই সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেল, মোম গলতে শুরু করল, ডানা খসে পড়ে গেল, আর মূর্খ ইকারাস সমুদ্রে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল।

লোকে বলে সূর্যের দিকে যেমন চোখের পাতা না ফেলে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না ঠিক সেরকম মৃত্যুর দিকেও নাকি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় ইউ জী–র নিঃসঙ্গ জীবনের উপর দৃষ্টিপাত করাটাও ঠিক একই রকমের কষ্টকর ব্যাপার।

এই জীবন কাহিনি লেখার একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হল নিজেকে বিফল হওয়ার অনুমতি দেওয়া। অপরের উচ্চমানের যথাযোগ্য হওয়ার চিন্তা করে বা নিজের উচ্চাশা পরিপূরণ করার কথা ভেবে কোনও ব্যক্তির আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

বছরের পর বছর কেটে যাওয়া ঝাপসা অতীতের দিকে তাকিয়ে, কবে কার সঙ্গে কোন মুহূর্তে প্রথম দেখা হয়েছিল সেকথা নির্ভুলভাবে মনে রাখা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। ইউ জী–র সঙ্গে কখন আমার প্রথম দেখা হয়? কোথায় এবং কীভাবে? জীবনের অতীতকে নিরীক্ষণ করা যেন দূরবিনের ভুল প্রান্তে চোখ রাখার মতো। সবকিছু বহুদূরে এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। ঠিক সেই সময় আমাদের প্লেনটা বিশাল এক মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেল, আমিও চোখ বুজলাম, সময়ের বিপরীতে ভাসতে ভাসতে একরাশ কুহেলির মধ্যে অবতরণ করলাম....

বেপরোয়া সেই জীবন ছিল অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। জনাথন লিভিংস্টোন সিগালের বই পড়তাম, জন লেননের গান শুনতাম আর এল এস ডি–র নেশায় চুর হয়ে থাকতাম। সেদিন সকালে ধ্যান করছিলাম, টেলিফোন বেজে উঠল। ধ্যানভঙ্গ করে যখন উঠতে যাচ্ছিলাম তখন কি কোনও রকম ধারণা ছিল যে এই দূরভাষের ডাক আমার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করে দেবে!

'ইউ জী এখানে .... কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান?' প্রতাপ কারভাট জিজ্ঞাসা করেছিলেন। 'এখনই' আমি উত্তরে বলেছিলাম। 'আমার ঠিকানা লিখে নিন ...।' নম্র ও মৃদুভাষী প্রতাপ কারভাটের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল এক সিনেমা শুটিং-এর সময়। আমি তখন গেরুয়া বসন পরতাম (ভগবান রজনীশের সন্ন্যাস নিয়েছি) বিখ্যাত দার্শনিক জে কৃষ্ণমূর্তির বই 'দ্য এওকেনিং অব ইন্টেলিজেন্স' পড়তে দেখে প্রতাপ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি বই পড়ছি। প্রতাপ হলেন বইপোকা। পড়তে ভীষণ ভালোবাসে। কৃষ্ণমূর্তি, রজনীশ এবং অন্যসব আধ্যাত্মিক গুরুর সম্পর্কে অনেক কিছু বললেন। তারপর হঠাৎ করে কোনও ভূমিকা ছাড়াই আর এক কৃষ্ণমূর্তির নাম বললেন – ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি; যিনি প্রতি বছরই ভারতে আসেন, কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করার কোনও ইচ্ছাই দেখান না। 'আপনি কি ইউ জী-র সঙ্গে দেখা করতে চান?' প্রতাপ কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমার তখন দারুণ অনুসন্ধিৎসা। না কেন? যত বেশি মহান লোক ততই ভালো, দেখা যাক এই কৃষ্ণমূর্তি কি বলতে চান।

জ্বলন্ত তামাকের গন্ধ, শহরের কোলাহল আর জুতো পরে অন্ধকারাচ্ছন্ন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মচমচ শব্দ, সব মিলিয়ে আমার মানসপটে ইউ জী-র সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটি যেন এখনও জ্বলজ্বল করছে। তাঁর মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে আমার চারিদিকে অন্য সমস্ত কিছুকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিল। যেন কোনও আগ্নেয়গিরির গভীর স্তব্ধতা আমার সমস্ত শিরা ও উপশিরাকে দাবানলের মতো গ্রাস করে ফেলল। কি করে ভোলা যায় সেসব কথা যা প্রথম দিন ইউ জী আমাকে বলেছিলেন।

> ''আমি কোনও মানুষ রূপে ভগবান নই। যদি কেউ প্রতারক বলে সেটা এর থেকে অনেক ভালো। ঈশ্বরের সন্ধান করা মানুষের জীবনে এমন এক সর্বগ্রাসী ব্যাপার হয়ে দাঁড়ানোর কারণ হল দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ অসম্ভব বলে। সেই তালগোল পাকানো জিনিসটা যাকে আমরা মন বলি তা বহু ধ্বংসাত্মক বস্তুর সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক জিনিস হলো 'ভগবান'। ভগবান হয়ে দাঁড়িয়েছে সুখভোগের চরম বস্তু। ভগবানেরই অন্যান্য তারতম্য – আত্ম উপলব্ধি, মোক্ষ বা নির্বাণ, গুণগত পরিবর্তন ...., প্রথম ও শেষ মুক্তি এবং অন্যান্য সমস্ত অন্তর্বর্তী মুক্তি; এই সমস্ত জিনিস

মানুষকে চরম মানসিক বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিয়েছে।''

''বিবর্তনের কোনও এক সময় মানবজাতি হঠাৎ প্রথমবারের মতো আত্মসচেতন হয়ে ওঠে; অন্যান্য প্রাণীজগতের মধ্যে চেতনা যেভাবে কাজ করে, এই আত্মসচেতনতা কাজ করতে লাগল তার ঠিক বিপরীতভাবে। সেই সময় মানবজাতি জগৎ চেতনা থেকে বিভক্ত হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল ভগবান ও চিন্তার, আর সেই চিন্তাই হল আজকের পারমাণবিক শক্তির ভিত্তি। যে প্রাণীজগৎকে প্রকৃতি ধীরে ধীরে অত্যন্ত সযত্নে গড়ে তুলেছে, আজ আমাদের পারমাণবিক শক্তি সেই প্রাণীজগৎকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার হুমকি দিচ্ছে।''

''পৃথিবীর কোনও শক্তি, কোনও ভগবান, কোনও অবতারের পক্ষে একে রোধ করা অসম্ভব। মানবজাতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মানুষের নিজের ইচ্ছায় কাজ করার কোনও স্বাধীনতা নেই, যা আমরা আপাতত করতে পারি তা হল ধ্বংসের জন্য অপেক্ষা করা। পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাতে সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পাবার যতই পরিকল্পনা করি না কেন তাতে ফল হবে না।''

তাঁকে জেরেমিয়ার মতন শোনাচ্ছিল, যেন মহা প্রলয়ের বার্তা বহনকারী দেবদূত আমাদের সাবধান করতে এসেছেন।

সেদিন ইউ জী–কে মনে হয়েছিল যেন এক উন্মত্ত বৃষভ; অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর ধ্বংসাত্মক ক্রোধ দেখে। কিন্তু আশ্চর্য রকমের আকর্ষণ ছিল তাতে, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি কি আমাদের কাছ থেকে সব আশা ছিনিয়ে নিচ্ছেন না?' ইউ জী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমি কোনও প্রাণবন্ত আশাবাদী নই। আপনি আপনার আশা নিয়ে বেঁচে থাকুন, আর আশা নিয়েই মরে যাবেন।' তখন আমি অন্য আর একটা প্রশ্ন করেছিলাম, 'যৌনতা সম্পর্কে আপনার কি কোনও বিশেষ মতামত আছে?'

ইউ জী–র উত্তর ঃ

''ভগবান এবং যৌনতা একই উৎসস্থল থেকে নির্গত হয়েছে। ভগবান উপভোগের পরমস্থান অধিকার করে আছে, যৌনতা যাবার

আগে ভগবানকে যেতে হবে, কিন্তু যৌনতা যাবে কেন? এই ফাঁকে বলে রাখি যে আমার যৌন সংক্রান্ত চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিল ওই সমস্ত ধার্মিক লোকদের কাছ থেকে। তাই এখন আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে আমার কঠোর তপস্যা, নিষ্কাম যোগসাধনা, ধার্মিক জীবনযাত্রা এবং সমস্ত আনুষঙ্গিক শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করার সঙ্গে আমার জীবনে যা ঘটেছে তার কোনও সম্পর্ক নেই। তার মানে এই নয় যে অতিযৌনতা বা যৌন ব্যভিচারের মাধ্যমে তথাকথিত নির্বাণ, মোক্ষ বা সেই জিনিস লাভ করা যায়। সে তাকে আপনি যে নামে ইচ্ছা সম্বোধন করুন না কেন। আপনারা ওই সমস্ত জ্ঞানের আবর্জনা সমানে গলাধঃকরণ করে চলেছেন, আপনাদের সামনে থেকে এই সমস্ত মায়াজাল সরিয়ে নেবার কোনওরকম আগ্রহ আমার নেই। 'গাঁজা ও ভাঙ খাওয়া আর যৌন স্বাধীনতা হল আত্মউপলব্ধির এবং সমাধির বিশুদ্ধ পথ' এই জ্ঞানে নিজেকে মগ্ন করে সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত হতে থাকুন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আপনার নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটেছে এবং আপনার আচরণ অবৈধ এটা সত্যি কথা। কিন্তু সেটা আপনার আর আপনাদের সমাজের মধ্যেকার ব্যাপার। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো অনেক পালটে গেছে কিন্তু আপনার আচরণকে চিরকাল সমাজ বিরোধী বলে গণ্য করা হবে। আপনার গুরু আপনাকে এসব করতে অনুমতি দিয়েছেন ও তার সঙ্গে গেরুয়া জুড়ে দিয়েছেন, তাই আপনার নিজেকে দোষী বলে মনে হয় না, বা নিজেকে দুর্নীতিপরায়ণ ও অশুদ্ধ বলে ভাবতে পারেন না। ঠিক যেমন উঠতি অভিনেত্রী যদি শরীরকে পণ্য করে ডাইরেক্টর, প্রডিউসারের কাছে, যাকে হলিউডে বলে 'কাস্টিং কাউচ' কিন্তু তবুও নিজেকে কোনওক্রমে বারবণিতা বলে ভাবতে পারে না। তারা এ সমস্ত করেও পার পেয়ে যায়, কারণ তাদের পেশার অসামান্য গ্ল্যামার। আমার কাছে নৈতিকতার কোনও মূল্য নেই। কিন্তু আপনি কি সুখী? আপনার মধ্যে কে সুখী? আপনি? আপনার

> বান্ধবী? আপনার স্ত্রী? আপনার স্ত্রীর বন্ধু? সবাই তো দেখছি অত্যন্ত অসুখী। এটা ভুলে যাবেন না যে আপনার আচরণ সবার উপরেই প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রত্যেকেই মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত।’’

আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। যেন দুর্ভাগ্যক্রমে হাই ভোল্টেজের তার ছুঁয়ে ফেলেছি, যেন মাইন পুঁতে রাখা মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। তাঁর ভর্ৎসনার তীব্রতা আমাকে তথাকথিত আধ্যাত্মিক কোমা থেকে ঝাঁকুনি দিয়ে বাইরে নিয়ে এসেছিল। আমি হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠলাম। নেশায় ডুবে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় তখন চোখে পড়ল না।

ধ্যান জগতে আমার হাতেখড়ি হয় এল এস ডি–র মাধ্যমে। এই এল এস ডি–র নেশা আমাকে এবং বিশাল এক যুবসমাজকে যাদের ‘ফ্লাওয়ার চিলড্রেন’, ‘হিপি’ বলা হতো, তাদের সবাইকে অতীন্দ্রিয়তার স্বাদ দিয়েছিল। সেই সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ালব্ধ অভিজ্ঞতাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগাদায় আমার আধ্যাত্মিক বাজারের চোরাগলিতে যাতায়াত শুরু হয়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরের আলো মৃদু করে দিয়ে ধ্যানে বসেছি, ইউ জী–র চেহারাটা অন্ধকারে মরীচিকার মতো হালকাভাবে চোখের সামনে ভাসতে লাগল। গত দু’বছর ধরে ভগবান রজনীশের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এবং আমি নিয়মিত ধ্যান করছি। কিন্তু সেদিন প্রথম মনে হল যেন আর ধ্যান করতে পারছি না। একটা আতঙ্ক আমাকে ছেয়ে ফেলল। রাস্তার অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রাস্তার কুকুরগুলো প্রথমে একটু ঘেউ ঘেউ করল, পরে যখন বুঝল যে আমিও ওদেরই একজন তখন চুপ করে গেল। কয়েকজন অচেনা লোকের পাশে বসে পড়লাম আগুন পোহাতে। শীতের রাত বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। হলুদ রঙের একগাদা কাগজে আগুন জ্বলে উঠল। সবার চোখ সেই আগুনে জ্বলজ্বল করছে। আগুনের চারিদিকে বসে থাকা সবকটি পুরুষই নেশাগ্রস্ত। অথচ সেই আগুন তখন সবাইকে একত্র করে স্বস্তি দান করতে লাগল। ‘আপনি কি মহেশ ভাট’ – জিজ্ঞাসা করল একজন। বললাম, ‘হ্যাঁ’। উপস্থিত সকলেই হেসে উঠল, আমাকে তাদের মাঝে পেয়ে তারা সবাই খুশি। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি কেন আমার উপর এত অখুশি। ধীরে ধীরে সবার মুখগুলো পরিশ্রান্ত মনে হল। পরে যখন একটু

ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম, ঘুম এল না। মনে হল ভেতরে কে যেন বলছে, 'বন্ধু তুমি এক বিশাল ঝড়ের নিকটবর্তী হতে চলেছ।'

''আমার জীবন ব্যর্থ, আমি বড় একা, নিজের উপর আর কোনও বিশ্বাস নেই, আমি আতঙ্কগ্রস্ত। প্রভু রক্ষা করুন'' – বলেছিলাম ভগবান রজনীশকে, যখন পুনায় এক শীতের সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার দিকে গভীর দৃষ্টি রেখে সযত্নে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, ''ভগবান যিশু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর! কেন তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে।' তাঁর সেই যন্ত্রণা কাতর চিৎকারের কারণ কি জানেন, তাঁর মনে সন্দেহ জেগে উঠেছিল যে প্রকৃতই ঈশ্বর তাঁর পাশে আছেন কিনা? কিন্তু তাঁর আর্তনাদ শেষ হওয়ার আগেই স্বচক্ষে দেখেছিলেন ঈশ্বর তাঁর সঙ্গেই আছেন। আমিও আপনার সঙ্গেই আছি।'' সেদিন সন্ধ্যায় তিনি আমায় এক সুন্দর জিনিস উপহার দেন – তাঁর নিজের পরিধেয় শ্বেত অঙ্গবস্ত্র। এটা পরুন মহেশ। সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনার প্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক। ভগবান রজনীশের সেই কথাগুলি আমায় যারপরনাই আনন্দ দিয়েছিল। তিনি আমাকে যা বলেছিলেন ঠিক তাই শুনতে চেয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সব সান্ত্বনা বেশিদিন টিকে থাকেনি। ভগবানকে আর একটি বার দর্শন করার জন্য বারবার ছুটে গিয়েছিলাম আশ্রমের অফিসের দরজায়, কত অনুনয় বিনয় করতাম। ভয়ঙ্কর নেশার কবলে পড়ে যাওয়া যুবকের মতন অবস্থা ছিল আমার। সবকিছুর তখন একটাই উদ্দেশ্য, পরবর্তী নেশার যোগান কীভাবে করা যায়। রজনীশ হয়ে উঠেছিলেন আমার 'অন্ধের যষ্ঠি।'

পুরো ব্যাপারটাই ছিল আত্মবিরোধী, অথচ কোথায় যেন একটু সত্যের প্রকাশ ছিল। আমার মুক্তির সন্ধান ধীরে ধীরে আমাকে নতুন ফাঁদে জড়িয়ে ফেলল। বন্দিগৃহে বসে মূর্খের মতন মুক্তির ও স্বাধীনতার ধ্যান ধারণা নিয়ে মেতে রইলাম। ইউ জী–র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার আমার মর্মে এক অসহনীয় যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল। সেই ক্ষতটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। যতদূরে যাওয়া যাক না কেন লুকোনোর কোনও উপায় ছিল না। সমস্ত পৃথিবীর কাছে মিথ্যা বলতে পারি, কিন্তু নিজের কাছে কী বলব? বুঝলাম ভগবান রজনীশের আশ্রমে থাকার দিন ফুরিয়ে এসেছে। স্বর্গের দেওয়ালে ভাঙন দেখা দিয়েছে। আমার অন্তরে আমার ভগবানের মৃত্যু ঘটেছে। এ ব্যাপারে কোনও কিছু করার মতন কোনওরকমের শক্তিই আমার মধ্যে অবশিষ্ট

ছিল না।

‘এটা অবশ্যম্ভাবী’ মনে মনে ভাবলাম, যখন টুকরো টুকরো করে ফেলা মালা (ভগবান রজনীশ নিজের হাতে আমায় সেই মালা উপহার দিয়েছিলেন) চোখের সামনে কমোডের মধ্যে পড়ে হারিয়ে যেতে দেখলাম। নিজেকে অদ্ভুত হালকা মনে হতে লাগল, যেন কুকুরের গলার বাঁধনটা হঠাৎ খুলে গেল, যে ফাঁস গত তিন বছর ধরে আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল তা থেকে আজ আমি মুক্ত। নিজের জীবনযাত্রার উপর আমার বিতৃষ্ণা ধরে গিয়েছিল। আমার মানুষ হিসাবে নিজের উপর নিজের ঘৃণাবোধ হত। রজনীশের আশ্রমে কাটানোর দিনগুলোতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো কোনও রসদ আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। আর আধ্যাত্মিকতার সেই জগতে প্রগতি সম্ভবত মায়াময় কুহেলিকার মতন; ‘যদি বই আর বক্তৃতা মানুষকে বদলে দিতে পারত, তাহলে পৃথিবী বহুদিন আগেই স্বর্গভূমি হয়ে যেত’ – বলেন ইউ জী। আমার জীবনের একটা অধ্যায় তখন শেষ হয়ে গেল।

‘ভগবান তোমার উপর ভীষণ রেগে আছেন, মহেশ! আমি ফিল্মিস্থান স্টুডিওতে একটা সিনেমার শুটিং করছি, এক্ষুনি চলে এসো, তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলার জন্য কিছু খবর আছে।’ ভগবান রজনীশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার কয়েকদিন পরেই চিত্র অভিনেতা বিনোদ খান্না আমাকে ফোন করে একথা জানাল। ভগবানের দেওয়া মালা আমি কমোডে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি এ খবর এতদিনে আশ্রমে পৌঁছে গেছে। আমিও আমার ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ‘কেন মহেশ? কেন তুমি এসব করলে?’ বিনোদ দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমায় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল। ‘আমি এর আগে কোনওদিন ভগবান রজনীশকে এ রকম ক্রোধান্বিত হতে দেখিনি। তিনি তোমাকে নিজের হাতে মালা ফিরিয়ে দিতে বলেছেন। তুমি ভগবানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তোমার জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করেছেন, তুমি যদি তাঁকে মালা ফিরিয়ে না দাও, মহেশ! তিনি বলেছেন, তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন।’ বিনোদ এই কথাগুলো বলে আমার দিকে এমন করুণভাবে তাকিয়েছিল যেন এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার দিন আমার ফুরিয়ে এসেছে। মেকআপ রুমে নেমে এল এক গম্ভীর স্তব্ধতা। আমি ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। তাঁর প্রচণ্ড রোষে আমার ধ্বংস অনিবার্য। আমারও তখন ভীষণ রাগ হচ্ছিল। মনে পড়ল রজনীশের দেওয়া নিঃশর্ত ভালোবাসার উপর বক্তৃতার

কথা। তিনি সেই সময় বিস্তারিতভাবে আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, মানুষের উপর অধিকারের ভাবনাটা কত ঘৃণ্য। আর আজ তাঁর সেসব কথা মনে পড়ে, তাঁর ব্যবহার দেখে, আরও অসহ্য লাগছে। এক অতি সাধারণ প্রেমীর মতন, ছোট্ট একটা প্রত্যাখানও মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বাক্যের কৌশলে আমাদের বেঁধে রেখেছেন, বড় বড় শব্দ, পবিত্র ধারণা আর অর্ধ সত্য দিয়ে আমাদের কিনে রেখেছেন। মানুষও তাই চায়। সত্য বড় ক্ষুরধার এবং অপ্রিয়, কেউ তা চায় না। ইউ জী-র সেই কথা মনের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল, ভরসা পেলাম ঃ 'সত্যিকারের গুরু আপনার সমস্ত নির্ভরতাকে ছুঁড়ে ফেলতে বলবেন, নিজের দুটো পায়ে আপনাকে চলতে শেখাবেন। যদি পড়ে যান বলবেন, নিজেই একদিন জেগে উঠে চলতে সক্ষম হবেন।' এই কথা মনে হতে এক অসীম সাহস আমাকে আমার মধ্যে ফিরিয়ে আনল। 'কে ভগবান রজনীশকে ভয় পায়?' বললাম মনে মনে, 'নিজের পায়ে দাঁড়াও, তা সে যতই দুর্বল হোক না কেন, হাঁটতে শুরু করে দাও।' আর একবার যখন তা শুরু করলাম, আর কোনওদিন পেছনে তাকাতে হয়নি।

১৯৭৭ সাল থেকে যখনই ইউ জী মুম্বাইতে এসেছেন তখনই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। সেই সময় ইউ জী, লালুভাই শাহ্ এবং আমি, আমরা তিনজন রোজ ভোরবেলা হাঁটতে যেতাম। 'আপনি ভবিষ্যতে একদিন ইউ জী-র জীবনকথা লিখবেন' – এক কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে হাঁটতে হাঁটতে লালুভাই হঠাৎ আমায় একথা বলেছিলেন (লালুভাই ছিলেন এক বিখ্যাত হীরের ব্যাপারি। সেই হীরের ব্যাবসা পরিত্যাগ করে আচার্য বিনোবা ভাবের সর্বোদয় আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনেও কাজ করেছিলেন)। আমি তখন সিনেমার পরিচালক হবার প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে কঠিন লড়াই করছিলাম। বিজ্ঞাপনের জন্য ছোট ছোট শুটিং করে কোনওরকমে দিন চলত। আর আমার ব্যক্তিগত জীবন? অনেক কমিয়ে মৃদু ভাষায় বলা যেতে পারে, অতি বিশৃঙ্খল! আমি তখন বিবাহিত এবং এক ফুটফুটে সুন্দর মেয়ের বাবা। তা সত্ত্বেও এক বিখ্যাত চিত্র অভিনেত্রী, যাকে টাইম ম্যাগাজিনের কভার গার্ল বলা হত, সেই পরভীন ববির সঙ্গে গোপন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

রজনীশ আশ্রমের প্রধান কার্যালয়ের সামনে ইউ জী-র সঙ্গে আশ্রমের কোনও সন্ন্যাসীর দেখা করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ইউ জী-র সঙ্গে দেখা করার

পর রজনীশের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীও আশ্রম ত্যাগ করেছেন। আমার এখনও মনে আছে রজনীশ সেই সময় ইউ জী–র বিরুদ্ধে চারটে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ইউ জী–কে নানারকম অসম্মানজনক নামে অভিহিত করেছিলেন। আমি একদিন অবশেষে ইউ জী–কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার নামে রজনীশ সমানে এতকিছু বলে যাচ্ছে, আপনি কোনও সাড়া শব্দ করছেন না কেন? আপনি কেন কোনও গুরুর বিরুদ্ধে কিছুই বলেন না?' তাঁর উত্তর ছিল অস্বাভাবিক ঃ

> ''গুরুর একটা সামাজিক ভূমিকা আছে; বারবণিতাদেরও একটা সামাজিক ভূমিকা আছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে গুরুরা যা দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে আমাদের অস্তিত্বের পরমবস্তু বলে মেনে নেওয়া হয়। অন্যদের দেওয়া জিনিসকে সেভাবে মেনে নেওয়া হয় না। আপনার যা পছন্দ হয়, আপনি তাই নেবেন ....।''

আমার যতদূর মনে আছে আমি সবসময় অন্ধকারকে ভয় পেতাম এবং এখনও পাই। যখন আমি বাড়িতে একা একা থাকি তখন আমি অন্ধকারে কিছুতেই ঘুমোতে পারি না। আমার মুসলমান মা আমাকে কলমা পড়া শিখিয়েছিল, অনেক সাধু সন্ন্যাসীর কথাও শুনেছিলাম। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছিলাম। কোনও কিছুতেই আমার অন্ধকার ভীতি দূর হয়নি। যখন আমি ইউ জী–কে আমার সমস্যার কথা বললাম, ইউ জী–র উত্তর ঃ

> বিভিন্ন রকমের ভীতির সৃষ্টি হয়েছে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে, যদিও সাইকিয়াট্রিস্টরা সেসব থেকে আপনাদের মুক্তি দিতে খুব উৎসুক, কিন্তু ভয়ের খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজ এসব ভয় থেকে আপনাকে মুক্ত হতে বলে তার কারণ হল, আপনাকে সমাজের নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে বলে। আপনার যদি এ জাতীয় কোনও ভয় না থাকে তাহলে অন্য কোনওরকমের ভয় থাকবে।
>
> আমি মার্কিন মুলুকের এক প্রডিউসারকে চিনি যাঁর বেড়ালের প্রতি এক অদ্ভুত ভয়। যখনই তিনি আমাকে দেখতে আসতেন, তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা আগে এসে খোঁজ নিতেন যে ঘরে কোনও বেড়াল আছে কিনা। সেই ভদ্রলোক এই মার্জার ভীতিতে ভীষণ লজ্জিত,

> আমেরিকার নামী দামি মনস্তত্ত্ববিদদের পরামর্শ শুনে কোনও কাজ হয়নি। খুব আমতা আমতা করে আমাকে তাঁর সমস্যার কথা বললেন – ভদ্রলোকের বদ্ধমূল ধারণা যে তাঁর বিশেষ কোনও মানসিক গন্ডগোলের পরিণতিতে এই ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমি যখন তাঁকে বললাম যে এই ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত করানোর কোনও প্রচেষ্টার কোনও কারণ বা প্রয়োজন নেই, তখন তিনি ভীষণ স্বস্তিবোধ করেছিলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্যারও ইতি ঘটেছিল। অতএব আপনার এই অন্ধকারে ভয় পাবার মধ্যে আমি কোনও বেঠিক কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

ইউ জী–র এই কথা শোনার পর আমি আর কখনও আমার সমস্যার সমাধানের খোঁজ করিনি। আমি অবশ্য এখনও অন্ধকারে ভয় পাই। কিন্তু আমি যে অন্ধকারে ভয় পাই সে ব্যাপারে আমার আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

সেদিন তাঁকে যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে জড়িত এবং কোনও একটা সোসাল ওয়ার্কে নিয়োজিত সংস্থার সভাপতি। তিনি ইউ জী–কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার মধ্যে আমি জনগণের প্রতি ভালোবাসার কোনও চিহ্ন দেখতে পাই না। এই যে চারিদিকে এত দারিদ্র আর তার যন্ত্রণাভোগ, আপনি কি সে ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন? মানবজাতির প্রতি আপনার শিক্ষার কোনও ব্যবহারিক উপযোগ আমার চোখে পড়ছে না।' ইউ জী–র উত্তর ছিল সম্পূর্ণ চাঁছাছোলা ঃ

> ''আপনি একজন সাধারণ ভালো মানুষ, অন্যের জন্য ভালো কাজ করার ভ্রান্ত ধারণায় অন্ধ। একজন ভালো মানুষ থাকার কি উপযোগিতা আছে? আপনার ভেতরে কোথা থেকে এই ধারণা এল যে আপনি বেঁচে আছেন অন্যের ভালো করার জন্য? অন্যের যাতে ভালো হয় সেরকম কাজ করে জীবনযাপন করাটাও একটা আত্মমগ্নকারী এবং আত্মকেন্দ্রিক কাজ। কিন্তু এটা স্বীকার করার সৎসাহস আপনার নেই। মানবজাতিকে সেবা করাটা আপনি আপনার জীবনের মিশন বলে মনে করেন। আপনার দেশকে সেবা করার জন্য আপনি যথেষ্টভাবে পুরস্কৃত হন। মানবিকতা শুধুই

> একটা এবস্ট্রাকশন। এছাড়া আর কিছুই নয়। মৃত্যুর শীতল হাত একদিন আপনাকেও ধরে ফেলবে। আপনি খুব ভালো করে জানেন যে আপনার জীবনের একদিন ইতি ঘটবে এবং সেই কারণেই আপনি মানবজাতির উপর আপনার চিরস্থায়িত্বের ধারণাকে আরোপ করার চেষ্টা করছেন। আপনি কোনওরকম পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারছেন না। আত্মা চিরস্থায়ী এবং পরজন্মের সব ধারণারও এই একই উৎস।''

একজন প্যারাসাইকোলজিস্ট তাঁকে তখন বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনার অলোকদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার উপর কোনও বিশেষ মতামত আছে কি?'' ইউ জী মাথা নেড়ে ব্যাখা করলেন ঃ

> ''মানুষ অন্যান্য প্রায় সমস্ত প্রাণীদের মতনই এসব ক্ষমতার অধিকারী। মানুষ তার অস্তিত্বহীন ও অলীক আত্মসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ভীষণ উদগ্রীব। সেই কারণে নিরন্তর চিন্তার সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে অনুবাদ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আর এখন বিভিন্ন যোগী আমাদের সেই ক্ষমতা পাইয়ে দেবার নামে দারুণ ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে।
>
> আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই তাতে করে আপনি দেখতে পাবেন পশু জগতে এই ক্ষমতার কার্যকারিতা। সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতের উপরে যেখানে আমাদের আস্তানা সেখানে প্রতি বছর ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে হরিণ শিকার করা আইনসম্মত। আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, ১৫ সেপ্টেম্বর দলে দলে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে সব হরিণ, পশু সংরক্ষিত বনের মধ্যে চলে আসে। আমাদের বাড়ির পাশেই স্যাংচুয়ারি যেখানে পশু শিকার করা নিষেধ। এই ঘটনাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?''

আজ পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাদের মধ্যে ইউ জী হলেন সবচেয়ে 'র‍্যাডিক্যাল ব্যক্তি' – বলেছিলেন আমার বন্ধু সুজিত সেন। ইউ জী–র বক্তব্য এবং কার্যকলাপের উপর সুজিত সবসময় শ্যেন দৃষ্টি রাখত। অনেক পীড়াপীড়ি করাতে দ্বিধাগ্রস্ত, অনিচ্ছুক সুজিত ইউ জী–র সঙ্গে দেখা করতে আসে।

সুজিত যুক্তিবাদী মানুষ, কোনওরকম ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক প্রবণতার লেশমাত্র তাঁর মধ্যে নেই। সে বামপন্থী এবং অতীতে এক উগ্রপন্থী দলের সদস্য ছিল। যাঁদের বিপ্লবের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এখন সুজিত সব কিছুতে তিক্ত বিরক্ত। জীবনের কোনও লক্ষ্য নেই। ক্রোধ ও হতাশার মধ্যে জীবনযাপন করছে। সুজিত জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘‘জীবনের কি কোনও উদ্দেশ্য আছে, ইউ জী?’’ ‘‘কেন জীবনের কোনও মানে বা উদ্দেশ্য থাকতে হবে?’’ ইউ জী উত্তরে জানালেন। ‘‘আমাদের কোনও কিছু আঁকড়ে ধরে থাকতে হয়, তা না হলে কোথায় হারিয়ে যাব। আর তাই যদি না হয় তবে কেন আমি আত্মহত্যা করব না?’’ সুজিত জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল। ইউ জী-র দ্বিধাহীন উত্তর ঃ

> আপনার কি তা করার সাহস আছে? সোজাসুজি গিয়ে যা করতে চাইছেন তা করে ফেলছেন না কেন? এটা ভুলে যাবেন না যদি ব্যর্থ হন তাহলে সমাজের আইন আপনাকে ছেড়ে দেবে না। আপনার বেঁচে থাকার মতন হিম্মত নেই। আপনার প্রাণ দেবার মতন সাহসও নেই। সেই কারণে স্বাধীনতা, সাম্যবাদ বা যা-ই আপনার আদর্শ হোক না কেন তার জন্য নিজের জীবন দান করতে নারাজ। এক কাজ করুন, হতাশাকে একটা নতুন নাম দিয়ে একটা দর্শন গড়ে তুলুন। তারপর বাজারে তাকে চালিয়ে দিন। সেটা হয়তো আপনাকে খ্যাতির আলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

সুজিত তখন বলল, ‘‘ইউ জী এটা কোনও হাসির ব্যাপার নয়, রসিকতা ছেড়ে, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতার শেষ হতে সম্ভবত খুব দেরি নেই। নতুন নতুন মারণাস্ত্র আমাদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করার হুমকি দিচ্ছে।’’ ইউ জী তখন সুজিতকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘‘এটা কি খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয়, এক নিঃশ্বাসে আপনি আত্মহত্যার কথা বলছেন আর পরবর্তী নিঃশ্বাসে বলছেন পারমাণবিক অস্ত্রের দ্বারা সামগ্রিক বিনাশের কথা?’’ তখন সুজিত ধীরভাবে উত্তর দিল, ‘‘হয়তো ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী বলে মনে হচ্ছে কিন্তু সত্যি কথা হল এটাই যে মানবজাতি আত্মহত্যার পথই বেছে নিয়েছে।’’ এই আলোচনা ইউ জী-কে বিষয়ের গভীরে নিয়ে গেল,

> তিনি বললেন, ‘‘হাইড্রোজেন বোমা এবং অন্যান্য পারমাণবিক

> অস্ত্রের মতনই আপনার মনও মানুষের ভবিষ্যতকে একই রকম ভীতি প্রদর্শন করছে। হাইড্রোজেন বোমা বানানোর মূল প্রক্রিয়া সেই আদিম মানুষের গাধার চোয়ালের হাড় দিয়ে অস্ত্র বানানোর মধ্য দিয়েই শুরু হয়। তখন গুহামানব সেই অস্ত্র ব্যবহার করত তার প্রতিবেশীকে হত্যা করার জন্য। এখন সভ্য মানবজাতি ঠিক সেদিন আদিম বর্বর মানুষ যা করেছিল আজ সেই জিনিসই করছে, কিন্তু আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে 'মানবজাতির মঙ্গল'-এর নাম দিয়ে। আজ যারা এই সমস্ত কার্যকলাপকে ঠিক মনে করে তারা এদের স্বপক্ষে এবং তারা মনে করছে সেই অস্ত্রশস্ত্র দুর্মতিগ্রস্ত সবাইকে ধ্বংস করে পৃথিবীর বুকে শান্তি ফিরিয়ে আনবে; প্রকৃতপক্ষে তারাই হল মানবজাতির আসল শত্রু। কীভাবে পৃথিবীর ধ্বংস হবে তাতে কিছু আসে যায় না – কোনও একটা বোমার আঘাতেই সেটা হবে। সে তার উপর তারা এবং সাদা লাল ডোরাকাটা চিহ্ন থাক, কাস্তে হাতুড়ি তারা থাক, চাঁদ তারা, ইহুদি তারা বা অশোকচক্রের ছাপ থাকুক না কেন।

সুজিত সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় এক রাজনীতিবিদ ইউ জী-কে অন্য প্রশ্ন করে প্রসঙ্গ পালটে দেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'যদি মানবজাতিকে নিজের এই বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ থেকে উদ্ধার করতে হয়, তাহলে ভারতের কি ভূমিকা থাকতে পারে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য? মানবজাতির প্রতি ভারতের সংস্কৃতি ও শিক্ষার কি কোন উপযোগিতা আছে? ইউ জী-র উত্তর, ''দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ভারতের না আছে কোনও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা না আছে কোনও সামরিক শক্তি যা কোনও উপকারে লাগতে পারে।'' সেদিন তিনি যা যা বলেছিলেন প্রতিটি শব্দের মধ্যে একটা প্রাণশক্তি ছিল, যেন সেকথাই শেষকথা বলে মনে হয়েছিল। তবুও আমার মনে হচ্ছিল যেন উনি আমাদের কারোও মধ্যে অযথা ভীতির সঞ্চার করছেন না। আমি তখন প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা, মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন দ্বারা কি এই ধ্বংস রোধ করা যায় না?' কিন্তু এর উত্তরে সেদিন তিনি যা বলেছিলেন তা শোনার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না ঃ

> ''মানুষ এক অতি সাধারণ জীব, এর বাইরে তার আর কোনও

অস্তিত্ব নেই। তার প্রকৃতিতে আধ্যাত্মিকতা বলে কোনও কিছু নেই। আপনাদের সমস্ত সদ্‌গুণ, বিশ্বাস, আদর্শ, ধারণা এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সমাজ আপনাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। এগুলো সম্পূর্ণ কৃত্রিম আচার আচরণ অবলম্বনের প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই না। এই সমস্ত জিনিস আপনাদের ভেতরে কোনও কিছুকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন ধর্ম শত শত বছর ধরে ধার্মিক লোকদের ভক্তি, আন্তরিকতা ও সার্বিক উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে তাদের শোষণ করে আসছে। 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাস' এই ভাবনার কোনও ফল নেই, কিন্তু যদি এরকম ভীতির সঞ্চার হয় যে 'প্রতিবেশীকে হত্যা করলে তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও ধ্বংস হবে' তাহলে সেই ধারণার হয়তো কিছু ভবিষ্যৎ আছে, কিন্তু কতদিন তা টিকবে সেটা অবশ্য যে কোনও লোকের অনুমানসাপেক্ষ হতে পারে।''

যৌন প্রতারণা মানুষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে। এক প্রখ্যাত চিত্রতারকা, আমি যে মহিলার সঙ্গে তখন থাকতাম তাকে প্রস্তাব করেছিল। আমি তখন রাগে জ্বলে উঠেছিলাম, হিংসার তীব্র জ্বালায় আমার প্রতিটি কোষে এক ধ্বংসাত্মক কম্পন জেগে উঠেছিল। আমার মনে হয়েছিল যেন বান্ধবী ও তার প্রস্তাবদাতা পুরুষকে একসঙ্গে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করি। আমার সেই পাশবিক প্রবল আবেগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আমি বেশিদিন চালাতে পারিনি, ধীরে ধীরে বুঝলাম এটা পরাজয়ের সংগ্রাম। ''প্রেম শর্তহীন'' রজনীশ বলতেন, যা আমার ঘরের দেওয়ালে বড় বড় করে লেখা ছিল। কিন্তু আমার গুরুর এই নির্দেশ আমার জীবনে কাজ করছে না। সেই সময় ইউ জী-র কাছে ছুটে গিয়েছিলাম, জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'হিংসা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে বান্ধবীর সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক রাখা কি সম্ভব?'' ইউ জী-র উত্তর ঃ

''আপনার তাদের হত্যা করার ইচ্ছাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এটাই সুস্থ প্রতিক্রিয়া। আপনার যদি অন্য কিছু মনে হত তাহলে বুঝতাম আপনার চিন্তাধারার মধ্যে কোনও গণ্ডগোল আছে, আপনি একজন অসুস্থ মানুষ। দুঃখের বিষয় হল, আপনার সংস্কৃতি আপনাকে ভণ্ড

> বা কপট হতে বাধ্য করেছে। যখন আপনার ও আপনার বান্ধবীর মধ্যে কেউ আসার প্রচেষ্টা করে বা আপনার প্রতি ছলনা হচ্ছে এই ধরনের সন্দেহ জেগে ওঠে, তখন হিংসার আগুনে আপনি জ্বলেপুড়ে যেতে বাধ্য, মানসিক যন্ত্রণা ও ঘৃণা হল এর পরিণতি। আজকের বাজারে যদি কোনও কুৎসিত সন্ন্যাসী এসে বলেন যে এটা সম্ভব, এ থেকে মুক্তির একটা রাস্তা আছে, আপনি হিংসা থেকে মুক্ত হয়ে যৌন সম্পর্কাদি বজায় রাখতে পারবেন তাহলে বুঝবেন যে তিনি আপনাকে প্রতারিত করে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমার পক্ষে এসব আবর্জনা নেওয়া আর সম্ভব নয়, এজন্য আমি দুঃখিত। যদি কোনওভাবে আপনার মধ্য থেকে হিংসা পুরোপুরি চলে যায়, তাহলে আপনার মধ্যে যৌনতা শেষ হয়ে যাবে। দেখুন যদি সম্পূর্ণ উন্মাদ না হয়ে এটা ঘটিয়ে ফেলতে পারেন, এ ব্যাপারে আমি আপনার পরম সৌভাগ্য ও সাফল্য কামনা করি।’’

যতবার আমি ইউ জী–কে দেখতে গেছি প্রত্যেকবার আমার মানসিক চিন্তাধারার গতি সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়ে গেছে। তার কাছে যেতাম সাহায্য চাইতে ফিরে আসতাম হতাশা নিয়ে। আমার এই হতাশ অবস্থাকে সেই গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির গল্পের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তার পায়ে কাঁটা ফুটে এক অসহ্য যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চলার পর সে আর একটা কাঁটা খুঁজে পায়, সে ভাবল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে যন্ত্রণার উপশম ঘটাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যা দেখল তা আগে সে কল্পনা করেনি, একটার বদলে দু’টো কাঁটাই পায়ে ফুটে গেছে। আমারও তখন সেই অবস্থা হয়েছিল, হিংসা আর হতাশা এই দুয়ে আমি বিদ্ধ, যন্ত্রণাকাতর। মনে হয়েছিল জীবন পথের শেষে এসে হাজির হয়েছি। হয়তো সেই হতাশা ও অসহায় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটাই রাস্তা ছিল। সম্পূর্ণ নির্বোধের মতো দায়িত্বহীন কোনও কিছু করে ফেলা।

তখন রাত দু’টো। এই নেশাগ্রস্ত আমি টলতে টলতে ইউ জী–র দরজায় এসে হাজির হই। কলিং বেলের শব্দে ইউ জী নিজেই এসে দরজা খুলে দেন। এখনও আমার পরিষ্কার মনে আছে সেদিন কি বলেছিলাম।

'আমি আজ আপনাকে খুন করতে এসেছি। এই পৃথিবীতে এত কিছু থাকতেও কেন আমাকে আপনার মতো লোকের সঙ্গে দেখা করতে হল? যে কোনও বিষয় দিয়ে শুরু করি না কেন, অবশেষে তা নিদারুণ হতাশায় পরিণত হয়।' ইউ জী শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপাতত একটু ঘুমিয়ে নিন, মহেশবাবু। এখানে একটা সোফা আছে। আমার কাছে অতিরিক্ত একটা কম্বলও আছে। আমাকে যদি খুন করতে চান, কালকে এ কাজটা আরও ভালো করে করতে পারবেন। যখন লোকজন থাকবে, পুরো ব্যাপারটা বেশ ঘটা করে একটা উৎসবে পরিণত করতে পারবেন।' কয়েক মিনিট এসব শোনার পর বললাম 'শুভরাত্রি'। ধীরে ধীরে তাঁর হাতটা হাতে নিয়ে একটা চুমু দিলাম, বললাম, 'আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি ইউ জী।' সেদিন থেকে শুরু হয়েছিল ইউ জী-র সঙ্গে আমার এক তরফা ভালোবাসার কাহিনি।

যতই তাঁর সঙ্গে দিন কাটাতে লাগালাম ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম যে তাঁর গভীর জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি বহু বছরের নিয়মিত শিক্ষা বা চর্চা থেকে আসেনি। যা তাঁকে সবার থেকে আলাদা করে রাখে তা পরিশ্রমলব্ধ নয়। এমন একটা জিনিস তাঁর মধ্যে আছে যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। অন্যকে চুপ করিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আছে, যার প্রকাশ বহুবার দেখেছি যখনই তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেন। যে প্রশান্তি তাঁর অভ্যন্তর থেকে নির্গত হচ্ছে তা তিনি কারোর উপর জোর করে চাপিয়ে দেন না। মনে হয় তা অন্যের মধ্যেও ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, যাঁরাই তাঁর আশপাশে থাকেন। এর উৎস কী? কেমন করে, কিসের সহায়তায় তিনি এমন এক অদ্ভুত অবস্থায় এসে পড়েছেন? তাঁর জীবন কি এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল? এইসব প্রশ্ন আমার মধ্যে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগল। আর সেই সময় একদিন তিনি আমায় বললেন তাঁর জীবনের গল্প, তাঁর সত্যের খোঁজ ....।

বাল্যকাল

“সত্যিকারের গুরু, যদি এমন কোনও ব্যক্তি থেকে থাকেন, তিনি নিজের কাছ থেকে আপনাকে মুক্ত করে দেবেন।”

– ইউ জী

উপ্পালুরী গোপাল কৃষ্ণমূর্তির জন্ম **১৯১৮** সালের ৯ জুলাই, দক্ষিণ ভারতের এক ছোট্ট শহরে,নাম মছলিপট্টনাম। ছোটবেলা কাটে গুড়িওয়াডা নামে এক নিকটবর্তী গঞ্জে। চারিদিকে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া। “বাবা! অনেক উপরে ওঠার ভাগ্য নিয়ে আপনার এই পৌত্রের জন্ম হয়েছে” – মৃত্যুপথগামী ইউ জী–র গর্ভধারিণী জননী এই ভবিষ্যৎবাণী তাঁর পিতাকে জানিয়েছিলেন। পুত্রকে জন্ম দেবার সাতদিন পরে ইউ জী–র মা পরলোকগমন করেন। ইউ জী–র দাদু অর্থাৎ থুম্মালাপল্লী গোপাল কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন এক অতি বিত্তবান ব্রাহ্মণ। সেই প্রসিদ্ধ আইনজীবী মৃত্যুপথগামী কন্যার শেষ কথা অত্যন্ত গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। নাতিকে শিক্ষা দীক্ষা দেবার জন্য তিনি তাঁর জাঁকালো ওকালতির ব্যাবসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন এবং নাতিকে নিজের হাতে মানুষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দাদু দিদিমা এবং তাঁদের বন্ধুবর্গের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এক যোগভ্রষ্ট পুরুষ এই পরিবারে জন্ম নিয়েছেন, পূর্ব জন্মে যিনি সামান্য কিছুর জন্য নির্বাণলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ইউ জী–র কথানুযায়ী বংশ পরম্পরা ছাড়া তাঁর জীবনে বাবার কোনও ভূমিকা নেই। যদিও বাবা একই শহরে বসবাস করতেন, তবুও একই ছাদের নীচে একত্রে থাকেননি। মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে ইউ জী–র বাবা আবার বিয়ে করেন এবং ছেলেকে দাদু দিদিমার হাতে মানুষ করার জন্য তুলে দেন।

১৮৭৩ সালে হেলেনা পেট্রোভা ব্লাভাটস্কি নামে একজন রুশি ভদ্রমহিলা মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের জন্য চলে আসেন। তিনি এবং মার্কিনি আইনজীবী কর্নেল ওলকট এই দুজনে মিলে থিওসফিক্যাল সোসাইটির গোড়াপত্তন করেন। মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মকে পঠন–পাঠন করেই তাঁদের একটা বিশেষ ধারণার জন্ম হয় এবং সঙ্গে বিভিন্ন ধ্যান ধারণার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই থিওসফিক্যাল সোসাইটির ভিত্তিস্থাপন হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সৃষ্টির রহস্যকে জানার মধ্য দিয়ে মানুষের অভ্যন্তরের সুপ্ত শক্তিকে আবিষ্কার করা। আস্তিক ও নাস্তিক উভয় রকমের ব্যক্তির কাছে এই সোসাইটির দরজা একই রকমভাবে খোলা থাকত। শুধু তাই নয়, গোঁড়া ভক্ত থেকে হালকা বিশ্বাসী, সবাই এখানে যাতায়াত করত। সেই সময় থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতি এক বিশেষ ধরনের শিক্ষিত শ্রেণি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যাঁরা ধর্মের গোঁড়ামিকে মেনে নিতে পারেননি, কিন্তু নিজেদের নাস্তিক বলেও ভাবতে পারেননি। অন্য আর এক শ্রেণির লোকও আকৃষ্ট হয়েছিলেন – যাঁরা স্পষ্টবাদী ও নিজেদের নাস্তিক বলে স্বীকার করতেন, কিন্তু মানুষের জীবন কোনও নিয়মনীতি বা আধ্যাত্মিকতা মেনে চলেছে কিনা তার অন্বেষণও করতেন।

যদিও টি জি কৃষ্ণমূর্তি ছিলেন এক বিশিষ্ট থিওসফিস্ট, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ইউ জী–র কথানুযায়ী, তাঁর মাতামহের ছিল তালগোল পাকিয়ে যাওয়া বিশ্বাস। একদিকে ট্র্যাডিশন এবং ধর্মনিষ্ঠা অন্যদিকে থিওসফির চিন্তাধারা। টি জি কৃষ্ণমূর্তি এই দুয়ের মধ্যে কোনওদিন ভারসাম্য আনতে সমর্থ হননি। আর এখানেই হয় ইউ জী–র সমস্যার সূত্রপাত।

যখন ইউ জী–র মাত্র তিন বছর বয়স তখন তিনি বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোর বদলে চোখ বুজে ধ্যান করতেন, বাড়িতে যে সমস্ত সাধু–সন্ন্যাসীদের যাতায়াত ছিল তাঁদের নকল করে। তাঁর পিতামহ শুধু সাধু–সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করেই ক্ষান্ত হতেন না, মাইনে করা পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেছিলেন বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনার জন্য। এক কথায় নাতিকে সঠিক পথে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য মন প্রাণ অর্থ দিয়ে বাড়িতে এক আদর্শ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। প্রত্যেকদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ইউ জী–কে উপনিষদ, পঞ্চদশী, নিষ্কর্মসিদ্ধি শুনতে হতো। এছাড়া বিভিন্ন বিশিষ্ট পণ্ডিতদের লেখা সেসব গ্রন্থের উপর ধারাভাষ্য, সেই ধারাভাষ্যের উপর উপস্থিত শিক্ষকদের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে তাঁর দিন কাটত।

সাত বছর বয়সেই ওই সমস্ত বই তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। প্রায় যেকোনও শ্লোক তিনি না দেখে বলে দিতে পারতেন।

১৯২৫ সালে যখন ইউ জী–র বয়স মাত্র সাত, সেই সময় ভগবান ব্যাপারটা তাঁর কাছে অবান্তর হয়ে যায়। ছোটবেলার এক ঘটনার মাধ্যমে তিনি শুধু এই সিদ্ধান্তে এসেই থেমে যাননি, উপরন্তু প্রার্থনার উপর তাঁর সমস্ত বিশ্বাসও চিরকালের মতো চলে যায়। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ঘটনা ঘটে। থিওসফিক্যাল সোসাইটি তখন মাদ্রাজের আডিয়ারে তাদের মুখ্য কার্যালয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ইউ জী–র দাদু আডিয়ারে থাকার জায়গার অগ্রিম সংরক্ষণ করতে না পারায় তাঁদের এই বিশাল অনুষ্ঠানে যোগদান না করার একটা আশঙ্কা দেখা দেয়, অথচ ইউ জী–র সেখানে যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছা। ইউ জী–র কানে এই সমস্যা পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন হনুমানকে একটা নারকেল দিয়ে মাদ্রাজ যাবার প্রার্থনা করবেন। কিন্তু ইউ জী–র সামনে তখন একটা অদ্ভুত সমস্যা, এর আগে যতবার নারকেল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রার্থনা করেছেন, ততবারই ফল পেয়েছেন। কিন্তু বহুবার নারকেল দিয়ে ওঠা হয়নি এবং এইভাবে প্রায় ৫০০টা নারকেলের প্রতিশ্রুতি বাকি পড়ে আছে। কিন্তু তখন এতগুলো নারকেল কেনার মতন পয়সাও ছিল না। তাহলে কি চুরি করে নারকেল যোগাড় করবেন? যদিও বা কোনওরকমে ৫০০টা নারকেল দেন, মন্দিরের নিয়মানুসারে প্রতি নারকেলের অর্ধেকটা বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে হবে। ৫০০টা আধখানা নারকেল রাখবেনই বা কোথায়? এই সমস্ত চিন্তা তাঁকে অত্যন্ত কোণঠাসা করে ফেলল।

হঠাৎ ইউ জী খবর পেলেন যে দাদু মাদ্রাজে যাবার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু কীভাবে এটা সম্ভব হল? হনুমানের সঙ্গে হিসাবের তো কোনও বোঝাপড়া হয়নি এখনও? কীভাবে তাহলে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়ে গেল? সেই সময় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে নিজের প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই দাদুর মত পালটেছে। তাঁর ভেতরটা সেদিন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, অবশ্য প্রার্থনার ফল দেখে নয়, কিন্তু এটা জেনে যে, নিজের ইচ্ছার কত ক্ষমতা।

১৯২৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর আডিয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়। সে ছিল এক রাজসিক উৎসব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু লোক প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে আসেন। এখানেই ইউ

জী প্রথম জে কৃষ্ণমূর্তিকে দেখেন এবং তাঁর বক্তৃতা শোনেন। বক্তা হিসাবে জে কৃষ্ণমূর্তিকে তাঁর ভালো লাগেনি। বক্তৃতার সময় বারবার তাঁর কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল এবং ঠিক ঠিক শব্দ খুঁজতে গিয়ে থেমে যাচ্ছিলেন। তখনই ইউ জী লক্ষ্য করেন যে অ্যানি বেসান্টের বক্তৃতার কাছে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতার কোনও তুলনা চলে না। ইউ জী-র কথানুযায়ী, অ্যানি বেসান্টের বক্তৃতা নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে পারত।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় মাদ্রাজের ইলিয়ট সমুদ্র সৈকতে ইউ জী হাঁটু জলে খেলা করছিলেন এবং ঝিনুক কুড়োচ্ছিলেন। আর সেই সময় জে কৃষ্ণমূর্তি তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সেখানে সান্ধ্য ভ্রমণে এসেছিলেন। দুই কৃষ্ণমূর্তির দৃষ্টি পরস্পরের উপর এসে ক্ষণিকের জন্য থেমে গিয়েছিল। কৃষ্ণমূর্তি তাঁর দল থেকে সরে এসে বালক ইউ জী-র সঙ্গে ঝিনুক কুড়োতে সামিল হয়েছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে তখন কি সেই বালক ঘুণাক্ষরেও জানত যে এই কৃষ্ণমূর্তি ভবিষ্যৎ-এ তাঁর জীবনের উপর কোনও ভূমিকা নেবেন?

ইউ জী-র তখন বারো বছর বয়স; সেই সময় ছাপাখানার লোক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গোপনে ছাত্রদের কাছে বিক্রি করত। স্কুল কর্তৃপক্ষ এই রকম ঘটনা এড়াবার জন্য স্টেনসিলের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং কপি করার পরই মাস্টার কপি নষ্ট করে ফেলতেন। একদিন ইউ জী তাঁর ক্লাসের দশজন বন্ধুকে নিয়ে কর্তৃপক্ষকে বোকা বানানোর এক পরিকল্পনা করেছিলেন। যাঁর উপর মাস্টার কপি নষ্ট করার আদেশ ছিল সেই কর্মচারীকে বন্ধুরা সবাই মিলে ১০০ টাকা ঘুষ দেন এবং প্রশ্নপত্র হাসিল করে নেন। পরীক্ষার আগের দিন ইউ জী ভাবলেন আমরা শুধু কয়েকজন কেন লাভবান হই, সবার এটা প্রাপ্য। যেই ভাবা সেই কাজ; সব ছাত্রকে গোপনে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেন। কর্তৃপক্ষ পরে ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই বুঝে ফেলে এবং বেচারা সেই কর্মচারীকে চাকরি খোয়াতে হয়। আবার সবাইকে পরীক্ষা দিতে হয় এবং ইউ জী আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা যথারীতি পরীক্ষায় ফেল করেন। ইউ জী-কে হয়তো স্কুল থেকেই বহিষ্কার করে দেওয়া হত, যদি তাঁর দাদু স্কুলের পরিচালকমণ্ডলীর একজন হোমরা-চোমড়া কেউ না হতেন।

সেই বাল্যকালেই এক নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা ইউ জী-কে সত্য অন্বেষণে দৃঢ়বদ্ধ করে তোলে। তাঁর দাদুর ধ্যান করার একটা আলাদা ঘর ছিল,

যেখানে প্রতিদিন দাদু দু-তিন ঘণ্টা ধ্যান করতেন। ইউ জী-র সে ঘরে ঢোকা নিষেধ। কারণ সে ঘরে যে সমস্ত দেবতুল্য বিশ্ব শিক্ষকদের (থিওসফির ধারণা অনুযায়ী) ছবি ছিল সেসবের উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ আছে ইউ জী-র নামে। ওই সমস্ত কর্তৃত্বের মহিমার ক্ষণদৃষ্টি পাওয়ার যোগ্য হতে হলে থিওসফিক্যাল সোসাইটির আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীতে দীক্ষিত হতে হত। থিওসফিতে গভীর নিষ্ঠাবান হয়ে কঠোর পরিশ্রমের সাক্ষ্য দিয়ে সেই আভ্যন্তরীণ গোষ্ঠী, যার নাম 'এসোটারিক সোসাইটি', তার সদস্য হওয়া যেত। এই নির্বাচিত কিছু লোককে প্রস্তুত করা হত মহান শিক্ষকদের প্রাচীন আধ্যাত্মিক অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের আলোর সামনে দাঁড়ানোর জন্য। যে আলোয় তাঁরা ভবিষ্যৎ পথ দেখতে পাবেন। এসোটারিক সোসাইটির সদস্য হওয়াটা ছিল অত্যন্ত গোপন ও দুরূহ ব্যাপার। সেই সময় ইউ জী-র বয়স খুব কম থাকায় তাঁর সদস্য হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু চোদ্দো বছর বয়সেই ইউ জী সেই যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেন। তথাকথিত 'আধ্যাত্মিকভাবে বিবর্তিত' কিছু সৌভাগ্যবান লোকই এই বাছাই করা ব্যক্তিদের শ্রেণিভুক্ত হতে পারতেন।

টি জি কৃষ্ণমূর্তি তখন ধ্যানে মগ্ন। তাঁর নাতনির মেয়ে কোনও কারণে বিষম কান্না জুড়ে বসেছে। কান্নার জোরালো আওয়াজ বৃদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ করে দিল। রাগে গর্জন করতে করতে ইউ জী-র দাদু সেই নাবালিকাকে সেদিন অমানুষিক প্রহার করলেন। অসহায়ভাবে তাঁর দাদুর এইরকম পাশবিক ব্যবহার দেখে ইউ জী মনে মনে বললেন, ''ধ্যানের সমস্ত কিছুই নিশ্চয় কোনও কৌতুকজনক ব্যাপার। এই সমস্ত লোকের জীবন অত্যন্ত অগভীর এবং ফাঁপা। এরা শুধু বড় বড় কথাই বলতে পারেন। এক কাল্পনিক ভয় এঁদের জীবনে অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে আছে। যে সব নীতিকথা এই সমস্ত লোকজন অন্যকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, তা নিজেদের জীবনেই কাজ করে না। কিন্তু কেন?'' এই জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে সেদিন তাঁর সত্যানুসন্ধান শুরু হয়। আর তা চলতে থাকে তাঁর উনপঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত।

১৯৩২ সালে ইউ জী-র চোদ্দো বছর বয়সে আরও তিনটে ঘটনা ঘটে যা পারম্পরিক ঐতিহ্য এবং প্রথাগত জীবনের উপর তাঁর বিতৃষ্ণা প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে তোলে। একদিন ইউ জী-র বাড়িতে শঙ্করাচার্য মঠের অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। এই ধরনের লোককে নিমন্ত্রণ করে আনার মতন সামর্থ তখন খুব কম লোকেরই

ছিল। মঠাধ্যক্ষ সাধারণত এক বিশাল ভক্তমণ্ডলী এবং নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বেশ কিছু ঘনিষ্ঠ লোকজন সঙ্গে না নিয়ে কোথাও যেতেন না। তার উপর ধার্মিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বিধিমাত্রায় পরিচালনার কাজ চালাতে অনেক সময় লাগত। অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ অর্থের সামর্থ্য এবং মানসিকতা ছাড়া এসব করা অসম্ভব। এই সব জাঁকজমক, রঙিন বস্ত্র শস্ত্র, মাথার মুকুট এবং রাজদণ্ডে সজ্জিত মঠাধ্যক্ষকে দেখে ইউ জী তখন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক করলেন বড় হয়ে মঠাধ্যক্ষই হবেন। ঘরবাড়ি, আত্মীয়-পরিজন সব ছেড়ে মঠাধ্যক্ষের চেলা হয়ে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মঠাধ্যক্ষের সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী হওয়ার বাসনা তাঁর মধ্যে অসাধারণভাবে জেগে উঠল।

এই সমস্ত কিছু ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে ইউ জী যখন ধর্মাত্মাকে প্রস্তাব দিলেন, মঠাধ্যক্ষ পুরোপুরি তাঁকে হতাশ করে দিলেন। 'তোমার বয়স অত্যন্ত কম, এসব করার সময় এখনও হয়নি, তাছাড়া তোমার দাদু-দিদিমা একথা শুনলে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, এ অসম্ভব।' কিন্তু ইউ জী-র মন সেসব মানতে রাজি হল না। 'আমার মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে' মনে মনে ভাবলেন ইউ জী। যাই হোক সেই মঠাধ্যক্ষ বাড়ি থেকে বিদায় নেবার আগে ইউ জী-কে ডেকে একটা 'শিবমন্ত্র' দিয়ে গেলেন। পরবর্তী সাত বছর প্রতিদিন তিনি যেখানে যখন থেকেছেন সেই 'মন্ত্র' তিন হাজার বার জপ করেছেন।

১৯৩২ সালে যথারীতি থিওসফিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে ইউ জী তাঁর দাদুর সঙ্গে মাদ্রাজের আডিয়ারে আসেন। সোসাইটির সভাপতি অ্যানি বেসান্টকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে প্রচুর লোক লাইন দিয়েছিলেন। হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে দাদুর সঙ্গে ইউ জীও সেদিন লাইনে অপেক্ষা করেছিলেন। তারপর যখন ইউ জী-দের পালা আসে, তখন তিনি লক্ষ্য করেন অ্যানি বেসান্ট তাঁর দাদুকে চিনতে পারেননি, কিন্তু ইউ জী-র মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। ইউ জী যখন অ্যানি বেসান্টের কোলে রাখা কাপড়ের উপর ধীরে ধীরে ফুলের তোড়া রাখছিলেন, তখন অ্যানি বেসান্ট সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি একদিন এই থিওসফিক্যাল সোসাইটির হয়ে কাজ করবে, তাই না?' ইউ জী অবশ্য তখন কোনও উত্তর দেননি।

শ্রী জীনারাজাদাস তখন ছিলেন সোসাইটির সহসভাপতি এবং অনুষ্ঠানের কাজ

দেখাশুনা করার সামগ্রিক দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। তিনি অ্যানি বেসান্টের পেছনে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ইউ জী–র দাদুকে আড়ালে ডেকে বলেছিলেন সন্ধ্যাবেলায় ইউ জী–কে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

সেই বিশাল অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে যখন সমস্ত লোকজন চলে যায় তখন শ্রী জীনারাজাদাস ইউ জী–কে নিজের নাম সই করা একটা বই উপহার দেন, বইটির নাম ছিল 'আই প্রমিস'। মহান শিক্ষকের স্বীকৃতি গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং শিষ্যত্বের প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে এই বইতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

সেদিন ইউ জী তাঁর মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করছিলেন। কিন্তু এমন এক ঘটনা সেদিন ঘটল যে এরপর তিনি সমস্ত রকমের ধার্মিক অনুষ্ঠান করা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেন। প্রত্যেক বছর এই দিনটিতে ইউ জী–কে উপবাস করতে হত। সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন সৎ ব্রাহ্মণকে নিজের হাতে পরিবেশন করে এবং তাঁদের চরণ ধোয়ার পরই ইউ জী–র খাবার সুযোগ আসত। তাছাড়া স্বর্গবাসী মায়ের ছবি মনে করে ধ্যান করতে হত, যে মাকে তিনি কখনও দেখেননি।

ইউ জী হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন, যে সমস্ত ব্রাহ্মণকে খাওয়ানোর পর তাঁর উপোস ভাঙার সুযোগ আসবে, তাঁরা দিব্যি পাশের রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া–দাওয়া করছেন। প্রচণ্ড ক্রোধে ইউ জী–র সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল, মনে মনে বললেন, 'শাস্ত্রানুযায়ী এই সমস্ত ব্রাহ্মণদেরও উপবাস করার কথা। যথেষ্ট হয়েছে, সব ভণ্ড, সমস্ত কিছু ভণ্ডামী।' সোজা দাদুর সামনে এসে দাঁড়ালেন, সবার সামনে এরকম একটা দিনে ইউ জী যা করেছিলেন, সেকালে এর থেকে বড় প্রতিবাদ আর কিছু ছিল না। বংশমর্যাদার এবং ধর্মের সবচেয়ে বড় প্রতীক গলার পৈতা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। দাদুকে বললেন, আমাকে টাকা দিন, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না। মনে মনে ঠিক করলেন নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে সত্য কি? দাদু বললেন, 'তুমি নাবালক, তোমার টাকা রাখার অধিকার নেই।' ইউ জী–র ক্রোধান্বিত উত্তর, 'আমি আপনার এক পয়সা চাই না, আমাকে আমার মায়ের টাকা দিন।' 'তুমি যদি এভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও তাহলে তোমাকে আমি ত্যাজ্য করে দিতে বাধ্য হব' এসব কথা বলে দাদু ভয় দেখানোর চেষ্টা করলেন। এর উত্তরে ইউ জী যা বলেছিলেন বৃদ্ধ মাতামহ তা স্বপ্নে কোনওদিন

আশা করতে পারেননি। 'আমার উপর আপনার কোনও অধিকার নেই, অতএব ত্যাজ্য করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

চোদ্দো থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত ইউ জী আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে ডুবে থাকেন। কঠোর আত্মসংযমের মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর অভ্যাস চালিয়ে যান। আর এসবের উদ্দেশ্য ছিল, তিনি জানতে চেয়েছিলেন 'মোক্ষলাভ' বলে সত্যি কিছু আছে কিনা। সমস্ত মহাপুরুষ এ নিয়ে এত কিছু বলে গেছেন যখন, আমাকে এটা পেতেই হবে। তিনি নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে একটা জিনিস প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত লোক কখনও কপটাচার বা ভণ্ডামী করতে পারে না। তিনি এরকমই একজন লোকের সন্ধান করে চলেছিলেন যিনি সত্যের প্রতীক।

সেই সময় হিন্দুধর্মের বাণী প্রচারক হিসাবে শিবানন্দ সরস্বতী নামে একজন মহান যোগী হিমালয়ে বসবাস করতেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানলব্ধ, কঠোর সংযমী এই মহাপুরুষের কাছে প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে ইউ জী যোগসাধনা শিখতে আসতেন। সাত বছর ধরে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর গভীর অনুসন্ধানের ভিত্তি স্থাপন হয়।

যোগ সাধনায় এই সময়ে শাস্ত্রে যত রকমের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার কথা লেখা আছে, ইউ জী-র এই সমস্ত রকমের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হয় – সমাধি, বিশিষ্ট সমাধি, নির্বিকল্প সমাধি সব কিছু। 'চিন্তাশক্তি মানুষের মধ্যে যে কোনওরকমের অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করতে পারে, স্বর্গীয় সুখ, পরম সুখ, পরমানন্দ, মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া – সমস্ত কিছু। কিন্তু আমি যে সত্য খুঁজছি এসব তা নয়, কারণ আমি আগে যা ছিলাম এখনও তাই আছি, যন্ত্রের মতো মন্ত্রতন্ত্র, ধ্যান করে চলেছি। এসব করে কিছুই হচ্ছে না' – মনে মনে ভাবলেন ইউ জী।

ইউ জী-কে তখন অন্য একটা জিনিস খুব চিন্তিত করে তুলেছিল। আর তা হল শরীরের যৌন সংক্রান্ত চাহিদা। কেন এ সমস্ত আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক লোকরা দেহের এই প্রাকৃতিক চাহিদাকে সবসময় উপেক্ষা করে অবদমিত করতে চায়? তিনি এই চাহিদার পরিণতি বোঝার জন্য ঠিক করলেন যে এ ব্যাপারে তিনি কোনও কিছু করবেন না। মনে মনে সংকল্প করলেন যে এই যৌনতার রহস্যকে জানতেই হবে। 'কেন আমি নিজে কিছু করে এই আকাঙ্খা বাড়িয়ে তুলব? আমার যৌন সংক্রান্ত কোনও জ্ঞানই নেই। তাহলে কোথা থেকে এসব ছবি মনের মধ্যে জেগে ওঠে?' এ ভাবনা তাঁর ধ্যানের বস্তু হয়ে দাঁড়াল।

> ‘‘কীভাবে আমার মধ্যে এ সমস্ত যৌন সংক্রান্ত প্রতিমূর্তি গড়ে ওঠে? আমি আজ পর্যন্ত কোনও বই বা সিনেমা দেখিনি যাতে কোনওরকম যৌনতার ছোঁয়া আছে। কোথা থেকে আমার মধ্যে এসব ছবি ভেসে ওঠে, যা বাইরে কখনও দেখিনি? লোকে বলে সমস্ত উত্তেজনার উৎস হল পারিপার্শ্বিক, এবং বাইরের কেউ এর উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু ভেতরেও নিশ্চয়ই কোনও উৎস আছে। বাইরের সবকিছু থেকে আমি নিজেকে হয়তো মুক্ত করতে পারি, কিন্তু নিজের ভেতরের উৎস কী করে বন্ধ করব?’’

ইউ জী–র যৌন সংক্রান্ত কোনও বাস্তবিক অভিজ্ঞতা তখনও হয়নি। কিন্তু তিনি বলেন যে সেই সময় উনি ভালোভাবে জানতেন কি সেই অভিজ্ঞতা। যেহেতু সেই সময় তাঁর ধ্যান জ্ঞান ছিল সাধু সন্ন্যাসী হওয়ার, অতএব বিয়ের কথা কখনও মনে আসেনি। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখলেন যে যদিও সবসময় তিনি দেবদেবীর কথা চিন্তা করতেন, কিন্তু তবুও তাঁর স্বপ্নদোষ হয়েছিল। তিনি মনে মনে ভেবেছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁর কোনও দোষ নেই, তাহলে কেন এত নিজেকে দোষী বলে মনে হচ্ছে? তাঁর ধ্যান, কঠোর নিষ্ঠাবান জীবনযাপন, নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ কিছুই এ থেকে তাঁকে মুক্ত করতে পারেনি। ঝাল, নুন ও মশলাজাতীয় খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাতেও কোনও কিছু ফল হয়নি।

ইউ জী–র যোগশিক্ষক শিবানন্দ সরস্বতী ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন যখন ইউ জী তাঁকে ঝাল চাটনি খাওয়ার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ‘‘কি করে এরকম একটা লোক নিজেকে এবং অন্যকে প্রতারণা করছেন। লোককে বোঝানোর চেষ্টা করছেন একরকম, আর কাজ করছেন আর একরকম। সারাজীবন নিজেকে সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত করেছেন কিছু একটা পাওয়ার জন্য, আর এখন এটুকু সংযম করতে পারছেন না। তিনিও কপটাচারী। এভাবে আমি জীবন কাটাতে পারব না।’’ আর সেই সঙ্গে তিনি শিবানন্দকে ত্যাগ করলেন, যোগাসন করাও ছেড়ে দিলেন।

যুবক ইউ জী–র কাছে তখন সব কিছুই ভ্রান্ত বলে মনে হতে লাগল। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে অবশেষে এক বিশ্ব নিন্দুকে পরিণত হলেন। ধার্মিক পরম্পরার উপর তিনি তখন থেকে এক দৃঢ় অবজ্ঞা পোষণ

করতে লাগলেন এবং এই মনোভাব ভবিষ্যতে একদিন বাজারের আধ্যাত্মিক ব্যবসায়ীদের প্রতি তীব্র ক্রোধে পরিণত হল। তিনি সবকিছু 'নিজের যেভাবে সঠিক বলে মনে হয়' সেভাবে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অদম্য কঠোরতার সঙ্গে সমস্ত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুললেন, কোনওকিছুকে নিজের উপর চাপিয়ে দিতে অসম্মত হলেন। ইউ জী-র দিদিমা সব সময় বলতেন, 'ওর হৃদয়টা কসাই-এর মতো' ভাবতে আর মোটেই অবাক লাগে না।

ইউ জী যখন ২১ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন তখন তিনি মোটামুটি নাস্তিক হয়ে গেছেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন; মনস্তত্ত্ব, দর্শন, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের উপর পড়াশুনা শুরু হল।

'মানুষের মন' ব্যাপারটা ইউ জী-কে সবসময় বিহ্বল করত। ''কোথায় এ মন? এর সম্বন্ধে আমাকে জানতেই হবে। আমি আমার মধ্যে মন বলে কোনও কিছু দেখতে পাই না।'' এর উপর চলল তাঁর আত্ম-দর্শন। 'কেন আমি এত সব পড়াশুনা করছি, এই সমস্ত জ্ঞান কেন আমাকে তৃপ্ত করতে পারছে না' – যতই দিন যেতে লাগল ততই এসব প্রশ্ন ইউ জী-কে গভীরভাবে বিচলিত করে তুলল। অবশেষে একদিন এক অধ্যাপকের কাছে গিয়ে হাজির হলেন।

> আমরা 'মন' নিয়ে সবসময় এত কিছু আলোচনা করছি, আপনি সত্যি করে বলুন তো আপনি কি জানেন 'মন' কি? মন সম্পর্কে আমি আজ পর্যন্ত যা জেনেছি তা ওই ফ্রয়েড, জুং এবং এডলারের লেখা পুঁথিগত জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সমস্ত জ্ঞানের বিবরণের এবং সংজ্ঞার বাইরে মন সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন?

''দেখ! এসব প্রশ্ন খুব বিপদজনক। যদি পরীক্ষায় তুমি পাশ করতে চাও, ওই সমস্ত মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে এবং ঠিকভাবে লিখতে পারলেই সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করতে পারবে।'' অধ্যাপক ইউ জী-কে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইউ জী-র উত্তর ছিল অপ্রত্যাশিত, 'আমার ডিগ্রি পাওয়ার কোনও আগ্রহ নেই। মন কি এটা জানার জন্যই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ব পড়তে এসেছি।' ইউ জী যখনই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর কথার স্মৃতিচারণা করেন, তখনই বলেন, সেদিন পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা

হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সেই অধ্যাপক ছিলেন একমাত্র সৎ লোক।

‘তিরুভান্নামালাইতে রমন মহর্ষি বলে একজন মহাপুরুষ থাকেন। চল তাঁকে দেখে আসি। সবাই বলেন, তাঁর মধ্যে নাকি হিন্দু ঐতিহ্যের মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে।’ ইউ জী-র এক অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁকে এই প্রস্তাব দিলেন যখন দু’জনে এসব বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা করছিলেন। জীবনের সেই সময় ইউ জী এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছান যে মানবজাতির ইতিহাসে সমস্ত মহান শিক্ষক – বুদ্ধ, যিশু, রামকৃষ্ণ পরমহংস ইত্যাদি নিজেদের প্রবঞ্চিত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সবাইকে – যারা সে পথে অনুগমন করেছেন। তাঁরা যে সমস্ত অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন, যে অবস্থায় সবসময় থাকতেন, সে অবস্থার সঙ্গে তাঁর শরীর যেভাবে কাজ করছে তার কোনও সম্পর্ক নেই। পবিত্র ধারণার কথা শুনলেই তাঁর মধ্যে এক আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হত। দার্শনিক ভাষায় যাকে বলে সমস্ত বিশুদ্ধ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে তাঁর ‘এক্সিস্টেনশিয়ালিষ্ট নসিয়া’ এসে গিয়েছিল।

> আমি পশুর মতন, আমি এক দৈত্য বিশেষ, আমার ভেতরটা সম্পূর্ণ হিংস্র। এটাই বাস্তবিক ঘটনা এবং আমার কাছে এটাই সত্য। আমার মধ্যেকার শত শত কামনা বাসনা এক জ্বলন্ত সত্য। আকাঙ্খাবর্জিত অবস্থা, ক্রোধহীন, লোভহীন অবস্থা, এ সবের কোনও অর্থই হয় না, সব মিথ্যা। শুধু মিথ্যাই নয় আমাকে সম্পূর্ণ প্রতারক হতে বাধ্য করছে। আমার কাছে ওইসব তথাকথিত জিনিসের কোনও মূল্য নেই। কোনও মহাপুরুষের চরণতলে বসার কোনওরকম ইচ্ছাই আমার নেই। একজনকে ভালো করে দেখলে সবাইকে দেখা হয়ে যায়।

‘শুধু একবার মহর্ষির সঙ্গে দেখা করে এস, তাঁর দৃষ্টি নাকি মানুষকে পালটে দেয়। তাঁর সামনে কিছুক্ষণ থাকলে শুনেছি মন চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। সব প্রশ্ন উবে যায়।’ বন্ধুটি ইউ জী–কে পীড়াপীড়ি করলেন। তারপর পল ব্রান্টনের লেখা ‘সার্চ ইন সিক্রেট ইন্ডিয়া’ বলে একটা বই ইউ জী–কে ধরিয়ে দিলেন। ইউ জী রমন মহর্ষির ভাগটা পড়লেন। তারপর ১৯৩৯ সালে, অর্থাৎ ২১ বছর বয়সে অনিচ্ছা, প্রতিরোধ এবং দ্বিধা সত্ত্বেও সেই বন্ধুর সঙ্গে ‘অরুণাচলমের ঋষি’কে দেখতে গেলেন।

ভগবান শ্রীরমন মহর্ষি তখন একটা ছবিতে কমিক বই পড়ছিলেন যখন ইউ জী তাঁকে প্রথম দেখেন। তাঁকে দেখামাত্র যে ভাবনাটা ইউ জী-র মাথায় এসেছিল তা হল, 'ইনি কীভাবে আমায় সাহায্য করবেন?' ইউ জী সেদিন দু'ঘণ্টা মহর্ষির সামনে বসেছিলেন। দেখলেন ভগবান তাঁর রান্নার সরঞ্জাম যোগাড় করলেন, সবজি কাটলেন এবং আরও অনেক টুকিটাকি কাজকর্ম করলেন। কিন্তু যে সমস্ত উচ্চ ধারণা নিয়ে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন যেমন 'তাঁর দৃষ্টি তোমার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এনে দেবে' বা 'তোমার মন চিন্তাশূন্য হয়ে যাবে' সেসব কল্পকথার কাহিনি হয়েই থাকল এবং এতে তিনি খুব আশ্চর্য হননি।

'নির্বাণ বলে কি কিছু আছে?' ইউ জী প্রশ্ন করেন। রমন মহর্ষির সরাসরি উত্তর, 'আছে বৈকি, নিশ্চয় আছে।' 'এর কি কোনও স্তর আছে?' আবার প্রশ্ন করলেন ইউ জী। গুরুদেবের উত্তর, 'না না, এর কোনও স্তর থাকা সম্ভব নয়। এখানে সমস্ত কিছু একক, হয় তুমি এই স্তরে আছ – আর তা না হলে কিছুই হয়নি।' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ইউ জী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে জ্ঞানালোক, এটা কি আপনি আমাকে দিতে পারবেন?' মহর্ষি চুপ করে রইলেন। ইউ জী আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনার যা আছে আপনি কি আমাকে তা দিতে পারেন?' এবার ভগবান ইউ জী-র দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উত্তর দিলেন, 'আমি তো দিতে পারি, কিন্তু তুমি কি নিতে পারবে?'

ইউ জী মনে মনে ভাবলেন, 'এটা কি ধরনের ঔদ্ধত্য! আমি দিতে পারি, কিন্তু তুমি কি নিতে পারবে? আজ পর্যন্ত আমাকে এরকম কথা কেউ বলেনি।' যত লোকের সঙ্গে তিনি এর আগে দেখা করেছেন সবাই বলেছেন কিছু না কিছু করতে। গত সাত বছর ধরে গভীর সাধনা করেছেন। কতদিন ধরে নিজেকে সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। ''যদি এই পৃথিবীতে এমন একজন সেই পরম বস্তু পাওয়ার যোগ্য থাকে তাহলে আমিই সেই জন, আমার দ্বারাই সে কাজ সম্ভব।'' ভাবলেন ইউ জী এবং প্রশ্ন আরও গভীরভাবে নিজের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল, 'কি সেই অবস্থা? এটা কি জিনিস হতে পারে যা তাঁর মধ্যে আছে? আমার থেকে শারীরিকভাবে তাঁর কোনও মূলগত পার্থক্য থাকা সম্ভব নয়, তিনিও কোনও বাবা-মা'র সূত্রে জন্মেছেন। লোকে বলে তাঁর মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটেছে। কিন্তু আমি কি করে জানব যে জ্ঞানালোক প্রাপ্তি, নির্বাণ বা মোক্ষ বলে আদৌ কিছু আছে

কিনা? এটা আমাকে জানতেই হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। আজ থেকে আবার শুরু হল আমার খোঁজ ....''

ইউ জী আর কোনওদিন রমন মহর্ষিকে দেখেননি। তিরুভান্নামালাই থেকে ফিরে আসার পর শুরু হল তাঁর প্রকৃত সত্য সন্ধান, এবং সেই সূত্রে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে গড়ে উঠল দীর্ঘ সম্পর্ক ....।

থিওসফিস্টদের মধ্যে জীবনকাল

"যখন তুমি কিছুই জান না, তখন অনেক কিছু বল। যখন সত্যি সত্যি কিছু জেনে ফেল, তখন বলার আর কিছুই থাকে না।"

– ইউ জী

১৯৯১ সালের ২৮ আগস্ট, লন্ডনে পৌঁছে গেছি। আমাদের প্লেনটা কোনওরকম ঝাঁকুনি না দিয়েই নিপুণভাবে ল্যান্ড করল। হাতে ঝোলানো একটা ব্যাগ নিয়ে প্লেন থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার লাগেজ বলতে শুধু এই ব্যাগটাই। ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এলাম। ট্যাক্সিতে ওঠার সময় চোখে পড়ল কমলা রং–এর বিশাল সূর্যটাকে, যেন গ্রীষ্মকালের এক নিখুঁত ভোরের অগ্রদূত হয়ে আকাশের বুকে আবির্ভূত হয়েছে। লন্ডনে এরকম গরম অস্বাভাবিক। ঘুমন্ত নগরীর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে ট্যাক্সির রেডিওতে কে যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ হয়ে আসছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করল। মনটা আমার ছুটে গেল দু' বছর আগে, স্পষ্ট মনে পড়ল ইউ জী–র কথা। তখন সারা পৃথিবী জুড়ে মিখাইল গর্বাচভের প্রশংসা চলছিল, তাঁকে অভিহিত করা হল 'দ্য ম্যান অফ দ্য ডিকেড' (এই দশকের প্রধান মানুষ) বলে। ইউ জী সেদিন বলেছিলেন, 'গর্বাচভ হঠাৎ পোকাভর্তি একটা বদ্ধ পাত্র খুলে দিয়েছে, মহেশ! এটাই হল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির সূত্রপাত।'

লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে আছে আমার অনিশ্চিত অতীত জীবনের বহু কাহিনি। নস্টালজিয়া কথাটার অর্থই হয়তো বেদনা। পরভীন ববির কথা মনে পড়ছে। তার স্মৃতি কেন জানি না কালস্রোতে ভেসে যাওয়া জীবন প্রবাহের কঠোর

আঘাতেও কিছুতেই মলিন হতে চায় না। লন্ডনের এসব রাস্তায় পরভীনের সঙ্গেই আমি জীবনে প্রথম ঘোরার সুযোগ পাই। 'মানুষ এক স্মৃতিসম্ভার। অতীত ছাড়া আর কিছুই না' – ইউ জী সবসময় বলেন। আমার মনে পড়ছে ১৯৭৯ সালের কথা, সেই বছরটাকে আমি আমার জীবন পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ বলে মনে করি।

পরভীনের প্রথম মানসিক ভারসাম্য হারানোর গল্পটা পুরানো ব্যাপার। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে এরকম একজন লোকের সঙ্গে বাস করা যে কি কঠিন ব্যাপার, জানি না সমব্যথী ছাড়া অন্য কেউ এটা ধারণা করতে পারে কিনা।

পরভীনের উন্মাদ হয়ে যাওয়া, যে কোনও উপায়ে পরভীনকে ক্যামেরার সামনে আনতে হবে বলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ক্রমাগত হুমকি, মনস্তত্ত্ববিদদের হাল ছেড়ে দেওয়া, এর উপর তার মায়ের চাপের মুখে পড়ে ইলেকট্রিক শক্ চিকিৎসার জন্য রাজি হয়ে যাওয়া – হে ভগবান, কি যে কঠিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে দিন কাটছিল তখন, তা বোঝানো কোনওভাবেই সম্ভব নয়। মনে মনে ভাবতাম, 'এই দুর্যোগের কি কোনও শেষ নেই?' ইউ জী–কে চিৎকার করে বলেছিলাম, 'ঈশ্বরের দোহাই আমাদের একটু সাহায্য করুন।' আমরা আমাদের করণীয় যাবতীয় কিছুর অন্তে চলে এসেছিলাম। আমার মনের অবস্থা এমন হয়েছিল যে তাঁকে অনুসরণ করতে আমি যে কোনও জায়গায় যেতে তখন রাজি। আর যদি তিনি বলেন, তাহলে ছাদ থেকেও লাফিয়ে পড়তে পারি। ইউ জী যথারীতি তাঁর হাত সাহায্যের জন্য আমাদের দিকে এগিয়ে দেন। সমস্ত চাপের আড়ালে তিনি আমাদের নিয়ে যান। এখনও ভাবতে খারাপ লাগে আমি আমার সমস্যা এবং পরভীনের অসুস্থতা কীভাবে তাঁর উপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম। এসব কি করে আমি কোনওদিন ভুলতে পারব? যখনই আমি কোনও সাহায্য চেয়েছি, তিনি মুখ বুজে তখনই তাঁর হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর এসবের জন্য উলটে তাঁকে প্রচার মাধ্যমের কাছে অনেকবার অপমানিত পর্যন্ত হতে হয়েছে।

সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, পরভীনকে নিয়ে কোডাইকানালে হাজির হলাম। সেখানে ইউ জী একমাস থাকবেন বলে ঠিক করেছেন। ইউ জী–র সঙ্গে থাকার ফলে তার কিছু সাহায্য হয়। পরভীনের অবস্থা ধীরে ধীরে ভালো হতে থাকে। 'কেউ সবসময় তাকে খুন করতে চায়' এই ভয়টা ততদিনে অনেক কমে এসেছে। ইউ জী তখন আমাদের মাথার উপর ভয়াল রোদকে আড়াল করে কিছুক্ষণের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস

নেবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সুখ আমাদের কপালে হয়তো বেশিদিনের জন্য লেখা ছিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই কোডাইকানাল এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। মনে পড়ল দান্তের লেখা ইনফারনো-র কথা। পরভীন নিজেকে সারাদিন এক ঘরে বন্দি বানিয়ে রেখেছে। শুধু খাওয়ার সময় কয়েক মিনিট বাইরে আসত। এদিকে ইউ জী-র শরীর বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না, হৃদযন্ত্রের ব্যথা তাঁকে বিব্রত করে তুলেছে। গত তিনদিন ধরে ইউ জী এক চুমুক জল পর্যন্ত খেতে পারেননি। ইউ জী-র প্রতি সমবেদনা দেখাতে গিয়ে পরভীনও খাওয়াদাওয়া পুরো বন্ধ করে দিয়েছে। বৃষ্টিতে ভেজা স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা কোডাইকানাল আমার কাছে এক দুঃস্বপ্নের রাত বলে মনে হতে লাগল।

সেদিন রাতে হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসহ্য যন্ত্রণা ইউ জী-কে বাকরুদ্ধ করে ফেলেছিল। কিছুক্ষণ পরে অনেক কষ্টে বহুকালের বন্ধু ভ্যালেন্টাইনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'মনে হচ্ছে আমার যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে!' ভ্যালেন্টাইন কিছুটা রসিকতা করে উত্তর দিলেন, 'ইউ জী এরকম একটা জায়গায় এই সময়ে দেহত্যাগ করাটা মোটেই কোনও কার্যকরী ব্যাপার নয়।' ইউ জী ভ্যালেন্টাইনের কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়লেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। শব্দটা চার দেওয়ালের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে রনরন করতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটা অদ্ভুত স্বস্তি দিয়ে ইউ জী-র বুকের ব্যথা যেন কোন শূন্যে মিলিয়ে গেল।

কোডাইকানালের শেষ সাতটা দিন ছিল চরম দুর্দশাময় এবং মানসিক যন্ত্রণাদায়ক। এ রকম বিক্ষুব্ধময় পীড়াদায়ক সময় আমার জীবনে আর কোনওদিন আসেনি। ওখানে সেদিন যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমার অবস্থা ছিল সবচেয়ে বেশি শোচনীয়। মনে আছে এ সমস্ত ঘটনা যখন চলছিল তখন একদিন প্রায় রাত বারোটার সময় ইউ জী বসার ঘরে একা একা ফায়ারপ্লেসে জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। আমিও ধীরে ধীরে তাঁর পাশে এসে বসলাম। তখন পরভীন ও আমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ঘেরা। মানসিক পীড়ায় আমি ক্ষতবিক্ষত। আমার মনের গভীর উদ্বেগ, বিষাদ ও নৈরাজ্য ইউ জী অনুভব করতে পারলেন। তিনি আমায় বললেন যে, পরভীনের পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রায় সমস্ত মানসিক গোলযোগই বংশানুক্রমিক। 'মনস্তত্ত্ববিদরা এটা ভালো

করে জানেন। কিন্তু তাঁরা এটা কখনও স্বীকার করবেন না। এতে তাঁদের ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যাবে।' ইউ জী আমায় উপদেশ দিলেন যে আমাদের বাঙ্গালোরে ফিরে যাওয়া উচিত। ওখানে ইউ জী–র কিছু বন্ধু আছেন যাঁরা 'ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ'–এর সঙ্গে জড়িত। এখন তাঁদের সাহায্যপ্রার্থী হওয়া দরকার। বাঙ্গালোরে পরভীনের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছিল।

ইউ জী নাকি গোখরো আর শঙ্খচূড় সাপেদের সঙ্গে সান্ধ্য ভ্রমণ করেন। এসব গল্প আমাকে বেশ বিচলিত করত। আমি একে কাল্পনিক এবং আজগুবি বলে সবসময় উড়িয়ে দিতাম। একদিন ব্রহ্মচারী শিবরাম শর্মার আশ্রমে বসে থাকার সময়ে ইউ জী–কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'শুনেছি আপনি নাকি শঙ্খচূড় সাপেদের সঙ্গে বেড়াতে যান, এটা আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।' ইউ জী নির্বিকারভাবে জানালেন 'সে দেখা যাবে'খন।' সেদিন সন্ধ্যাবেলা ইউ জী–র সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম আমি ও পরভীন ববি। তিনজনে একসঙ্গে হাঁটছি। হঠাৎ ইউ জী বলে উঠলেন, 'দাঁড়ান নড়াচড়া করবেন না।' আমাদের দু'জনকে পিছন থেকে থামিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'এবার নিজের চোখেই দেখে নিন, ওদের!' দেখলাম শুধু একটা সাপ নয়, সপরিবারে পুত্র কন্যা নিয়ে সবাই হাজির। আমি আর পরভীন সম্পূর্ণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে এলাম। আমি পরে বাড়িতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা বলুন তো, আপনার কি ভয় লাগেনি?' ইউ জী–র উত্তর,

> ''গোখরো সাপ তখনই ছোবল মারবে যখন ভয়ের গন্ধ পাবে। ভয় পাওয়া লোকের একটা বিশেষ গন্ধ থাকে। নিজেকে রক্ষা করার জন্যই সাপ ছোবল মারে। মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না। নিজেকে রক্ষা করার জন্য হয়তো একজন মানুষকে কামড়ায়, কিন্তু মানুষ বিনা কারণে শত শত সাপ মেরে ফেলে। আর যখন সব সাপ মরে যায়, তখন মাঠের ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি দারুণ বেড়ে যায়, ফলে প্রচুর ফসলের ক্ষতি হয়।''

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ইকলজি সম্পর্কিত জ্ঞানের উপর একটু আলোকপাত হল।

আমার মনে আছে যখন প্রথম আমায় ইউ জী বলেছিলেন পরভীন ববির জীবন থেকে দূরে সরে যেতে। ''আমি জানি ব্যাপারটা খুবই কঠিন, মহেশ।'' অনেক ইতস্তত করে ইউ জী বলেছিলেন, 'যা অবশ্যম্ভাবী তাকে সম্ভব করে তুলুন ....'

আমি বুঝলাম আমাদের সম্পর্কের শেষ হয়তো খুবই নিকটবর্তী। ব্যাপারটা শুনতে যদিও খুব আশ্চর্য লাগছে তবুও আমি জানি যে ইউ জী আমাদের দুজনকেই এটার মুখোমুখি হতে তৈরি করছিলেন। সুইজারল্যান্ডের গেস্টাডে একদিন ভোরবেলা পরভীনের হাত দেখে ইউ জী বলেছিলেন, 'আপনার ক্যারিয়ারে একটা ভাঙন আছে।' তখন পরভীনের বাজার রমরমা। 'আপনাদের সম্পর্ক টিকবে না' সেদিনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ইউ জী। তখন তিনি এসব কথা আমাদের যেভাবে বলেছিলেন মনে হয়েছিল যেন আমাদের সম্পর্ক নিয়ে তিনি কৌতুক করছেন, অথচ আমাদের দু'জনের ভেতরেই ধ্বংসের এক গভীর শঙ্কা জেগে উঠেছিল। এ ঘটনার পর কয়েক মাস ধরে পরভীন হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে ভীত সন্ত্রস্ত চোখে হাতের রেখা পড়বার চেষ্টা করত। যখনই খবর আসত ইউ জী বম্বেতে আসছেন, পরভীন আমাকে ইউ জী-র সঙ্গে দেখা করতে যেতে বারণ করত, নানারকমভাবে বাধা দিত আর বলত, 'ইউ জী তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁর সঙ্গে কিছুতেই দেখা করো না মহেশ। তুমি কি এখনও বুঝতে পারছ না, তিনি চাইছেন আমাদের সম্পর্ক যাতে ভেঙে যায়, আমরা যেন আলাদা হয়ে যাই।' সেই সময় ইউ জী পরভীনকে বলতেন, কিছু কিছু টাকা জমিয়ে রাখুন, ভবিষ্যতে যখন বর্ষাকাল আসবে তখন কাজে দেবে। সেদিনের সঞ্চয় আজ পরভীনের কাছে এক বিরাট সহায়, সম্বল।

২৬ অক্টোবর, ১৯৭৯ সাল, ইউ জী আমাকে একটা ট্যাক্সিতে বসিয়ে বিদায় দেবার সময় বললেন, 'ভবিষ্যতে যখন এই দিনটার দিকে তাকাবেন তখন নিজেই বলবেন যে এটা সত্যি সত্যি জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন ছিল। যান মহেশ, নিজের হাতে নিজের জীবন তৈরি করুন। এই মহিলাকে আপনার পক্ষে সাহায্য করা আর সম্ভব নয়। আপনাদের সম্পর্ক শেষ।' সবকিছু একদিন শেষ হয়ে যায় এবং সমস্ত সমাপ্তির একটা অন্তিমকাল থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে পরভীন ববির সঙ্গে আমার আড়াই বছরের সম্পর্ক, তার উপর আমার নির্ভরতা এবং আমাদের পরস্পরের উপর স্বেচ্ছাকৃত সুযোগ নেওয়ার সমাপ্তি ঘটল।

ইউ জী-র সঙ্গে আমার সম্পর্ক আমাকে বিধ্বস্ত এবং ভীষণ একা করে ফেলল। আমার অন্তরে সমস্ত বিভ্রান্তিকর প্রতিচ্ছবিগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, মনে হল, আমার জীবন পুরোপুরি ব্যর্থ। কর্মক্ষেত্রে তখন আমার পরিচয় 'ফ্লপ ডাইরেক্টর'

বলে, আর লোকে আমার সম্পর্কে আলোচনা করত পরভীন ববির প্রেমিক হিসাবে। কিন্তু এই কঠোর উপলব্ধির মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়ে আমার ভেতরে এক অপরিসীম দৃঢ়তা এবং প্রেরণা জন্ম নিল, নিজেকে কিছু একটা করে তুলতেই হবে, এই ভাবনায় বদ্ধপরিকর হলাম। 'নিজের ব্যর্থতাকে নীতির দোহাই দিয়ে কোনওদিন মেনে নেবেন না। যদি জীবনে সফলতা অর্জন করতে না পারেন, তাহলে আমি আপনাকে কখনও ক্ষমা করব না।' আদেশের সুরে একথা বলে ইউ জী যেন আমার ক্ষতবিক্ষত অন্তরে নুন ছিটিয়ে দিলেন। আজ তেরো বছর পর লন্ডনের সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বুঝলাম সেদিন আমাদের নিম্নমানের সম্পর্কের ছেদ ঘটিয়ে, আমাদের পরস্পরের উপর নির্ভরতার সমাপ্তি ঘটিয়ে এবং কোনওরকম সাহায্য না করে, ইউ জী আমাকে নিজের পায়ে হাঁটতে সমর্থ করেন। এখন জীবনের বর্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ করে একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে যেদিন ইউ জী আমাকে পরভীনের জীবন থেকে চলে যেতে বলেছিলেন, সেদিনটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সুখের দিন।

আমি ইউ জী–র সঙ্গে লন্ডনের যে বাড়িটায় ছিলাম সেটা ৩৩ ওডিংটন স্কোয়ারের উলটোদিকে অবস্থিত। এখানে থাকতেন শ্রী জীনারাজাদাস, থিওসফিক্যাল সোসাইটির আভ্যন্তরীণ বিভাগের প্রধান। পরে তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হন। ভারতে থাকাকালীন ইউ জী–কে তিনি কিছু চিঠিও লিখেছিলেন।

১২ জুলাই, ১৯৪০

প্রিয় ভ্রাতা,

আমি তোমার উপলব্ধি ও প্রশ্নের শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে পারি।

এটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক যোগাযোগ যে তোমার মধ্যে সেই সব আদর্শ আছে যা এপথে যাঁরা চলতে চান তাঁদের থাকা উচিত, তা হল সেবা করার আদর্শ। তোমার সামনে যখন কোনও সমস্যা আসে, তার সমাধান হয়তো খুঁজে পাবে যদি থিওসফির শিক্ষার আলোতে সেই সব সমস্যাগুলোকে তুলে ধরো। তোমার শিক্ষক অন্বেষণ করার বাসনার বিষয়ে আমি একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই।

নিম্নলিখিত চিঠিটা স্বর্গীয় ভ্রাতা সি. ডব্লু. এল.–কে লেখা মহান শিক্ষক কে. এইচ.–এর উত্তর, যখন ১৮৮৩ সালে শিক্ষক সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় ঃ

''যে কোনও লোককে শিষ্য বলে গ্রহণ করাটা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে একজনের নিজের উৎকর্ষতার উপর এবং এ পথে আসার জন্য তাঁর কতটা আগ্রহ আছে তার উপর। যে কোনও মহান শিক্ষককে আপনি বেছে নিতে পারেন। তাঁর নাম নিয়ে ভালো কাজ করুন এবং মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করুন। শুদ্ধ থেকে সঠিক পথে (যা আমাদের নিয়মে বলে) চলতে দৃঢ়বদ্ধ হোন। সৎ এবং নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করুন। নিজেকে ভুলে যান, শুধু মনে রাখবেন কিসে অন্যের মঙ্গল হয়, দেখবেন 'শিক্ষক' আপনাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।'' আমি যখনই আমার শ্রোতাদের 'মহান আদর্শে'র কোনও একটা দিক নিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করি তখনই ফ্রান্সিস হাভেরগল–এর এই স্তোত্রটা ব্যবহার করি।

যখন ভারতে ফিরব তখন সাক্ষাতে পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করতে পারব। ইতিমধ্যে যে নির্দেশের প্রয়োজন বোধ করছ তা নিজের ভেতরে দেখার প্রয়াস কর। যখন শান্ত হয়ে, প্রবুদ্ধ হওয়ার অনুভূতি নিয়ে ধ্যানস্থ হবে, দেখবে অপরকে উপকার করার ব্যাপারে ভেতর থেকে পরামর্শ ও আদেশ আসবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্দেশানুসারে কাজে লেগে যাও। যদি কোনও ফল দেখতে না পাও তার জন্য ভাবার কিছু নেই। মনে রেখো, গীতার সেই মহান শিক্ষাকে, ফলের সমস্ত চিন্তাকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে, শুধু কাজ করাটাই অধিকারলব্ধ সেটাই তোমার অস্তিত্বের দৈবসূত্র, একমাত্র সেই নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমেই তুমি তোমার হৃদয় থেকে ঈশ্বরকে কিছু অর্পণ করতে পারবে।

তোমার অকৃত্রিম অন্তরঙ্গ
সি. জিনারাজাদাস

১৯৪০ সালের শেষের দিকে শ্রী জীনারাজাদাস ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইউ জী–র মাতামহ নির্মিত একটি বিশাল কার্যালয়ের (বিভিন্ন রকমের সুযোগ–সুবিধা সমৃদ্ধ ভবন) উদ্বোধন করেন তিনি। এই প্রতিষ্ঠানের গৃহটির নির্মাণ হয় অন্ধ্র থিওসফিক্যাল ফেডারেশনের মুখ্য কার্যালয় হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রী জীনারাজাদাস ইউ জী–দের বাড়িতে দু'দিন থেকে ছিলেন।

সে বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে ইউ জী লেডবিটারের নিজস্ব পুস্তকাগারে কাজ করার সুযোগ পান। তিন মাস ধরে লাইব্রেরির সব বইকে নতুন করে সাজানোর দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর উপর। ইউ জী–র খুব আশ্চর্য লাগত কীভাবে লেডবিটার জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির পূর্বজন্মের কথা লিখেছিলেন। 'লাইভস অফ অ্যালসিয়ান' নামে বইটি তখন প্রকাশিত হয়েছে। যখন ইউ জী লেডবিটারের লাইব্রেরিতে বিরল প্রাচীন সব পুস্তকাদি দেখলেন তখন মনে মনে ভাবলেন, ইনি পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার উপর লেখা সব বই পড়েছেন। আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে তিনি এ সমস্ত সভ্যতার সঙ্গে কৃষ্ণমূর্তির পূর্বজন্মের জীবন নিপুণভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। এমনিতেই লেডবিটারের অলোকদৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে ইউ জী–র খুব সন্দেহ ছিল। তারপর তা আরও বেড়ে গেল; অথচ এই ক্ষমতার জোরেই থিওসফির আন্দোলন জোরদার হয় বলে সমকালীন সদস্যদের ধারণা ছিল। ছোটবেলায় ইউ জী রোজ লেডবিটারের সামনে বসে থাকতেন, যদি হঠাৎ কোনও আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার প্রকাশ দেখতে পান এই আশা নিয়ে। ইউ জী ভয়ানক হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ লেডবিটারের মধ্যে কোনও কিছুর সম্ভাবনা কখনও দেখেননি।

সে যাই হোক, এই লাইব্রেরিতে কাজ করার সুবাদে তিনি জীনারাজাদাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন। তিনি মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে এসে ইউ জী–কে পরামর্শ দিতেন বিশেষ বিশেষ প্রাচীন বই পড়ার জন্য।

ইউ জী–র ছোটবেলা, তাঁর মতে, কোনও ঋষির জীবন কাহিনির মতন নয়। ইউ জী নিজেই বলেন, 'ছাত্র হিসাবে আমি খুবই খারাপ ছিলাম, তা স্কুলেই বল বা কলেজে বল। আজ পর্যন্ত কোনওদিন কোনও পরীক্ষায় প্রথম প্রচেষ্টায় পাশ করিনি।' কলেজে থাকাকালীন থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ডাঃ অরুণডালের লেখা চিঠি তাঁকে সমবেদনা জানাত এবং উৎসাহিত করত পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার

জন্য।

১০ জুলাই, ১৯৩৯

৮ জুলাই আমাকে লেখা চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই। এটা আমি বেশ ভালো করে বুঝতে পারছি যে পরীক্ষার ব্যাপারটা অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং সত্যি এর কোনও মূল্য নেই। কিন্তু এসবের মধ্য দিয়ে যেতেই হয় কারণ বাইরের জগতের জন্য এসব সরঞ্জামের দরকার হয়। তোমায় এখানকার দপ্তরে পেয়ে খুব ভালো লেগেছিল। আশা করি মাদ্রাজে আবার যখন আসবে তখন আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০

ব্যক্তিগতভাবে তোমার উপর আমার অনেক উচ্চাশা, আডিয়ারে তোমায় দেখতে সবসময় আমার খুব ভালো লাগে। আশা করি এবার তুমি পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে।

২০ মে, ১৯৪০

তোমার পুনরায় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার খবর পেয়ে খুবই মর্মাহত হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পরীক্ষার যোগ্য নয়। অবশ্যই আমরা অন্য কোনও কাজ আরও ভালো করে করতে পারি। তোমার যদি চালিয়ে নেবার মতো পয়সা থাকে তাহলে তোমার যা ভালো লাগে তাই নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাও। আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি জিজ্ঞাসা কর তাহলে বলব আমার মনে হয় না তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যজীবনের কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে।

২৩ অক্টোবর, ১৯৪০

তোমার পরীক্ষায় সাফল্যের খবর আমাকে যারপরনাই আনন্দিত করেছে। এটা সত্যিই অত্যন্ত ভালো খবর। আমার স্নেহময় আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর।

ইউ জী-র কলেজে পড়ার ব্যাপারে তাঁর নিজের মন্তব্য হল ঃ

যদিও আমি ফেল করতে করতে কোনওরকমে স্কুলের গণ্ডি পার

হয়েছি, তবুও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে অনার্স নিয়ে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। সাধারণত খুব মেধাবী ছাত্রদের জন্য এ সমস্ত কোর্স তৈরি হয়েছিল। আমার অবশ্য কোনও মেধাই নেই, কিন্তু দর্শনের অধ্যাপকদের ছাত্রের প্রয়োজন। পুরো ক্লাসে মাত্র চারজন ছাত্র। তাই কর্তৃপক্ষ আমাকে নিতে রাজি হয়েছিল। পড়াশুনার উপর আমার বীতশ্রদ্ধার কথা অবগত হওয়ার পর অধ্যাপক রসিকতা করে বলতেন তাঁর ক্লাসে সাড়ে চারজন ছাত্র। আমি কোনও পরীক্ষায় বসতাম না। ফাইনাল পরীক্ষাই দিতাম না, তা হাফ–ইয়ারলির তো কোনও প্রশ্নই উঠত না। যখন রেজাল্ট পেতাম তখন তাতে অনুপস্থিতি ছাড়া আর কিছুই লেখা থাকত না।

অবশেষে একদিন প্রিন্সিপাল আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমার সামনে আমার শেষ পরীক্ষার ফল তুলে ধরলেন। আমি রেজাল্টের যেখানে অভিভাবক বা পিতা–মাতার স্বাক্ষর লাইনটা থাকে সেটা কেটে দিয়ে নিজের নাম সই করে দিলাম। প্রিন্সিপাল বললেন যে মার্কসিট গার্ডিয়ানের (দাদুর) কাছ থেকে দস্তখত করিতে আনতে হবে। যদি আমি তা না করি তাহলে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। আমি উত্তরে বললাম, তাতে কারও কোনও অসুবিধা হবে না, আমি নিজে ইমপেরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (যেখানে সরকারি টাকার লেনদেন হয় এবং ধনী লোকদের অ্যাকাউন্ট থাকে) একটা চেক সই করে এখুনি সে টাকা জমা দিতে পারি। প্রিন্সিপাল আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে কেন তুমি কলেজে পড়ছ?' আমি বললাম, 'অন্য আর ভালো কিছু করার নেই বলে।' তিনি আমার কথাটা মেনে নিতে পারলেন না। বললেন যে আমি যেন অবশ্যই আমার দাদুর কাছ থেকে রেজাল্ট সই করিয়ে আনি। কিন্তু আমার সৌভাগ্য আর তাঁর দুর্ভাগ্য, প্রিন্সিপাল পরেরদিনই হার্ট অ্যাটাকে পরলোকে চলে যান।

রাজনীতিবিজ্ঞ এবং পারদর্শীদের মূল্য সম্পর্কে ইউ জী–র মন্তব্য হল ঃ

এই সময় বেশিরভাগ দিন আমি আডিয়ারে থাকতাম,

থিওসফিক্যাল সোসাইটির মুখ্য কার্যালয়ে ডঃ অরুণডালের নিজস্ব সহকারীর কাজ করতাম। আমার কাজ ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পড়ে তাঁর কাজের দরকারি খবর বেছে রাখা, যাতে অবসর সময়ে তিনি সেগুলো পড়ে নিতে পারেন।

সেই সময় আবিষ্কার করলাম 'টাইম ম্যাগাজিন' (গত পঞ্চাশ বছর ধরে টাইম ম্যাগাজিন পড়ছি, পুরো প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি; পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলী তারা যেভাবে তুলে ধরে তা আমার কাছে উপভোগ্য) আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও আবিষ্কার করলাম যে, বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংস্কারমুক্ত সময় বলে মানুষের সমাজে কিছুই নেই। তখন ছিল যুদ্ধের সময়, 'টাইম ম্যাগাজিন' পত্রিকা আসতে ছ'মাস লাগত। কিন্তু কোথায় কি ঘটনা ঘটেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর পেতাম বিবিসি এবং অন্যান্য দৈনিক পত্রিকা থেকে। সেই সময়ের দু'জন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের বিভাগীয় লেখক ছিলেন ওয়াল্টার লিপম্যান এবং এইচ. ভি. কাল্টেনবর্গ। ওয়ালটার লিপম্যান ছিলেন সর্বজ্ঞ এবং সবসময় যুদ্ধের ফলাফল কি হবে সেই নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতেন; দুঃখের বিষয় প্রায় সব সময় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হত। কাল্টেনবর্গ সংবাদ সমীক্ষক এবং বিশ্লেষক, ট্রুম্যান এবং ডেওয়ের ভোট যুদ্ধের ফলাফল ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর মতানুযায়ী ডেওয়ের বিরাট ব্যবধানে জেতার কথা, এবং একথা তিনি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন। যখন খবর আসতে লাগল যে ভোটের যুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় ট্রুম্যান এগিয়ে আছেন, তখন প্রকাশ্যে তিনি ঘোষণা করলেন যে এটা সাময়িক বিপত্তি, শেষ পর্যন্ত ট্রুম্যান হেরে যাবেন। পরের দিন সকালের সবচেয়ে বড় খবর ছিল ট্রুম্যানের জয়। এসব ঘটনার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম যে, ভারতের কোনও দূরপ্রান্তের অশিক্ষিত লোকের সঙ্গে এই বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিভঙ্গির যথাযোগ্যতার পরিমাপ নিলে

> দেখা যাবে এ দু'য়ের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই।
> আজ আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, আধ্যাত্মিক বা জাগতিক কোনও শিক্ষকের কাছ থেকে আমি কিছুই শিখিনি।

১৯৪৬ সালে জীনারাজাদাস থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন এবং ইউ জী–কে দেওয়া হয় ভারতীয় শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের পদ। ইউ জী এই পদে তিন বছর কাজ করেছেন। অবশেষে যখন এই পদের বিলোপ ঘটে তখন তিনি লেকচারারের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে থাকাকালীন তিনি ভারতের প্রায় সমস্ত কলেজে বক্তৃতা দেন। পরে তিনি এক দীর্ঘ সফরে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় এবং উত্তর আমেরিকায় যান বক্তৃতা দিতে। সেই সময় ইংল্যান্ডে থিওসফিক্যাল সোসাইটির বাৎসরিক সম্মেলনে ইউ জী বক্তৃতা দেন যেখানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী জীনারাজাদাস।

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন ১৯৫৩ সালের মে মাসে তিনি শেষবারের মতো জীনারাজাদাসকে দেখেন। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে এই ৩৩ ওডিংটন স্কোয়ার, নাইটসব্রিজ লন্ডনে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে ইউ জী–র প্রথম যোগাযোগ হয় জীনারাজাদাসের মাধ্যমে এবং সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্কের শেষ হয় এখানেই জীনারাজাদাসের সঙ্গে দেখা করে। জীনারাজাদাস ইউ জী–কে সেদিন যা বলেন, তা নিম্নরূপ ঃ

> থিওসফিক্যাল সোসাইটির এবং কৃষ্ণাজীর সম্পর্কিত ব্যাপারে তোমার প্রতিক্রিয়ার কথা আমি শুনেছি – সমস্ত কিছুর প্রতি এবং সবার উপরেই তোমার ভাবনা তীব্র সমালোচনামূলক। আমি তোমার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি জানতে খুবই উৎসুক এবং এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে আগ্রহী। আমার পরামর্শ হল, তুমি তোমার ভাবনাগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধের আকারে থিওসফিস্টদের জন্য লেখ। তোমার ধারণাকে সমর্থন করে তুমি মুক্তভাবে যাকে ইচ্ছা সমালোচনা করতে পার – সভাপতি, সম্পাদক এবং যে কোনও ব্যক্তিকে। থিওসফিক্যাল সোসাইটির অঙ্গনে পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত প্রবন্ধগুলো আমরা সাদরে গ্রহণ করব। কেবলমাত্র এরকম

> নিঃসংকোচ এবং মুক্ত মনোভাব প্রকাশ করার মধ্য দিয়েই কোনও সংস্থা তার সক্রিয় শক্তি ও সহনশীলতা নিয়ে টিকে থাকতে পারে। তুমি যদি মনে কর যে, থিওসফিক্যাল সোসাইটির বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত তাহলে তোমার লেখায় সেটাই ব্যক্ত কর। সদস্যদের এ ব্যাপারে অবগত হতে দাও। তাহলে তাঁরা চিন্তা করতে শুরু করবেন। আমার বিশ্বাস আমি এই লেখা পড়ে অনেক উপকৃত হব।

এসব সত্ত্বেও উত্তরে ইউ জী বলেন, তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটি এবং তার আভ্যন্তরীণ (এসোটারিক) বিভাগ থেকে পদত্যাগ করতে চান। জীনারাজাদাস অত্যন্ত হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তখন বলেন যে, তিনি আমেরিকায় যাচ্ছেন এবং বছরের শেষের দিকে ভারতে ফিরে আসবেন। আসার পর ইউ জী–র সঙ্গে এই ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করবেন। কিন্তু আমেরিকায় সে বছরই জুলাই মাসে জীনারাজাদাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইউ জী তখন ইউরোপে থিওসফিক্যাল সোসাইটির তরফ থেকে তাঁর বক্তৃতার সফর চালিয়ে যান। অসলোতে তিনি 'এক পৃথিবীর আন্দোলন'–এর (ওয়ান ওয়ার্ল্ড মুভমেন্ট) পক্ষে অভিভাষণ দেন। জার্মানির রেন্ডসবার্গে অনুষ্ঠিত এক গ্রীষ্মকালীন স্কুলে তিনি সম্মানিত অতিথি হিসাবে, 'মানুষ, প্রকৃতি ও বাস্তবতা'র উপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। ইউরোপে থিওসফিক্যাল সোসাইটি তখন সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছিল। সোসাইটির সদস্যবর্গের সম্পাদকের আমন্ত্রণে ভারতীয় জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি এবং চিন্তাধারার উপর তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

ব্রাসেলসে এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা দেন। সেখানে মোট আঠাশ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে পঁচিশ জন ছিলেন টেনিস সু পরিহিতা বৃদ্ধা যাঁরা বসে বসে সোয়েটার বুনছিলেন। সেই সময় ইউ জী মনে মনে ভাবলেন, ''আমি কি এভাবে থিওসফির জন্য এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির জন্য সারাটা জীবন কাজ করব? আমি যা বলছি তা সব পরোক্ষ জ্ঞান। যে কোনও লোক, যার একটু মাথা আছে, বিভিন্ন বই পড়ে এসব আওড়াতে পারবে। এর মধ্যে আমি কোনও বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি না। এসব আমি কি করছি? শুধু শুধু আমি কেন সময় নষ্ট করছি?'' জার্মানির রেন্ডসবার্গে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে গ্রীষ্মকালীন

স্কুলে তিনি এই বক্তৃতা দেন ঃ

॥ থিওসফি সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ॥

থিওসফিক্যাল চিন্তাধারা অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের প্রেরণালব্ধ চিন্তাধারার ইতিহাস হল, মানুষের আধুনিক চিন্তাধারার বিবর্তনের ইতিহাস। অন্য সমস্ত কিছুর মতনই, এই সোসাইটির বিভিন্ন পর্যায়ের চিন্তাধারাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করলে এটাই দেখা যাবে যে তা মানুষের চিন্তাধারার প্রগতি এবং স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রতিফলন মাত্র। সোসাইটির যাঁরা কর্ণধার তাঁদের স্থান শুধুমাত্র থিওসফিক্যাল আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাঁদের ভাবনা প্রভাব বিস্তার করেছে সমগ্র বিশ্ব চিন্তার ইতিহাসে। গত সাতাত্তর বছরে বুদ্ধিজগতে যে প্রগতি ঘটেছে তার উপর এইসব মনীষীদের অবদান অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যেক নেতৃত্ব এই সম্মুখবর্তী প্রগতিতে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন যা থিওসফির জ্ঞানমন্দিরের ভাণ্ডারকে সামান্য হলেও সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। প্রগতি সবসময় ভিন্ন ভিন্ন আলোকে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্নভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সোসাইটি শুধুমাত্র কাজ করারই প্রতিষ্ঠান নয়। এটা এক আধ্যাত্মিক সংস্থা, এটা কোনও সাধারণ ক্লাব বা সংঘ নয়, যা লোকেরা তৈরি করে তাদের সামাজিক মেলামেশার জন্য। অথচ এই সোসাইটি গঠিত হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত জাতির লোকদের নিয়েই। তাই একে কোনও বিমূর্ত কিছু বলে ভাবাটা ঠিক নয়। অন্য যে কোনও সংস্থার মতনই এই সোসাইটি বিভিন্ন সদস্য নিয়ে গঠিত। যে কোনও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের জীবৎকালে এমন কিছু সময় আসে যখন মনে হয় কিছুই হচ্ছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন ধীর গতিতে চলেছি বলে মনে হয়। কোনও বিশেষ জায়গায় যাচ্ছি বলেও মনে হয় না। অথচ একটু দাঁড়িয়ে যদি পিছনের দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যে কতদূর চলে এসেছি। যেখানে শুরু হয়েছিল সেখান থেকে কত প্রগতিই না ঘটেছে, সত্যি সত্যি অসম্ভব গতিতে আমরা এগিয়ে

চলেছি। অন্য সমস্ত কিছুর মতনই সোসাইটির এই দীর্ঘ জীবনে কিছু কিছু ক্ষতি ও লাভ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সোসাইটির নেতৃত্ব এই সাতাত্তর বছরে থিওসফিতে এবং থিওসফির মাধ্যমে সমাজের ধার্মিক ও সামগ্রিক জীবনযাত্রায় অনেক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রত্যেকেরই মৌলিক ও নতুন কিছু বলার ছিল এবং সেজন্য আমাদের কাছে তাঁরা শ্রদ্ধার জন। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বকীয় অথচ বিভিন্নভাবে থিওসফির বিভিন্ন দিককে তুলে ধরেছিলেন। যেহেতু তাঁরা সকলেই সত্যের আলোর দিশারী ছিলেন, তাই থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে এক সম্মুখবর্তী প্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সোসাইটিকে এক নতুন সুরে বেঁধে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে সোসাইটির ইতিহাসে তাঁদের স্থান চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

এবার দেখা যাক প্রগতির বিভিন্ন পর্যায়গুলোকে, দেখা যাক থিওসফির আদর্শ কীভাবে ক্রমশ বিষয়মুখিতা অর্জন করল। প্রথমে একটু আলোচনা করা দরকার থিওসফিক্যাল আন্দোলনের পশ্চাৎপট ও তৎকালীন বিশ্ব–সমাজের অবস্থা সম্পর্কে।

পৃথিবী তখন মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত, এক শিবিরে দৃঢ় বস্তুবাদের ধারণা, আর অন্য শিবিরে সংকীর্ণ গোঁড়ামি এবং পরিপূর্ণ ধর্মান্ধতা। চতুর্দিকে তখন বিজ্ঞানের জয়জয়কার চলছে, আর ধর্ম কোনওরকমে নিজেকে রক্ষা করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। যুক্তিপূর্ণ জ্ঞান, যাকে বিজ্ঞান বলা হয়, তার ক্রমাগত বৃদ্ধি ধার্মিক পরম্পরার উপর অশান্তিময় প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ধর্ম সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল, কারণ এর মধ্যে কোনও জীবন সত্তা ছিল না। মানুষের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলী এবং ব্রহ্মাণ্ডের যান্ত্রিক ধারণা ক্রমশ স্বচ্ছ হওয়ার দরুন প্রভূত সম্মান লাভ করেছিল। যে দর্শন ধীরে ধীরে উদ্ভব হচ্ছিল তাও ছিল বস্তুবাদের দর্শন অর্থাৎ সমস্ত রহস্যের সমাধান খোঁজা হচ্ছিল বস্তুবাদের মধ্যে। এই প্রবল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল থিওসফিক্যাল

সোসাইটি। সেই সময় যা কিছু প্রয়োজন ছিল সোসাইটি ঠিক সেই সমস্ত জিনিসকে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করেছিল। এইচ. পি. ব্লাভাটস্কির কাজ ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। তাঁর জীবন দর্শন সংকীর্ণতার গণ্ডি অতিক্রম করে আত্মা ও বস্তু উভয়কে স্থান করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'দ্য সিক্রেট ডকট্রিন' (গূঢ় উপদেশাবলী) এ বিভিন্ন বিষয়, যেমন অতীন্দ্রিয়তা, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান থেকে নানারকম উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে ধার্মিক রীতিনীতি ও বিজ্ঞানকে ছাপিয়ে মনের একটা দিক আছে যা আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে, যাকে থিওসফির এক বিশেষ অঙ্গ অজ্ঞেয়বাদ বলা হয়। তিনি উপস্থাপনা করেছিলেন পুনর্জন্মের সূত্র, কর্মবাদ ও বস্তুর উপর মানসিক শক্তির প্রভাব; সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন। তাঁর এই কাজ তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সমাজকে আকর্ষিত করেছিল, যার ফলস্বরূপ এডিসন, স্যার উইলিয়াম ক্রুকস, আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, ডব্লু. টি. স্টিড এবং অলিভার লজদের মতো মনীষীদের তিনি একত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যদিও তাঁরা সোসাইটি থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিলেন। এইভাবে এইচ. পি. বি.–র তৎকালীন প্রচেষ্টা মনের উপর যে আত্মার স্থান সেটা প্রমাণ করেছিলেন। এরপর যখন ডঃ অ্যানি বেসান্ট থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করলেন তখন সেই আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে তিনি তুরীয়াতীতকে অন্তরস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা যে শুধু মানুষকে সেবা করার মধ্যে দিয়েই অর্জন করা যায়, তাই ছিল তাঁর মতবাদ। কিন্তু মানুষের সেবা করার মুখ্য উদ্দেশ্য কী? আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে এই বিষয়ের গভীরে যেতে, নিজেদের মধ্যে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে যে এই সেবার পেছনে কোনও লুক্কায়িত অন্য উদ্দেশ্য আছে কিনা? আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ই. এম. ডেলফিল্ড আমাদের সাবধান করে বলেন ঃ

‘‘এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকহিতকর কর্মে যুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ কারণ তাঁরা একথা স্বীকার করেন যে নিজেদের তৃপ্তিলাভের জন্য তাঁরা পরোপকার করেন। যাঁরা বলেন, ‘আমি বিনামূল্যে সব কিছু দিই এবং প্রতিদানের কথা ভাবি না, আমি অন্যের জন্য নিজেকে ক্ষয় করছি; অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি পুরস্কার ও দায়িত্ব গ্রহণ করি; যে টাকা আমি গ্রহণ করতে বাধ্য হই, আমার কাছে তার কোনও মূল্যই নেই; কোনও কৃতজ্ঞতাই আমার দরকার নেই।’ তাঁরা তাঁদের অবচেতন মনের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন। যেসব লোক এটুকু বোঝা শিষ্টতা মনে করেন না যে তাঁরা যে কাজ করছেন সেটা করতেই তাঁদের বেশি ভালো লাগে এবং সেই কাজের জন্য তাঁরা যে টাকা পান তা আগে কখনও পাননি। এটাই যে তাঁদের শক্তির সবচেয়ে ভালো বহিঃপ্রকাশ যা তাঁদের পক্ষে উপকারী সেটাও তাঁরা স্বীকার করেন না।’’ সেবা করার তাহলে কেন এত আগ্রহ। ডঃ অ্যানি বেসান্ট আমাদের শিখিয়েছেন, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেবা করা। তিনি এই কেন্দ্রীয় সত্যকে গোঁড়া প্রতিষ্ঠানগত ধার্মিক রূপ থেকে পরিষ্কারভাবে আলাদা করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই ভাবনা আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে এক বিশেষ আবেদন জানিয়েছিল। যুক্তিপূর্ণ মানসিকতা একে সাদরে গ্রহণ করেছিল। এই পরিবর্তনশীল বিবর্তিত ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে বোধগম্য করে তুলেছিলেন। অতি উচ্চ আদর্শবাদের উপর দাঁড়িয়ে তিনি যে চিন্তার ধারা প্রবাহিত করেছিলেন তা এত মানুষকে আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিল যা এর আগে কোন একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

লেডবিটার আমাদের অন্য এক জগৎ দেখাতে সাহায্য করেন। এ জগৎ ছাড়াও যেখানে আমাদের অবস্থান, যা অদৃশ্য ও অনুভূতির অতীত। তার মতে আমরা অবশ্যই স্বর্গেরও বাসিন্দা। অদৃশ্য জগৎ আমাদের চোখে দেখা জগতের প্রসার মাত্র। এছাড়াও তাঁর

আর এক বিশেষ অবদান আছে। থিওসফিক্যাল সোসাইটির উদ্বোধনের সময় সেকালের বিশেষজ্ঞরা ‘‘বিশ্বের আভ্যন্তরীণ সরকার (ইনার গভর্নমেন্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড), মনু’র ভাবনা, বোধিসত্ত্ব এবং নিখিল বিশ্বে বিদ্যমান এক বিশ্ব নিয়ন্ত্রক সক্রিয় শক্তি’’, এই সমস্ত ধারণার কথা কখনও উল্লেখ করেননি। এ সমস্ত সত্য পরবর্তীকালে উপলব্ধ হয়। অ্যানি বেসান্ট এবং সি. ডব্লু. লেডবিটার তাঁদের এই সমস্ত অনুসন্ধানকে সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে আমরা সমষ্টিগত আত্মা, জীব-বিবর্তন ধারার পরম একক প্রভৃতি ধারণার সম্পর্কে অবগত হই।

কিন্তু জীব বিবর্তনের চক্র এখনও পূর্ণতা লাভ করেনি। যদি আমরা তাকে পূর্ণ করতে চাই তাহলে যেমন আমাদের অবশ্যই শেখা দরকার অন্তর্নিহিতকে দেখবার ঠিক তেমনই শেখা দরকার তুরীয়াতীতকে দেখবার। প্রকৃত সত্য হল–এই দু’য়ের সংমিশ্রণ এবং সমন্বয়ের মধ্যে, চিন্তার প্রক্রিয়া ও বিবর্তনের মধ্যে, সমষ্টিগত চিন্তা আকারের তুঙ্গ অবস্থার মধ্যে ...

বিশিষ্ট মার্কিন দার্শনিকের মতামতকে গ্রহণ করে আমরা অবশ্যই একথা বলতে পারি যে, থিওসফির সত্যও শুষ্ক হয়ে আমাদের মনকে ধূলায় মলিন করে ফেলতে পারে যদি আমরা প্রতিদিন ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে মনের মলিনতা ও আবর্জনাকে পরিষ্কার করতে না পারি, যদি আমরা জীবন্ত সত্যের শিশিরে আমাদের মনকে সিক্ত করে উর্বর করে তুলতে না পারি। অন্যথায় আমাদের থিওসফির উপর আগ্রহ ও ভালোবাসার কোনও প্রকৃত অর্থ নেই। যে সমস্ত মূল নীতি এবং সত্য কোনও আধ্যাত্মিক আন্দোলনকে পরিচালিত করে, তা আন্দোলনের পরবর্তীকালে এক ধর্মমত ও কুসংস্কারে পরিণত হয়। আমাদের প্রত্যেককে নিজের ভেতরের গূঢ় রহস্যকে আবিষ্কার করতে হবে যাকে ‘লাইট অন দ্য পাথ‘ ও ‘অন্তিম রহস্য’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এটা করার জন্য আমাদের নিজের নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, এক

প্রকৃত পরিবর্তনকারী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের মধ্যে সেই কেন্দ্রবিন্দুর আবিষ্কার করতে না পারছি ততদিন পর্যন্ত আমাদের দান তা যত বিশালই হোক না কেন, আমাদের সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে একটা জিনিসের ঘাটতি থেকে যাবে এবং তা হল ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা। সমস্ত কিছুর অন্তিম বিচারে প্রতিটি ব্যক্তিই যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা জানি। আর যখন কোনও ব্যক্তি তার আভ্যন্তরীণ প্রেরণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখনই তার পক্ষে সর্বসাধারণের জন্য কাজ করা সম্ভব হয়, অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাকেই বলি সমষ্টিগত ক্রিয়াকর্ম। যে প্রক্রিয়া একজনকে তার অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে শুরু করে তা মৃত একাকীত্ব বা স্বপ্ন বিজড়িত উন্নাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়। বর্তমানে আমরা আমাদের অন্তরের গভীরে যেতে সক্ষম নই। যা পারি তা হল, অন্যান্য সকলের সম্পর্কের জগতে বাস করতে। আর সেই জগৎ থেকে কখনও কখনও গভীরে যাওয়ার জন্য যে প্রেরণা প্রয়োজন তা কি আমরা পেতে পারি?

কথিত আছে যে মহা চোহান আমাদের থিওসফিক্যাল সোসাইটির কাজ করার সুনির্দিষ্ট আদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন ঃ

“থিওসফিক্যাল সোসাইটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে মানুষের ভবিষ্যৎ ধর্মের মূল স্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে।” তাহলে আমাদের কি সেদিন দেখা উচিত নয় যেদিন পৃথিবীর প্রয়োজন থিওসফিকে? পৃথিবীর সমস্ত শক্তি আমাদের মধ্যেই অন্তর্নিহিত, সময় এবং বয়সের উদ্দীপনাও আছে আমাদের সঙ্গে তাই এই ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে থিওসফির সত্য যা আমাদের সেই অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই সত্যই আমাদের আদর্শে উপনীত হতে শেষ অবধি সহযোগিতা করে যাবে।”

উপরোক্ত এই বক্তৃতা ইউ জী বিনা প্রস্তুতিতে প্রদান করেছিলেন। যদি এই বক্তৃতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুধাবন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আজ তিনি

যা বলছেন তার পূর্বাভাস সেদিন তাঁর সেই বক্তৃতার মধ্যেই উপস্থিত ছিল।

ইউ জী এরপর নিরপেক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তৃতা দিতে থাকেন, কারণ ওই সময় তাঁর টাকার খুব প্রয়োজন ছিল। শ্রীমতী ইরমা ই ক্রুমলে নামে এক ভদ্রমহিলাকে তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত করেছিলেন, যিনি ওই সমস্ত বক্তৃতার আয়োজন করতেন। তিনি ইউ জী–কে বক্তৃতা পিছু একশো ডলার রোজগার করার বন্দোবস্ত করেছিলেন। ইউ জী বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ষাটটি বক্তৃতা করেছিলেন, যার মধ্যে অন্যতম বিষয়গুলো ছিল রাজনীতি, শিক্ষা–দীক্ষা, দর্শন, অর্থনীতি, ভারতীয় চিন্তা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ। কিওয়ানি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব, উইমেন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব, ইউনিভার্সিটি ক্লাব এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এইসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সম্পাদকীয়তে তাঁর বক্তৃতার উপর মন্তব্য দেখা যেত। এখানে তার একটা নমুনা তুলে ধরছি ঃ

॥ **আন্তর্জাতিক দানের পরিকল্পনাও মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়** ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এখন পর্যন্ত এই দেশ অনুন্নত দেশের পেছনে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে চলেছে যাতে সেই সমস্ত দেশগুলো সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের শিকার না হয়ে পড়ে।

দুঃখের বিষয় হল এই যে, যখন ভালো করে হিসাব–নিকাশ করা গেল তখন দেখা গেল এই দেশ ধারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, আর যাদের পেছনে খরচা করতে করতে এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, তারা সেই লাল সাম্রাজ্যবাদেরই করায়ত্ত হয়ে গেছে।

এই ধরনের একতরফা দর কষাকষির ব্যাখ্যা দেওয়াটা অবশ্যই সহজ ব্যাপার নয়। যদিও আমাদের পক্ষে সেই সমস্ত দেশগুলোকে সমালোচনা করা অত্যন্ত সহজ যারা আমাদের কাছ থেকে টাকা নেয় এবং লাল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 'গোপন প্রেম' চালিয়ে যায়; কিন্তু কোনও দেশ যখন চরম দুর্দশাগ্রস্ত তখন হঠাৎ দান বন্ধ করাটা পৃথিবীর কোনও দেশের মানুষের পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এই কাজ মানবিকতার বিরুদ্ধাচারণ করার সমতুল্য।

কিছুদিন আগে একজন উচ্চ শিক্ষিত ভারতীয় এলগিনে বক্তৃতা

দেওয়র সময়ে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন তার মধ্যে কিছু সত্য আছে যা গভীরভাবে অনুধাবন করার যথাযোগ্য দাবি রাখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলে রাখা ভালো যে ভারত সেই সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে পড়ে, যারা লক্ষ লক্ষ মার্কিন ডলার দান হিসাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও পশ্চিম দেশসমূহের সঙ্গে একত্র হতে অস্বীকার করছে। ভারতীয় এই বক্তার নাম হল ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি যাঁর জন্ম ভারতে এবং সেখানেই তিনি প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন, (আর বাদবাকি সময়) তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন। অধিকাংশ বক্তৃতা তিনি অবশ্য মার্কিন মুলুকে দিয়েছেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এই ব্যক্তিকে কোনওভাবেই সেই দেশের আপামর জনসাধারণের মতন সাধারণ একজন লোক বলে মেনে নেওয়া যায় না, বিশেষ করে যে দেশের শিক্ষার হার মাত্র সাত শতাংশ। উপরন্তু তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরেছেন এবং সেই বিশাল দেশের প্রায় সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের বর্তমান চিন্তাধারার উপর এরকম একজন লোকের বক্তৃতার মধ্যে ভারতবর্ষের বর্তমান চিন্তাধারার প্রকৃত প্রতিফলন আশা করা যায়। কৃষ্ণমূর্তির মতে এই দেশের পক্ষে ভারতবর্ষের পিছনে টাকা খরচ করা বন্ধ করে অন্য কোনওভাবে সেই টাকাটা কাজে লাগানো অধিকতর উপযোগী বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের সাধারণ লোকজন – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভারতকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে সেকথা জানেই না। এই দেশের কাজকর্মকে তারা অনেক বেশি উপলব্ধি করতে পারবে যদি ভারতবর্ষ থেকে দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে এখানে এনে চিকিৎসা করে ভালো করে তোলার মতো কোনও প্রকল্পে টাকা খরচ করা হয়। এছাড়া ভারতবর্ষের কৃষককে এখানে এনে দেখানো যায় যে এখানকার ফার্মগুলো কীভাবে চাষাবাদ করে এবং ভারতবর্ষের শ্রমিকদের এখানে এনে দেখানো যায় যে তারা কীভাবে কাজ করে এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান

কি রকম।

যদিও কৃষ্ণমূর্তি উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের লেনদেনের পরিকল্পনায় বিরোধিতা করেন না, কিন্তু তাঁর মতে যাঁরা উচ্চ শিক্ষার জন্য এখানে আসেন তাঁরা ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণের থেকে অনেক পৃথক। তিনি আরও বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরা মুম্বাইয়ের রাস্তার লোকদের ভাষায় হয়তো কথা বলতেই জানেন না।

বিশ্বের বিভিন্ন জাতিদের মধ্যে যে টানাপোড়েন বর্তমান তা রাতারাতি কমানো অসম্ভব। যদি বিভিন্ন জাতির লোকদের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তুলতে হয় তাহলে যা দরকার সেটা হল বিভিন্ন দেশের লোকজনদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে মেলামেশার সুযোগ বাড়িয়ে তোলা। সেটা আন্তর্জাতিক দানের প্রোগ্রামের মাধ্যমে সম্ভবপর নয়। কারণ বহুক্ষেত্রে এটা দেখা যায় যে, এরকম প্রোগ্রামের মাধ্যমে যাদের সাহায্য করার চেষ্টা করা হয় তারা ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়ে বিপক্ষে চলে যায়।

''কোরিয়ার – সংবাদের দৃষ্টিভঙ্গী''

কোরিয়ার – নিউজ, এলগিন, ইলিয়ন

পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউ জী-র দেওয়া বক্তৃতার উপর এক সংবাদপত্রের বিবৃতি ঃ

॥ **ভারতবর্ষের উপর লায়ন্স ক্লাব শুনল এক প্রাঞ্জল বক্তৃতা** ॥

গত মঙ্গলবার লায়ন্স ক্লাবে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি, ভারতের এক অসাধারণ বক্তা আন্তরিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের মহত্তর সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁকে বক্তা হিসাবে নিমন্ত্রণ করার জন্য লায়ন্স ক্লাবকে সার্বিক ধন্যবাদ জানানোর পর কৃষ্ণমূর্তি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বাকপটুতার নিদর্শন দিয়ে ক্লাবকে তাদের কার্যাবলীর জন্য সপ্রশংস সমর্থন জানান। আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব এখানে এবং পৃথিবীর অন্যত্র যে সমস্ত মূল্যবান ক্রিয়াকর্মের দ্বারা তাঁদের

আন্দোলন বজায় রেখেছেন সেটাই হয়তো একদিন এই সংস্থাকে সেই বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী ও মহান করে তুলবে; যে বিশ্বে ভরে আছে আজ শুধু ভুল বোঝাবুঝি, রুক্ষ্মতা, বৈসাদৃশ্য ও অন্ধবিশ্বাস।

বিশ্ব কূটনীতিতে বর্তমান ভারতের স্থান কোথায় তার উল্লেখ করে কৃষ্ণমূর্তি বলেন, 'নেহরুকে শুধুমাত্র ক্রুশ্চেভ এবং বুলগানিন বা মাও-সে-তুং ও চৌ-এন-লাই-এর সহযোগী বলাটা খুবই সস্তা পরিকল্পনা। আজকে বিশ্ব রাজনীতিতে নেহরু অত্যন্ত জমকালো এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ভারতকে বৃহত্তর, স্থায়ী, ভারসাম্যযুক্ত এবং সমন্বয়শীল ব্যক্তি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার কাজ নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তা ভবিষ্যতের এক তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন হয়ে থাকবে। বিদেশি অর্থদানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কোনও দেশের উন্নয়ন শুধু বিদেশি অর্থদানের উপর গড়ে উঠতে পারে না। ভারতের সঙ্গে আপনাদের যান্ত্রিক শিল্প প্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার লেনদেন হওয়া এক কথা, কিন্তু একটা দেশ সেই অভিজ্ঞতা কতটা কার্যকরী করতে পারবে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। আমি সবসময় এটা মনে করি যে কোনও দেশের সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর।' কৃষ্ণমূর্তি আরও বলেন, 'অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন ও ব্যাপক শিল্পায়ন সম্ভবপর হয় কেবলমাত্র একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং তা হল জনগণের সঙ্গে সরকারের প্রকৃত সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করার মধ্য দিয়ে। আমি নিশ্চয়তার সঙ্গে একথা বলতে পারব না যে ভারতে এই সহযোগিতা আদৌ আছে কিনা, জানি না এ ধরনের হয়তো কোনও এক বিশেষ কারণে ভারতবর্ষের জনসাধারণ সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কোনও উদ্যম বা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।'

বক্তৃতা শেষ করার আগে তিনি আশাপ্রদ একটি মন্তব্য রাখেন।

> ‘কথিত আছে যে আমেরিকাকে বিশ্বে মুক্তি আনার অভিভাবক হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। আমার প্রার্থনা হল এটাই যে মুক্তির পথিকৃত এই মহান দেশ যেন তাঁর ঈশ্বর নির্দেশিত কর্মে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারে।’

এই বক্তৃতা সফরের শেষের দিকে ইউ জী আশ্চর্য হয়ে গেলেন ভাবতে ভাবতে যে কেন তিনি এসব বক্তৃতা দিচ্ছেন। টাকা রোজগার করার নিশ্চয়ই অন্য কোনও উপায় আছে। যদিও সেই সময় তাঁর মনে অন্য কোনওরকম পরিকল্পনা ছিল না। তিনি অবশ্য শুধু একটা জিনিসই ভালো করে জানতেন এবং তা হল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া টাকা কীভাবে নস্যাৎ করতে হয়। অবশেষে একদিন তিনি তাঁর ম্যানেজারকে ডেকে বললেন যে, পরবর্তী বছরে যে সমস্ত বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে তা বাতিল করে দিতে, কারণ বক্তৃতা সফর তিনি আর চালাতে চান না। ‘আপনি এখন একজন খ্যাতিসম্পন্ন লোক’ – ম্যানেজার বললেন, ‘আপনার এখন বেশ চাহিদা। কি করে আপনি আমার সঙ্গে এটা করতে পারলেন।’ উত্তরে ইউ জী শুধু বললেন, ‘আমি দুঃখিত।’

পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে তিনি আর শুধু একবার জনসভায় বক্তৃতা দেন, বহু বছর পরে বাঙ্গালোরে। সেদিন সেই বক্তৃতা শুনতে প্রায় তিন হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। অডিটোরিয়াম কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এত লেখালেখি হয় যে ইউ জী রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

মুখোমুখি

"অনুপ্রেরণা এক অর্থহীন জিনিস। কত জিনিস এবং ব্যক্তি আমাদের প্রেরণা জাগায়, কিন্তু সেই প্রেরণার যে প্রতিক্রিয়া তা প্রকৃতই অর্থবিহীন। হতাশ এবং হারিয়ে যাওয়া লোকজনদের নিয়ে তৈরি হয় এই 'প্রেরণা বাজার'। প্রেরণালব্ধ কাজকর্মই একদিন আপনাকে এবং আপনার জাতিকে ধ্বংস করবে।"

– ইউ জী

চল্লিশের দশকের শেষের দিকে, থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে ইউ জী–র সম্পর্কের শেষ সময়ে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসে তাঁর জীবনে আবির্ভূত হলেন। কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। শীঘ্রই দুই কৃষ্ণমূর্তির সম্মুখ সাক্ষাৎকারের জন্য মঞ্চ তৈরি হতে লাগল।

আমার ডায়েরির যে সমস্ত পাতায় কোডাইকানালে কাটানো দিনগুলোর কথা লেখা আছে, যার কথা আমার স্মরণে আজও গভীর স্পন্দন জাগায়, বিশেষ করে সেই সময়ের কথা যার নাম দিয়েছিলাম "এক নির্জ্জন শীতকাল ... আগুনের উপর দৃষ্টি স্থির করে ... কাটালাম।"

> আমরা পরের দিন বাঙ্গালোর থেকে বিদায় নেব। জিনিসপত্র গোছানোর যখন তোড়জোড় চলছে তখন অপ্রত্যাশিতভাবে মিঃ বার্নাড সেলবি বলে ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার শহরের এক পোস্টম্যান এসে হাজির। যদিও তিনি একজন সাধারণ পোস্টম্যান, কিন্তু তাঁর মন খুবই তৎপর এবং তাঁর জ্ঞান আমাকে

অবাক করে দিল। তিনি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির গুণমুগ্ধ সমর্থক। সকালবেলা বার্নাডকে নিয়ে আমরা লেকের পারে হাঁটতে গেলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল জে কৃষ্ণমূর্তি। ইউ জী অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার মধ্য দিয়ে বিষয়ের গভীরে চলে গেলেন। আজ পর্যন্ত ইউ জী–কে জে কৃষ্ণমূর্তির প্রতি এমনভাবে আক্রমণ করতে দেখিনি।

পরবর্তীকালে একদিন যখন সেই সময়কার কথোপকথন শুনছিলাম তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে ইউ জী–র সঙ্গে আমার অতীতে যত আলোচনা হয়েছে তার একটা সাধারণ বিষয় হল জে কৃষ্ণমূর্তি। একটা অত্যন্ত কৌতূহলজনক কথোপকথন তুলে ধরছি যেটা কোডাইকানালে টেপ করে রেখেছিলাম ঃ

ইউ জী, যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, জীবনে যত লোকের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকার ঘটেছে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে অসাধারণ লোক কে, তাহলে কার কথা সবচেয়ে প্রথমে আসে?

জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি ... (তিনি বাক্য সম্পূর্ণ করেননি)

আপনি কি আপনার মন্তব্য ফিরিয়ে নিতে চান?

না না তা নয়, বাধা দিয়ে বললেন ইউ জী।

(আপনি যখন ইউ জী–র সঙ্গে থাকবেন তখন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন না যে কি আপনাকে আঘাত করল। কিন্তু এই আঘাতটা বিধ্বংসকারী)

ইউ জী আমি আপনাকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। আজ সকালে আপনি জে কৃষ্ণমূর্তিকে এমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তুলে ধরলেন, আক্রমণ করলেন, আর এখন বলছেন, আপনার জীবনে তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে অসাধারণ ব্যক্তি।

আমি কখনই এমন কথা বলি না যা আমি সত্যি মনে করি না।

আপনি কি কৃষ্ণমূর্তির কাহিনি জানেন?

তত ভালো করে নয়।

যাঁদের মধ্যে দিয়ে তিনি এসেছেন – অর্থাৎ থিওসফিস্ট তাঁরা তাঁকে বিংশ শতাব্দীর ‘বুদ্ধদেব’ বলে মনে করতেন এবং তাঁদের এই দৃঢ়

বিশ্বাস ছিল যে তাঁর মহান শিক্ষার মধ্য দিয়ে 'জন্মলাভ করবে এক নতুন ধারণার।' তাঁর এই শিক্ষা আগামী পাঁচশো বছর ধরে টিকে থাকবে। জে কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা প্রচারের জন্য তাঁরা এক নতুন সংস্থা স্থাপন করেছিলেন, ''দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ দ্য ইস্ট।'' কিন্তু সেই মানবজাতির উদ্ধারকারী ব্যক্তি যাঁর জন্য সকলেই অধীর হয়ে এতদিন প্রতীক্ষা করেছিলেন, তিনি নিজে হঠাৎ সমস্ত সংস্থাকে ভেঙেচুরে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তখন যাঁরা অসম্ভব পরিশ্রম করে এই বিশ্ব শিক্ষককে এবং সংস্থাটিকে দাঁড় করিয়েছিলেন তাঁরা অনুভব করেছিলেন বিশ্বাসঘাতকতার জ্বালা। স্বভাবতই জে কৃষ্ণমূর্তির এই নাটকীয়ভাবে বিশাল সংস্থাকে ভেঙে দেওয়াটা আমার বাল্যকালে আমার উপর এক জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করেছিল। যদিও এতে কোনও সন্দেহ নেই যে তিনি সেসব কিছু পেছনে ফেলে চলে এসেছিলেন, অথচ বর্তমানে তাঁকেই সবচেয়ে অসাধারণ চিন্তক ও ধর্মশিক্ষক বলে মনে করা হয়। তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার ব্যাপারে অবশ্য কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

তিনি নিজেকে প্রদর্শন করায় ছিলেন পরম দক্ষ এবং শব্দ প্রয়োগে নিপুণ জাদুকর। কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষা হয়তো একশো বছর আগে অত্যন্ত বৈপ্লবিক বলে মনে হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মাইক্রোবায়োলজি এবং জেনেটিক্সের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে সাইকোলজিতে যা সত্যি বলে মেনে নেওয়া হয় তাকে যাচাই করা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। 'মন' (যা কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষায় সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয়) যা সাইকোলজিস্টদের এবং মহান ধর্মশিক্ষকদের একতরফা পণ্যসামগ্রী, সেই সম্পর্কিত ধারণাগুলো একদিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যে সমস্ত হাল ফ্যাশনের শিক্ষাদীক্ষা এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসা তারা বাজারে চালাচ্ছেন তা হল ক্যাবেজপ্যাচ পুতুলগুলোর মতন মনমাতানো এবং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতি উত্তেজনাদায়ক, যা পুরানো পুতুলগুলোর মধ্যে দেখা যেত না। এই সমস্ত লোকেরা তাঁদের অনুসরণকারীদের

> কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করে রাখে, কখনও পরিতৃপ্ত হতে দেয় না। এসবের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। শীঘ্রই লোকজন এসব আর গ্রহণ করবে না।

আজ থেকে দশ বছর আগে আমি ইউ জী-র সঙ্গে তাঁর এক বহুকালের বন্ধুর সঙ্গে থানে বলে একটা জায়গায় দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমার এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিল সত্যিই অসাধারণ। ভদ্রলোকের নাম এল. ভি. ভাবে। তার অনেক বয়েস হয়েছে। দেখতে খুবই সুন্দর, বলিষ্ঠ দেহের গড়ন; কিন্তু মনে হল খুব দুঃখী। (এই ভদ্রলোকই দুই কৃষ্ণমূর্তিকে সামনা-সামনি আনার উদ্যোক্তা। তিনি চল্লিশের এবং পঞ্চাশের দশকে মুম্বাইতে জে কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতার আয়োজন করতেন) দেখলেই বোঝা যায়, পরিষ্কারভাবে, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। ইউ জী-র ভাষায় এই ভদ্রলোক জে কৃষ্ণমূর্তির ষাট বছরের বুড়োদের ক্লাবের সদস্য। ভাবেজী বলে উঠলেন, ‘‘আমি কাছাকাছি একটা নতুন বাড়ি বানিয়েছি, তবুও পুরানো বাড়ি ছেড়ে যেতে পারছি না। কি করে ‘অতীত দিনগুলোর স্মৃতি’ সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা যায়?’’ জে কৃষ্ণমূর্তির উদ্ধৃতির সুরে ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইউ জী সাধারণত কিছু উত্তর দেন, কিন্তু এবার চুপ করে শুধু হাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে আলিঙ্গন করে আমরা সেখান থেকে বিদায় নিলাম। কয়েকমাস পরে খবর পেলাম যে ভাবেজী দেহ রেখেছেন।

ইউ জী-র সঙ্গে আমার এত বছরের যোগাযোগকালে আমি বহু বিভিন্ন মতামত সম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বিশেষ করে এই জে কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষার উপর ইউ জী-র চরম আক্রমণাত্মক ব্যাপারটার বিষয় নিয়ে। আধুনিক মনোভাবাপন্ন লোকজন যাঁরা মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছেন তাঁরা মনে করেন জে কৃষ্ণমূর্তির উপর ইউ জী সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট। ধার্মিক চিন্তাভাবনাসম্পন্ন লোকজন এই দু’জনের সম্পর্ককে ট্রাডিশনের সিংহদরজার মধ্যেই দেখেন এবং তাঁদের মন্তব্য হল, জে কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষার উপর ইউ জী-র আক্রমণ ভারতের মহান পরম্পরার এক রূপায়ণ যেখানে যোগ্য শিষ্য সম্পূর্ণভাবে গুরুর শিক্ষাকে ধ্বংস করে দেন।

ইউ জী-র বয়স যখন পঁচিশ বছরের কাছাকাছি, তখন সেই ইউ জী, যিনি মাঝে মাঝেই প্রতিজ্ঞা করতেন বিবাহ না করে কামজয়ী হয়ে জীবনযাপন করবেন বলে,

মনে মনে ধার্মিক কুমারব্রতীদের মনোভাবের উলটোই ভাবলেন; অর্থাৎ যৌন আকর্ষণ একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার, সেটাই যুক্তিসম্মত এবং তাকে জোর করে অবদমিত করা জ্ঞানের কাজ বলে মনে করলেন না। তিনি নিজেকে বললেন, 'এটা যদি তোমার যৌনবাসনা মেটানোর প্রশ্ন হয়, তাহলে বিয়ে না করা কেন? এবং সমাজটা আছে তো সেজন্য। কেন তুমি একজন অনাসক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস করবে? তোমার কাম ভাবনার প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি ঘটতে পারে একমাত্র বিবাহের মধ্য দিয়েই।'

ইউ জী-র বিবাহের তিনমাস পূর্বে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর চোখে পড়ল ইউ জী-র জন্মকুণ্ডলী। বন্ধুটি বলল, 'এটা যদি সত্যি তোমার ছক হয়, তা তুমি যাই বল না কেন, তুমি ১৯৪৩ সালের ১৫ মে বিয়ে করছ।' সেই সময় ইউ জী-র দাদু-দিদিমার বেঁচে থাকা শেষ কন্যার মৃত্যুতে হঠাৎ করে তাঁদের জীবনে এক নিদারুণ শূন্যতা নেমে এসেছিল। ইউ জী ভাবলেন তিনি বিবাহ করলে হয়তো তাঁদের প্রতি ঋণভার একটু কমবে। একটা আধুলি নিয়ে টস করে ঠিক করে ফেললেন কি করবেন। ইউ জী তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত কিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন পয়সা টস করে (যাকে হেড-টেল করা বলে) এবং এইভাবেই তাঁর জীবনে বিয়ের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল।

দাদু যে তিনজন সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা দেখে রেখেছিলেন ইউ জী তার ভেতর থেকেই একজনকে কনে হিসেবে পছন্দ করে নিলেন। তাঁর নাম কুসুম কুমারী। পরবর্তীকালে ইউ জী বলতেন, 'বিয়ের রাতের পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম যে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করে বসেছি।' প্রথম থেকেই ইউ জী বিবাহের নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যেমনই পরিবারে একের পর এক সন্তান আসতে লাগল, ইউ জী-র সংসার জীবনও তেমনই বছরের পর বছর গড়াতে থাকল। অবশেষে বিয়ের সতেরো বছর পরে মার্কিন মুলুকে ইউ জী-র এবং কুসুম কুমারীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত যখনই জে কৃষ্ণমূর্তি মাদ্রাজের আডিয়ারে এসেছেন প্রত্যেকবার ইউ জী তাঁর বক্তৃতা শুনতে গেছেন। সেই সময় ইউ জী নিজে কখনও জে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করেননি। বিশ্ব শিক্ষকের এক প্রতিমূর্তি ইউ জী-র মনে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছিল। 'বিশ্ব শিক্ষক কি কখনও তৈরি করা

যায়? মহান শিক্ষক সৃষ্টি হয় আপনি-আপনি, তাকে বানানো সম্ভব নয়’ – মনে মনে ভাবলেন ইউ জী। তিনি কখনই জে কৃষ্ণমূর্তির আভ্যন্তরীণ বিভাগের সদস্য ছিলেন না।

ইউ জী দেখলেন যে থিওসফিক্যাল সোসাইটির বিদ্বান, শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং তথাকথিত অসাধারণ লোকজন খুবই ফাঁপা, অগভীর। ‘‘তাঁদের সবার সঙ্গে কাজ করে বুঝলাম যে এখানেও সেই একই কাপট্য, এবং আমি যা বলতে চাই তা হল এই যে তাঁদের জীবনে কিছুই নেই।’’

সাধারণ সভায় বক্তৃতা দেবার শেষে জে কৃষ্ণমূর্তি যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন সেগুলো আগে থেকেই তাঁর কাছে পাঠানো হত। ১৯৫৩ সালে মাদ্রাজে এক সভায় বক্তৃতা দেবার সময় ইউ জী এই প্রশ্ন লিখে পাঠান, ‘মহাশয়, এই সমস্ত বক্তৃতা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনি ঠিক কি ধরনের নেশা অনুভব করেন? অবশ্য আপনি গত কুড়ি বছর ধরে এসব করতেন না যদি না এর মধ্যে কোনও বিশেষ আনন্দ খুঁজে পেতেন। তাহলে কি স্বভাবের জোরেই এ কাজ করে চলেছেন?’ জে কৃষ্ণমূর্তি সেদিন নিম্নলিখিত উত্তর দিয়েছিলেন ঃ

> এটা অবশ্যই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন, তাই না? কারণ প্রশ্নকর্তা শুধু একথাই জানেন অথবা এটাই অবগত যে সাধারণত যখন কেউ ভাষণ দেন তখন তিনি তাঁর নিজস্ব কিছু লাভের জন্যই সেটা করেন, অথবা এটা কি শুধু বৃদ্ধ বয়সের পরিণতি? যদি কেউ যুবকই হোন বা বৃদ্ধই হোন, এটা কি শুধু অভ্যাসবশত কাজ? হয়তো প্রশ্নকর্তা শুধু এই সমস্ত জিনিস সম্পর্কেই অবগত, তাই এই প্রশ্ন করেছেন।
>
> তাহলে এর মধ্যে সত্যটা কি? আমি কি শুধু অভ্যাসবশত কথা বলছি? আপনি অভ্যাস বলতে কি বোঝেন, আর অভ্যাসের জোর বলতেই বা কি বোঝেন? যেহেতু আমি গত কুড়ি বছর ধরে বক্তৃতা দিয়ে আসছি, তাহলে কি আমি আরও কুড়ি বছর বক্তৃতা দেব, যতদিন পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে না পড়ছি? আচ্ছা, কোনও জিনিস বুঝতে পারাটাও কি অভ্যাসবশত ব্যাপার? শব্দের প্রয়োগ করাটা অবশ্যই অভ্যাসের আওতায় পড়ে, কিন্তু সেই শব্দের মধ্যে

যে অন্তর্নিহিত অর্থ তার তারতম্য ঘটে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে যে সত্য প্রতিনিয়ত উপলব্ধ হচ্ছে তার উপর। যদি কোনও বক্তা বক্তৃতা দিয়ে নেশার আনন্দ পান তাহলে তিনি আপনাদের ব্যবহার করছেন। আমরা এতেই সাধারণত অভ্যস্ত। বক্তা সেক্ষেত্রে আপনাদের সবাইকে তাঁর নিজেকে আনন্দ দেবার জন্য ব্যবহার করছেন এবং তা প্রকৃত সত্য জিনিসটাকে ধ্বংস করার সমান। যেহেতু আমরা প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানে আগ্রহী সেহেতু প্রতি মুহূর্তে আমরা চাই সেই সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে, এর মধ্যে কি কোনও ধারাবাহিকতা আছে? সমস্ত অভ্যাস, সমস্ত নিশ্চয়তা, পরিপূর্ণতা লাভের সমস্ত বাসনা, সমস্ত রকমের আত্মঅহমিকা বর্ধনকারিতা শেষ হতে হবে। তাই না? তা না হলে বক্তৃতা দেওয়াটা আর এক নতুন ধরনের শোষণে পরিণত হবে, আর এক নতুন উপায়ে লোকদের প্রতারণা করা হবে এবং আমাদের সে ধরনের কাজকর্মে কোনও আগ্রহই নেই।

মাদ্রাজের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত
১৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

ঠিক পরের দিন আলোচনা চলাকালীন কোনও এক বিরতির সময় জে কৃষ্ণমূর্তি হঠাৎ ইউ জী-কে বেছে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘মহাশয়! আপনি কি বলতে চান?’ প্রশ্নটা ছিল মৃত্যু ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত। সেদিন থেকে দু’জনে বেশ চড়া মেজাজের আলোচনার মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। জে কৃষ্ণমূর্তি কখনই অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তিকে ইউ জী-র সঙ্গে আলোচনার সময় কথা বলতে বা মন্তব্য প্রকাশ করতে দিতেন না। যনি কেউ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করতেন, কৃষ্ণমূর্তি বললেন, ‘‘আজ্ঞে না মহাশয়, এ সমস্যাটার ব্যাপারে আমরা দু’জনে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই।’’ তৃতীয় দিন হঠাৎ কৃষ্ণমূর্তি মনের অবচেতন অবস্থার কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিলেন। ইউ জী সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আমি আমার মধ্যে মন বলে কিছু দেখতে পাই না, আর অবচেতন বা অচেতন মনের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে আপনি আমাকে এসব অবস্থার কথা কেন বলছেন? উত্তরে

কৃষ্ণমূর্তি বললেন, ‘‘মহাশয়, আপনার ও আমার কাছে অবচেতন বা চেতন মন বলে কিছুই নেই। কিন্তু আমি এসব শব্দ ব্যবহার করছি উপস্থিত অন্য সকলের জন্য ...’’ তিনি আলোচনার সময় সেখানে অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কথা বলেছিলেন। ইউ জী সেদিন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁকে বক্তৃতার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তিনি এ জাতীয় কার্যকলাপে মোটেই আগ্রহী নন। এরপর থেকে ইউ জী জনসমক্ষে আলোচনায় আর কখনও অংশগ্রহণ করতেন না।

শ্রী এল ডি ভাবে ছিলেন দুই কৃষ্ণমূর্তির বন্ধু (তিনি হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি জানতেন যে ইউ জী তিনদিন আগে সেই প্রশ্নটি লিখে পাঠিয়েছিলেন)। তিনি ইউ জী–কে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেন যে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে তিনি যেন ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। সেদিন বিকেলবেলা ভাবেজী এই দুই কৃষ্ণমূর্তির মধ্যে সাক্ষাৎকারের আয়োজন করে ফেললেন।

প্রথম সাক্ষাৎকার ছিল খুবই উষ্ণ এবং হাসিখুশিপূর্ণ। প্রথমে ইউ জী জে কৃষ্ণমূর্তিকে বললেন যে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নেই এবং গত কয়েকদিন ধরে যে আলোচনা হয়েছে তিনি তার কোনওরকম ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ চান না। কথায় কথায় ইউ জী জানালেন তাঁর পশ্চাৎপট ও থিওসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগের কথা। অ্যানি বেসান্ট, লেডবিটার, জীনারাজাদাস এবং ডঃ অরুণডাল প্রভৃতি ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা। তিনি আরও বললেন মাতামহের সঙ্গে থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেতৃত্বস্থানীয় সমস্ত লোকদের যোগাযোগের কথা, এমনকী প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অলকোটের সঙ্গেও পরিচয়ের কথা। এই সমস্ত নেতাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর দাদুর অন্ধ্রপ্রদেশের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ইউ জী জে কৃষ্ণমূর্তিকে জানালেন যে গত সাত বছর যাবৎ থিওসফিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছেন এবং শেষের দিকে ইউরোপে এবং আমেরিকায় বক্তৃতা দেন। উত্তরে কৃষ্ণমূর্তি বললেন যে, তাঁর নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কে বক্তৃতার কথা তিনি শুনেছেন। সেই দেশের লোকদের মধে সামান্য বিভ্রান্তিও ঘটেছিল। বিশেষ করে তাঁদের দু’জনের নামই কৃষ্ণমূর্তি হওয়ার দরুন; কৃষ্ণমূর্তিকে বেশ কয়েকটি জায়গায় চিঠি লিখতে হয়েছিল একথা জানিয়ে যে তিনি সেসব দেশে আসছেন না, যাঁর ওখানে বক্তৃতা

দেওয়ার নিমন্ত্রণ হয়েছে তিনি অন্য এক কৃষ্ণমূর্তি।

তাঁদের সেদিনের বৈঠক প্রায় একঘণ্টা চলেছিল। কথাবার্তার শেষে কৃষ্ণমূর্তি তাঁর একজন সহকারীকে বললেন, পরের দিন ইউ জী-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পুনরায় বন্দোবস্ত করতে। সেদিনের পর থেকে যতদিন কৃষ্ণমূর্তি মাদ্রাজে ছিলেন, ততদিন যখনই তাঁর হাতে সময় থাকত তিনি ইউ জী-র সঙ্গে দেখা করতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা যখন কৃষ্ণমূর্তি হাঁটতে গিয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে ইউ জী-র পত্নী কুসুমা, দুই কন্যা এবং এক তরুণীর কোলে তাঁদের পুত্রের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। পরেরদিন যখন ইউ জী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন কৃষ্ণমূর্তি ইউ জী-কে বলেন যে, এক অল্প বয়সের মেয়েকে বড়সড় এক বালককে কোলে করে নিয়ে বেড়াতে দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করেন। কৃষ্ণমূর্তি বলেন, 'মহাশয়, একটি দশ বছরের মেয়ে অতবড় একটি ছেলেকে বয়ে বেড়াচ্ছে ...।' মৃদু ভর্ৎসনার সুরে এই উপদেশ শোনার পর ইউ জী উত্তরে বললেন, 'কৃষ্ণাজী, ওই বালকটি অসুস্থ। দুটো পা-ই পোলিও রোগাক্রান্ত। বিশেষ যান্ত্রিক ব্রেসের উপযোগ ছাড়া তার পক্ষে হাঁটা সম্ভবপর নয়। এই কারণে সেই বালককে কোলে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে মেয়েটির।' ইউ জী তখন কৃষ্ণমূর্তিকে আরও বলেন যে, আপাতত মার্কিন মুলুকে নিয়ে ছেলেকে চিকিৎসা করানোর কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। ওই দেশে বিশেষ ধরনের ব্রেস পাওয়া যায়। যার সাহায্যে তার পা দুটো ব্যবহার করতে অভ্যাস করার মধ্য দিয়ে হয়তো হাঁটা শিখতে পারবে।' এসব কথা শোনার পর হঠাৎ কৃষ্ণমূর্তি বললেন, 'এক কাজ করুন, আগামীকাল সপরিবারে চলে আসুন।'

ইউ জী স্ত্রী, দুই কন্যা ও পুত্রকে নিয়ে পরদিনই কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। রবিবার সকালবেলা জে কৃষ্ণমূর্তি সাধারণত কারোর সঙ্গে দেখা করতেন না। কারণ রবিবার সন্ধ্যাবেলা তিনি সাধারণ সম্মেলনে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু ইউ জী-র পরিবারের সঙ্গে দেখা করার একমাত্র সেই সময়টাই তাঁর হাতে খালি ছিল। সেই সাক্ষাৎকারের পর থেকে প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা ইউ জী সপরিবারে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করতে যেতেন যতদিন পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজে ছিলেন।

প্রথমদিন সকালবেলা প্রাথমিক সম্ভাষণ ও আলাপ পরিচয়ের পর কৃষ্ণমূর্তি তাঁর গৃহকর্তাকে বললেন বাচ্চাদের জন্য কিছু কমলালেবু আনতে। সবচেয়ে ছোট

বাচ্চাটি একটা লেবু নিয়ে তার খোসা ছাড়িয়ে খোসাগুলো ঘরের মেঝেতেই ফেলতে লাগল। কৃষ্ণমূর্তি সেদিন বাচ্চাটিকে দিয়েই সমস্ত খোসাগুলো কুড়িয়ে নিলেন এবং দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে কেন ফলের খোসা ঘরের চতুর্দিকে ছুঁড়ে ফেলা ঠিক নয় এবং কেন সেগুলো পরিষ্কারভাবে কুড়িয়ে একত্র করে আবর্জনা ফেলার জায়গায় রাখা উচিত। কৃষ্ণমূর্তি খুবই ধৈর্যের সঙ্গে বাচ্চাটিকে সেই কাজ করতে সাহায্য করলেন। ইউ জী সমস্ত দৃশ্যগুলো গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন। সবকিছু শেষ হওয়ার পর তিনি কৃষ্ণমূর্তিকে বললেন যে, তাঁর কথা বাচ্চার উপর কোনও প্রভাব বিস্তাব করবে না। 'কৃষ্ণাজী', তিনি বললেন, 'আপনি আর একটা কমলালেবু বাচ্চাটিকে দিন দেখবেন সে ঠিক আগের মতনই খোসা ছাড়িয়ে ঘরের মেঝেতে ফেলবে। বাচ্চাদের কীভাবে শিক্ষা দিয়ে বড় করতে হবে সে ব্যাপারে আমি এমন কারোর কথাবার্তা বিশ্বাস করতে চাই না যে নিজে কোনও বালক–বালিকা মানুষ করেনি। আপনি যদি নিজে কোনও বাচ্চা মানুষ করতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন আমি কি বলতে চাইছি।' যখন এসব কথাবার্তা চলছিল, ঠিক তখনই বাচ্চা মেয়েটি আবার সব খোসাগুলো মেঝেতে ফেলে দিল।

আলোচনার বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে পালটে গিয়ে বালকের চিকিৎসার উপর এসে থামল। ইউ জী তখন কৃষ্ণমূর্তিকে বললেন, ''আমি হিসাবপত্র করে দেখলাম যে মোট প্রায় নব্বই হাজার ডলার লাগবে চিকিৎসা সম্পন্ন করতে, এবং সব সমেত আমার ওই টাকাটাই আছে। কিন্তু সেটা করলে পরিবারের অন্যান্য বাচ্চারা তাদের ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে।'' কৃষ্ণমূর্তি উত্তরে বললেন, ''নব্বই হাজার ডলার তো প্রচুর টাকা, মহাশয়! জানেন, আমি আগে অসুস্থ লোকজনকে ভালো করে দিতাম। আপনি আমাকেই একবার চেষ্টা করতে দিন না কেন?'' ইউ জী প্রত্যুত্তরে জানালেন, ''আমি একজন সন্দেহবাদী লোক। যদিও আপনার এই অন্যকে সুস্থ করে তোলার ক্ষমতার কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু এক্ষেত্রে কোনও কাজ হবে না। বালকের পায়ের বিভিন্ন কোষসমূহ শুকিয়ে মৃত। আপনি সেসব কোষে জীবন ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। যদি একে ভালো করে তুলে হাঁটতে সক্ষম করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে। যিশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন, কারণ তিনি হয়তো সাঁতার জানতেন না। আর সেই রুটি ও মাছ অনেক গুণ করে অনুসরণকারী ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার গল্পটা

আসলে হয়তো কয়েকটা রুটিকে ছোট ছোট টুকরো করে সকলের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।'' কৃষ্ণমূর্তি এসব শুনে হাসিতে ফেটে পড়লেন।

ইউ জী-র স্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি কেন কৃষ্ণাজীকে আমার ছেলেকে সাহায্য করার ব্যাপারে বাধা দিতে চাইছো?' ইউ জী তখন বললেন, ''সে যতটা আমার ছেলে, ঠিক ততটাই তোমারও ছেলে। ব্যক্তিগতভাবে আমি একদম বিশ্বাস করি না যে কৃষ্ণাজী আমাদের ছেলেকে কোনওরকম সাহায্য করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর কোনওরকম চেষ্টা করার ব্যাপারে আমি অবশ্যই বাধা দেব না।'' কৃষ্ণাজী পরবর্তী বেশ কয়েকদিন ইউ জী-র ছেলের পায়ে মালিশ করে তাকে ভালো করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

একদিন মালিশ করার পর সবার অগোচরে ছোট বাচ্চাটি কৃষ্ণমূর্তির শোবার ঘরে চলে যায়। কৃষ্ণমূর্তি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান এবং বাচ্চাটির পেছনে দৌড়ে যেতে যেতে বলে ওঠেন, 'হে ভগবান! আমার ঘড়িটা টেবিলের উপরেই আছে।' ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং বাচ্চাটিই ঘড়িখানা হাতে নিয়ে আসে। যখন সে ঘড়ি ফেরত দিতে রাজি হল না, তখন কৃষ্ণমূর্তি বাচ্চাটিকে এক দীর্ঘ উপদেশাবলী শোনালেন যে কেন মূল্যবান জিনিস নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়, যা খেলনা নয়।

ইউ জী এবং তাঁর স্ত্রী এরপর বহুবার কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইউ জী-র স্ত্রী সংসারের সমস্ত টাকা দিয়ে এরকম একটা জুয়া খেলতে রাজি হচ্ছিলেন না যেখানে ছেলেকে আমেরিকায় চিকিৎসা করালে হয়তো ভালো হয়ে ওঠার কিছু সম্ভাবনা আছে। মেয়েদের ভারতে রেখে যেতেও তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না। এরকম অবস্থায় তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার কথা উঠল। সেসময় ইউ জী তাঁর স্ত্রীকে কৃষ্ণমূর্তির সামনেই শেষবারের মতন বললেন, ''তুমি হয় আমাকে ছেড়ে নব্বই হাজার ডলার নিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারো। অন্যথা আমার সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে চিকিৎসা করতে যেতে হবে আমেরিকায়। সে তুমি যাই করো না কেন, উভয়ক্ষেত্রেই আমি আমেরিকায় যাচ্ছি।''

তখন কৃষ্ণমূর্তি বললেন, ''মা, আপনি যা করতে চান উনি যদি সে কাজের প্রতিবন্ধক হন, তাহলে ওঁকে পদাঘাত করুন, হত্যা করুন, বোমা মেরে উড়িয়ে দিন বা ছেড়ে চলে যান।'' কুসুম কুমারীর উপর এই কথার প্রতিক্রিয়া দেখে ইউ

জী পর্যন্ত সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কুসুমাদেবী উত্তরে বললেন, 'যদি আমি সেসব করতেই পারতাম তাহলে আপনার কাছে এসে উপদেশ চাইতে যাব কেন?' কৃষ্ণমূর্তি কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অবশেষে ইউ জী-কে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে কৃষ্ণমূর্তি বললেন, ''অনুগ্রহ করে আর একটা বছর অপেক্ষা করুন। আমি আপাতত গ্রিসে যাচ্ছি। সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়া যাব। আপনি আপনার পরিকল্পনা ততদিনের জন্য দয়া করে স্থগিত রাখুন না কেন? আমি ডিসেম্বরেই ফিরে আসছি।'' ইউ জী রাজি হয়ে গেলেন।

লন্ডনে যখন ইউ জী ক্ষিপ্রহস্তে আমার ও তাঁর একপদ বিশিষ্ট নৈশভোজের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন, (কথায় কথায় বলে রাখি, ইউ জী দারুণ রান্না করেন), আমি তাঁকে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমার মতলবটা আঁচ করে ফেললেন। ''আপনার জীবন কথায় আমার সঙ্গে জে কৃষ্ণমূর্তির সাক্ষাৎকারটা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের উপর আমি কোনও কিছু ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখিনি। কিন্তু যা যা মনে আছে, তা বলে শোনাতে পারি।'' ইউ জী যখন সেই কাহিনি শোনাতে লাগলেন আমি নিঃশব্দে টেপ রেকর্ডারটা চালু করে দিলাম ঃ

> একদিন আমাদের কথোপকথনের মধ্যেই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, গতকাল মহান শিক্ষকদের প্রসঙ্গে কোনও এক প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আপনি বলেন, ''মহান শিক্ষকদের প্রসঙ্গ উঠলে আমি একথাই বলি যে, তাঁদের অস্তিত্ব আমি কখনই অস্বীকার করিনি। কৃষ্ণাজী, আপনার কাছে আমার একটাই প্রশ্ন যে, তাঁদের অস্তিত্ব সত্যি সত্যি আছে কি? এবং আমি সরাসরি এর উত্তর চাই।'' তিনি তখন বলেন, 'আমি যা উত্তর দেব, সেটাই কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।' আমি আবার বললাম, ''আমি আপনার এই কূটনীতি বিশারদদের মতন উত্তরে আগ্রহী নই, যাতে করে স্বীকার বা অস্বীকার কোনওটাই করা হল না। কেন আপনি এরকম উত্তর দেন যার বিভিন্ন মানে হতে পারে? কেন আপনি এই ব্যাপারটা খোলাখুলি একটা গাছে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন না, যাতে করে সবাই এটা দেখতে পায়?'' আমাকে উত্তর দেওয়ার বদলে

কৃষ্ণমূর্তি কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপনাদের ওই কনভেনশন কেমন চলছে?'

আমি তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ''আচ্ছা কৃষ্ণাজী, আপনি কি বলতে চান? আপনি যে অবস্থায় বর্তমান আছেন তা আপনি জনসাধারণকে যে সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণের ইঙ্গিত দিচ্ছেন, সেসব করে উপলব্ধি করেছেন? যুদ্ধের আগে আপনি ব্যবহার করতেন এক দুর্বোধ্য ভাষা, এখন যুদ্ধের পর আপনি আর একটা ভাষার প্রয়োগ করছেন, যাকে আমি বলতে পারি, 'কৃষ্ণমূর্তির ভাষা'। আপনার শিক্ষা আর কিছুই নয়, ফ্রয়েডিয়ান, জুংইয়ান, র‍্যানকিয়ান, অ্যাডলেরিয়ানের সব মালমশলা, আর তাতে একটু ধার্মিক টান মিশিয়ে দিয়েছেন। লোকজনদের খেলা করার জন্য এটা একটা নতুন খেলা বোধ হয়? আমাদের সময় বাচ্চারা দেবদারু গাছের কাঠ দিয়ে বানানো পুতুল নিয়ে খেলা করত। আপনি এখন লোকজনদের দিচ্ছেন এমন সব পুতুল যা হাঁটতে পারে, নাচতে পারে আর কথাও বলতে পারে।'' কৃষ্ণাজী হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ''যদি এসব কাজ করে তো করল, আর যদি কাজ না করে তো করল না।''

এক সময় আলোচনা ঘুরে ঘুরে এক অস্বাস্থ্যকর বিষয়ে এসে হাজির হল, যৌনতা। আমরা তখন আলোচনা করছিলাম মানুষের বৈবাহিক সম্পর্কের উপর। আমি বললাম, 'এটা শুধু যৌনক্ষুধা।' 'এর মধ্যে আরও নিশ্চয়ই কিছু না কিছু থেকে থাকবে' – কৃষ্ণমূর্তি বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি? একটা উদাহরণ দিন?' 'প্রেম', তিনি উত্তর দিলেন। 'প্রেমের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে?' আমি জানতে চাইলাম।

আমার স্ত্রী তখন আমাদের আলোচনা থামিয়ে বলে উঠল, 'আমি যৌন সম্পর্কিত আর কোনও প্রশ্নই করব না শুধু একটা ছাড়া। আপনার কি যৌনমিলনের অভিজ্ঞতা আছে, কৃষ্ণাজী?' আমি আমার স্ত্রীর সাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তখন

কৃষ্ণমূর্তির মুখের দিকে তাকালাম। দেখি, তাঁর চোখ দু'টো ভাবশূন্য হয়ে গেছে, বোকা বনে যাওয়ার মতন। ধীরস্বরে তিনি উত্তর দিলেন, 'মা, এই প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক।'

কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে আমার যতবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে যখনই আমি হাঁটতে যেতাম তাঁর মধ্যে আমি একটা অদ্ভুত গুণ লক্ষ্য করতাম। একে আমি তাঁর মধ্যেকার বয়েজ স্কাউট জাতীয় মানসিকতা বলে অভিহিত করতে চাই। একটা ঘটনা মনে পড়ছে, আমরা যখন দু'জনে হেঁটে বেড়াচ্ছি দেখি কৃষ্ণমূর্তি গভীর মনোযোগ দিয়ে রাস্তা থেকে কাঁটা আর পেরেক জাতীয় জিনিস কুড়িয়ে রাস্তার বাইরে ফেলে দিচ্ছেন। আমি তখন রসিকতা করে একটা পেরেক তাঁকে দেখিয়েছিলাম যেটা তাঁর নজরে পড়েনি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে সেই পেরেকটা সযত্নে তুলে নিলেন।

আর একদিন যখন মাদ্রাজের আডিয়ার সমুদ্র সৈকতে আমরা দু'জনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন একটা ছোট ছেলে এসে আমাদের কাছে পয়সা চাইল। কৃষ্ণমূর্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার কাছে খুচরো পয়সা আছে কিনা। আমি বললাম, 'দুঃখিত, না।' তখন কৃষ্ণমূর্তি বাচ্চাটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে দিলেন। আমি কৃষ্ণমূর্তিকে বললাম, আপনার আদরের থেকে তার পয়সার অনেক বেশি দরকার। পরের দিন আমি পকেটে পয়সা নিয়েই বেড়াতে এলাম সমুদ্রের ধারে। আর সেই বাচ্চাটা আবার এল আমাদের কাছে পয়সা চাইতে। আমি তখন তাকে একটা দু'টাকার নোট দিয়ে দিলাম। বাচ্চাটা মহানন্দে লাফাতে লাফাতে টাকা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিভিন্ন মূলগত ধারণার প্রশ্নে আমার ও কৃষ্ণমূর্তির মধ্যে বারবার মতবিরোধ দেখা দিতে লাগল। আমরা কখনই পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছিলাম না। যখনই আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হত, তখনই কোনও না কোনও ব্যাপারে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তাম। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, পৃথিবীর

প্রতি দুশ্চিন্তার ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে কখনই একমত ছিলাম না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর শিক্ষা আগামী পাঁচশ বছর ধরে মানবজাতির চিন্তা ও কাজকর্মের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করবে যা ছিল থিওসফিক্যাল সোসাইটির গুপ্ত বিশারদদের অলীক স্বপ্ন এবং এতেও আমার একদম বিশ্বাস ছিল না। আমাদের এরকম কোনও এক সাক্ষাৎকারের সময় আমি কৃষ্ণমূর্তিকে বললাম, 'আমাকে পৃথিবী রক্ষা করার জন্য কেউ ডেকে আনেনি।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে আগুন লেগেছে, তখন কি করবেন শুনি?' 'আরও পেট্রল ঢেলে দেওয়া উচিত, হয়তো ছাইভস্ম থেকে নতুন কিছু বেরিয়ে আসতে পারে' – আমি মন্তব্য করেছিলাম। কৃষ্ণমূর্তি উত্তরে বললেন, 'আপনার সঙ্গে পারা একেবারেই অসম্ভব!'

আমি তখন তাঁকে বললাম, ''আপনি কিন্তু এখনও একজন থিওসফিস্ট। আপনি নিজেকে সেই বিশ্ব শিক্ষকের পদ থেকে কখনই মুক্ত করতে পারেননি। অবধূত গীতাতে একটা গল্প আছে। একজন অবধূত রাস্তার ধারে এক সরাইখানাতে উঠেছিলেন। সরাইখানার মালিক নিজে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহাশয়! আপনার শিক্ষা কি?' অবধূত উত্তরে বললেন, 'কোনও শিক্ষক নেই, কোনও শিক্ষা নেই, কোনও শিক্ষার্থী নেই।' একথা বলে ধীরে ধীরে তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করলেন। আপনিও মাঝে মাঝে লোকেদের এসব বলেন, অথচ আপনি আপনার শিক্ষাকে ভবিষ্যতে বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষিত করে রাখার জন্য সবসময় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।''

আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার বিষয় নিয়ে একদিন কথা উঠল। কৃষ্ণমূর্তি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মেয়েরা কোন স্কুলে যাচ্ছে?' 'স্বভাবতই বেসান্ট থিওসফিক্যাল স্কুলে', আমি উত্তর দিলাম, 'কারণ স্কুলটা একদম বাড়ির পাশেই।' 'তাঁরা এখনও ধর্ম পড়ায়, মহাশয়?' তিনি বললেন। আমি উত্তরে তাঁকে

বললাম, 'ঋষি ভ্যালির স্কুলে কি পড়ায় শুনি? প্রার্থনা সভায় যাওয়ার বদলে আপনি ওইসব অনিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের টানতে টানতে পাহাড়ের উপর নিয়ে যান সূর্যাস্ত দেখাতে। এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়! আপনার সূর্যাস্ত দেখতে ভালো লাগে, সুতরাং বাচ্চাদের সেটা দেখতে হবে। আপনি হয়তো জানেন যে আমি প্রায় সাড়ে তিনদিন সেই গিন্ডী ন্যাশনাল স্কুলে ছিলাম। আপনার হয়তো মনে পড়বে যে আমাদের জন্য আপনি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। সেসব স্কুলে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার মতো কিছুই নেই। আমি তো রাস্তার ধারের এক স্কুলে পড়ে মানুষ হয়েছি। আমার মধ্যে গণ্ডগোলটা কোথায়?'

কৃষ্ণমূর্তি আমার মেয়েদের ঋষি ভ্যালি স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য আমাকে বোঝানোর বহু চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও আমাকে স্কুলে কিছু কিছু সময় কাটানোর উপদেশ দেন। 'অন্য আর কিছু না করার থাকলে হয়তো সে কাজ করব। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য তাদের নিজেদের বড় হতে হবে। আমি চাই না তারা সমাজে বাঁচার অযোগ্য হোক।' আমার স্ত্রী মেয়েদের সঙ্গে সেখানে যাওয়ার এবং শিক্ষিকা ও স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে থাকার কথা জানালেন। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তি তাঁকে বললেন, 'মা, আপনাকে এই রোগাক্রান্ত ছেলেকে দেখতে হবে যে, সেটাই হল আপনার সারাক্ষণের চাকরি।' তখন আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি ওখানে গিয়ে দেখুন না কিছুদিন, কেমন লাগে স্কুলটা। যদি আপনার ভালো না-ই লাগে, তাহলে স্কুলটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব, তারপর নতুন করে পাথরের পর পাথর সাজিয়ে, ইটের পর ইট গেঁথে গড়ে তুলব স্কুলটাকে।' আমি বললাম, 'আপনি বিশ্বের চতুর্দিকে পাক খাওয়া বন্ধ করে আগে স্কুলে থাকুন। তাহলে হয়তো আপনার সঙ্গে যোগ দিতে রাজি হয়ে যাব।' তিনি তখন বললেন, 'আমি বছরে একমাস ঋষি ভ্যালি স্কুলে কাটাই আর একমাস রাজঘাট স্কুলে থাকি, এর বেশি থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা দেওয়াটাই হল আমার ধর্ম।'

কৃষ্ণমূর্তি সবসময় বক্তৃতা দেওয়ার শুরুতে বলতেন, 'আসুন আমরা একসঙ্গে যাত্রা শুরু করি।' একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''আপনি কোথায় আছেন বলুন তো? আপনি সেখানে আছেন, না আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সত্যি সত্যি যাত্রা শুরু করেছেন? আপনি আপনার পছন্দ মতন একটা বিষয় বেছে নেন। তারপর লজিক্যালি, র‍্যাশনালি, সেনলি এবং ইন্টেলিজেন্টলি এক একটা পা ফেলে বিভিন্ন স্তরে অগ্রসর হতে থাকেন। তারপর এক জায়গায় এসে হঠাৎ থেমে গিয়ে আপনি বলতে শুরু করেন, 'আমি বুঝে গেছি! আর কেউ কি বুঝতে পারলেন?' এসব পুরোপুরি নাটুকেপনা। সাদা কথায় কৌতুকাভিনয়। তারপর সেখান থেকে চলে গিয়ে আপনি প্রেম, পরমানন্দ, সৌন্দর্য এবং গভীর অনুভূতির কথা বলতে থাকেন আর আমরা পড়ে থাকি কঠোর বাস্তবে। আপনি আমাদের যাচ্ছেতাই খারাপ ধরনের উড়োজাহাজে (বোগাস চার্টাড ফ্লাইট) করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।''

কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় যে প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যে সর্বদা ভেসে থাকত সেটা হল এরকম – ''এই যে নানা রকমের বিভ্রান্তিকর এবং অপার্থিব যুক্তি আপনি আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন তার পেছনে কি আছে? সত্যি সত্যিই কি কিছু আছে? আমি আপনার প্রেম ভরা কবিত্বে একেবারেই আকর্ষিত নই। যদি অপার্থিব যুক্তিবাদের কথাই ধরা যায়, তাহলে ভারত যেসব মহান চিন্তাবিদদের সৃষ্টি করেছে আপনি তাঁদের তুলনায় কিছুই নন। তাঁদের সামনে একটা মোমবাতি নিয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও আপনার নেই। যেভাবে জিনিসটা আপনি বর্ণনা করার চেষ্টা করছেন তাতে আমার মনে হয় যে, আপনি হয়তো মিষ্টির এক টুকরো চোখের দেখা দেখেছেন। পুরানো দিনের লোকেরা কথায় কথায় যেরকম বলে আর কি। কিন্তু আমি এখনও নিশ্চিত করে

বলতে পারছি না যে আপনি মিষ্টি চেখে দেখেছেন কি না?'' আমি এই একই প্রশ্ন বারবার বিভিন্নভাবে যখনই কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা হয়েছে প্রত্যেকবারই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু কোনওদিন এর প্রত্যক্ষ সুদত্তর পাইনি। শেষ পর্যন্ত একদিন আমাদের সম্পর্ক পুরোপুরি ভেঙে গেল মুম্বাইতে এক সাক্ষাৎকারের পর। সেটাই ছিল আমার সঙ্গে তাঁর সেই সময়কার শেষ দেখা। আমি তাঁকে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এই ঘোরানো–প্যাঁচানো যুক্তির পেছনে সত্যিই কিছু আছে কিনা। 'একবার অন্তত সব রাখঢাক ছেড়ে সত্যি কথাটা বলুন।' সেই সময় তিনি ভয়ংকর জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন – 'আপনার পক্ষে একে জানার কোনও পথ নেই।' তখন আমি তাঁকে বললাম, ''যদি আমার পক্ষে একে জানা কোনওভাবে সম্ভব না হয় এবং আপনার পক্ষে আমাকে জানানো কোনওভাবে সম্ভব না হয়, তাহলে এতদিন বসে আমরা কি করছি? আমি আপনার কথা শুনতে শুনতে সাতটা বছর নষ্ট করেছি। আপনি আপনার মহামূল্যবান সময় দয়া করে অন্যের জন্য সদ্ব্যবহার করুন। আমি আগামীকাল নিউইয়র্কে চলে যাচ্ছি।'' কৃষ্ণমূর্তি বললেন, 'আপনার যাত্রা সুখের হোক এবং ভালোভাবে পৌঁছে যান এটাই কামনা করি।'

ইউ জী প্রায় পাঁচ বছর আমেরিকায় ছিলেন। শ্রীযুক্ত ভাবেজীর মারফৎ কৃষ্ণমূর্তি মাঝে মাঝে তাঁর খবরাখবর নিতেন। ইউ জী–র ছেলের চিকিৎসা কীভাবে এগচ্ছে সে খবর তিনি সরাসরি পেতেন। তখনকার লেখা কৃষ্ণমূর্তির দুটো চিঠি দেখলাম, একটি ইউ জী–র প্রতি এবং অন্যটি ইউ জী–র স্ত্রীর প্রতি। চিঠি দুটো ছিল এরকমঃ

১৩ জানুয়ারি, ১৯৫৬

প্রিয় কৃষ্ণমূর্তি,

আপনার ৪ জানুয়ারিতে লেখা চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি শুনলাম আপনি আমেরিকায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। আপনার কাছে আপনার ছেলে যে দু–এক বছরের মধ্যে হাঁটতে পারবে সেরকম সম্ভাবনার কথা শুনে যারপরনাই আনন্দ পেলাম। যদি আপনি

কখনও ক্যালিফোর্নিয়ার ওহাইতে যান, আপনি শ্রীযুক্ত রাজাগোপালের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। তিনি সেখানেই থাকেন। আপনার কথা মতো আমি আশা রাখি হয়তো মার্চ মাসে বোম্বাইতে আবার আমাদের দেখা হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনার স্ত্রীকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন।

আপনাদের মঙ্গল কামনা করি,

শুভেচ্ছান্তে
জে কৃষ্ণমূর্তি

প্রিয় শ্রীমতী কৃষ্ণমূর্তি,

১৪ নভেম্বর লেখা চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনার পরিবারের সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা পড়ে খুব ভালো লাগল। আমি এটা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনার ছেলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠছে। আমি আশা রাখি আপনারা ফিরে আসার আগে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তার পা দু'টোকে পুরোপুরি উপযোগ করতে পারবে।

একথা জেনে খুবই খুশি হলাম যে আমার সঙ্গে আপনার দু'টো সাক্ষাৎকার খুব কার্যকরী হয়েছে এবং আপনি উপকৃত হয়েছেন। জানি না আবার কখন আমেরিকায় আসব এবং আপনাদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে। আপনাদের সকলের একান্ত কুশল কামনা করি।

স্নেহপূর্বক আপনাদের,

জে কৃষ্ণমূর্তি

অনেক বছর পরে একদিন সুইজারল্যান্ডের গেস্টাডে ইউ জী এবং জে কৃষ্ণমূর্তি হঠাৎ পরস্পরের সামনা-সামনি এসে পড়েন। তাঁরা দু'জনে একই রাস্তার পার্শ্ববর্তী হেঁটে চলার সরু পথ দিয়ে পরস্পরের দিকে আসছিলেন। সেই পথ এতই সংকীর্ণ ছিল যে একজনের বেশি একসঙ্গে চলা সম্ভবপর ছিল না। যখন ইউ জী-র চোখে পড়ল কৃষ্ণমূর্তিকে, তখন আর এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না। তাঁরা যখন পরস্পরের মুখোমুখি হতে লাগলেন, ইউ জী-র সঙ্গে যে সব বন্ধুবান্ধব হাঁটছিলেন

তাঁদের মধ্যে চাপা উত্তেজনার আভাস দেখা দিল। কোনও কিছুই ঘটল না। দু'জনেই কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে পরস্পরের প্রতি একসঙ্গে হাত জোড় করে ভারতীয় পদ্ধতিতে নমস্কার জানালেন। তাঁরা একটা শব্দ উচ্চারণ পর্যন্ত করলেন না। যেন সমুদ্রবক্ষে গভীর অন্ধকারে দুটো বিশাল জাহাজ নিঃশব্দে পরস্পরকে অতিক্রম করে নিজস্ব গন্তব্যস্থলের দিকে চলে গেল। কেউ কারোর দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না, যাঁর যাঁর নিজের রাস্তায় চলে গেলেন। পরের দিন সবার মুখে মুখে একই প্রশ্ন, 'কে কাকে প্রথমে অভিবাদন করেছিলেন?' ইউ জী–র সঙ্গে জে কৃষ্ণমূর্তির এটাই ছিল শেষ সাক্ষাৎকার।

১৯৯১ সালের ৩০ জুন দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়াতে 'লাইভস ইন দ্য স্যাডো উইথ জে কৃষ্ণমূর্তি' (রাধা রাজাগোপাল–স্লস লিখিত এবং লন্ডনের ব্লুমসবিউরি প্রেস দ্বারা গ্রন্থিত) নামক গ্রন্থের উপর আমার লেখা সমালোচনা বেরবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হইহই পড়ে গেল। বইটির উপর ইউ জী–র মন্তব্য ছিল এই রকম, ''রাধা যেন একগোছা ডিনামাইট ছুঁড়ে দিয়েছে। কৃষ্ণমূর্তির যৌন জীবনের গল্প, তাঁর মিথ্যা এবং কপটতার কাহিনি তাঁর দর্শন ও মহান শিক্ষার থেকে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এই বই থেকে যে চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে একথাই বলা যায় যে, কৃষ্ণমূর্তি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধোঁকাবাজ হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনাবিষ্কৃত রেখে গেছেন। মাথা নত করে জানাই আমার গভীর সম্মান!'' কৃষ্ণমূর্তির অনুসরণকারীরা যদিও নিজেদেরকে অত্যন্ত বিবর্তিত বলে মনে করেন, কিন্তু ঠিক একই রকমের প্রতিক্রিয়া তাঁরা প্রদর্শন করলেন যে রকম রজনীশের অনুসরণকারীরা আগে করেছিলেন। তাঁরা ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদককে জঘন্য একটা চিঠি লিখেছিলেন। আমার লেখা প্রবন্ধ 'দ্য ম্যান হু ডেয়ারড টু প্লে গড' (ভগবানের ভূমিকা গ্রহণ করার মতন দুঃসাহসী এক মানুষ) প্রকাশিত হওয়ার পর। বড় রকমের আঘাত পাওয়ার পর অপরের প্রতি আচরণটা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও রুচিসম্মত হবে এটুকুই আমি তাঁদের কাছে আশা করেছিলাম।

ব্রকউডে কৃষ্ণমূর্তি স্কুলের নির্মাতা একদিন ইউ জী–র সঙ্গে গেস্টাডে দেখা করতে এলেন। তিনি ইউ জী–র কাছে রাধার লেখা পুস্তক সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। ইউ জী প্রত্যুত্তরে বললেন, 'প্রথম ঢিলটা কে মারবে? আমি তো

না?' স্থপতি এই উত্তরে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ওঃ, কি অপূর্ব ক্লান্তিহরণকারী বিনয়! অথচ কৃষ্ণমূর্তির বিষয়ে আপনি চিরকাল জঘন্য, আক্রমণাত্মকভাবে অসম্মান প্রদর্শন করে এসেছেন।'

মাইকেল লঙ্গিনিউ সেই সময় এলান রোল্যান্ড বলে এক পিয়ানোবাদকের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই স্থপতিকে আরও কিছু বিশেষণ যোগান দিলেন যা ইউ জী জে কষ্ণমূর্তির মহান শিক্ষার উপর তাচ্ছিল্যভাবে প্রয়োগ করেন, প্রলাপ, বাগাড়ম্বরপূর্ণ, শূন্যগর্ভ বকুনি, জাল লোকের আজেবাজে কথা, অসঙ্গতিকর বাতেলা ইত্যাদি, ইত্যাদি। স্থপতি বলে উঠলেন আপনার বিশেষণের দীর্ঘ তালিকা আমাকে রজেটের লেখা, 'থেসারাস অফ ইংলিশ ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস'-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তিনি আরও বললেন, 'কৃষ্ণমূর্তির মহান শিক্ষাকে উড়িয়ে দেওয়ার মতন দুঃসাহস আজ পর্যন্ত কারওর মধ্যে দেখিনি।'

ইউ জী কখনও জে কৃষ্ণমূর্তিকে ছেড়ে কথা বলতেন না, এমনকী যখন কৃষ্ণমূর্তি মৃত্যুশয্যায় দিন কাটাচ্ছিলেন তখনও না। ইলাসট্রেটেড উইকলিতে আমার লেখা (২৫ মে, ১৯৮৬) 'টু সিয়ারস' (দুই ঋষি) প্রবন্ধটিতে আমার ও ইউ জী-র কথাবার্তা এভাবে উদ্ধৃত করেছিলাম।

- হ্যালো ইউ জী, মহেশ বলছি।
- হ্যালো মহেশ।
- দুবাই থেকে 'সুরভিত স্বামীজি' নামে জে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের উপর যে প্রবন্ধটা আপনাকে পাঠিয়েছিলাম সেটা পেয়েছেন কি?
- হ্যাঁ পেয়েছি। বেশ আকর্ষণীয়; শেষ পর্যন্ত তিনি সততার সঙ্গে এটা স্বীকার করলেন যে তিনিও এক ফুটবল খেলোয়াড়ের মতনই মনোরঞ্জনের ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্য হয়ে পড়েছেন। আমার মনে হয় না যে তিনি তাঁর মুখোশ পুরো খুলে ফেলেছেন। আপনি কি জানেন যে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়েছে, লিভার থেকে প্যানক্রিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে। কৃষ্ণমূর্তি মৃত্যুমুখে পতিত। দুঃখের সঙ্গে বলছি এখন শুধুমাত্র দিন গোনার ব্যাপার। হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নয়, তবে

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা শুরু হয়ে গেছে।

- কিন্তু কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন একথা স্বীকার করছে না।
- হয়তো তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে ফাউন্ডেশনের লোকেরা কোনও কল্পকাহিনি গড়ে তুলতে চায়। আপনি হয়তো জানেন যে আমাদের পরম্পরা বলে, মহান শিক্ষকরা আমাদের মতো সাধারণ লোকের ন্যায় মৃত্যুবরণ করে না।

দু'দিন পরে প্যানক্রিয়াটিক ক্যানসারে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির মৃত্যু ঘটে। ২০ ফেব্রুয়ারি ইউ জী মুম্বাই আসেন। আমি তাঁর আগমনের জন্য ভি আই পি লাউঞ্জে যে বন্দোবস্ত করেছিলাম, যাতে করে তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারেন, সেসব অগ্রাহ্য করে তিনি অন্যান্য সবার মতন ইমিগ্রেশনের এবং কাস্টমসের লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ সারলেন। বিজয় আনন্দের পালি হিল ফ্ল্যাটে যাওয়ার সময় আমি ইউ জী–কে জিজ্ঞাসা করলাম, ''ইউ জী, দয়া করে একটু গুরুত্ব দিন। সত্যি করে বলুন তো, জে কৃষ্ণমূর্তির মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনার কি অনুভূতি হয়েছিল?'' ইউ জী পুরোপুরি নিস্তব্ধ। যখন জোরাজুরি করতে লাগলাম, তিনি আবহাওয়া সম্পর্কে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর এই প্রতিক্রিয়া আমার কাছে খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হল। জে কৃষ্ণমূর্তির প্রসঙ্গ তিনি সর্বদা ভয়ানক অপছন্দকর ও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মোকাবিলা করতেন। তাঁর সেই বাক্যহীন মনোভাব আমায় বিচলিত করে তুলল। আমিও মনস্থির করে ফেললাম। তাঁর সেই 'কিছু বলার চেয়ে চুপচাপ থাকাই শ্রেয়' মনোভাব নিয়ে চলে যেতে আজ কিছুতেই দেব না, বিশেষ করে এমন এক ঘটনার পরবর্তীকালে, যা সবাইকে আন্দোলিত করে গেছে। 'দয়া করে কিছু একটা বলুন' – আমি জোর দিয়ে বললাম। অবশেষে তিনি উত্তর দিলেন ঃ

> আপনি কি শুনতে চান যা আমাকে বলতে হবে? আপনি চান যে আমি ওই কৃষ্ণমূর্তির অনুসরণকারীদের সান্ত্বনা বাক্য পাঠাই? না আপনি চান ওইসব লোকদের সঙ্গে যোগদান করি যাঁরা তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে প্রশংসার বাক্য পঞ্চমুখ দিয়ে ক্রমাগত বর্ষণ করে চলেছে? আমি কোনওভাবেই কৃষ্ণমূর্তির কাছে ঋণী নই। আমার কাছে তাঁর সম্পর্কে বলার মতন নতুন কিছুই নেই যা আমি আগে

> বলিনি। মৃত ঘোড়াকে চাবুক মেরে কোনও লাভ নেই। বর্তমানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে সমস্ত প্রচার মাধ্যম, তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে আমাদের যুগের মহানতম শিক্ষক হিসাবে। আর এরকম একটা সময়ে আমার পক্ষে তাঁর সম্পর্কে বেসুরো কোনও মন্তব্য করাটা অসভ্যতার এক পরম নির্দশন হয়ে থাকবে।

আমি ইউ জী-র এরকম একটা উত্তরে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। মনে হল, যেন অযথা কিছু বলে আসল কথাটা এড়িয়ে গেলেন। কয়েকদিন পর আমি হাতে একটা বই নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলাম। বইটার নাম হল, 'এন্ডিং অফ টাইম', জে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে ডেভিড বোমের কথোপকথন। মনে হল যেন ভুল করে মাইনপোঁতা মাঠে ঢুকে পড়েছি। যখন ইউ জী-কে বললাম যে বইতে কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন, ''আমি অবশ্য চিরকাল বেঁচে থাকার কথা বলছি না, যদিও নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে এই শরীরটা চিরকাল টিকে থাকতে পারে কিনা ... যদি শরীর কোনও এক শান্ত জায়গায় সবসময় থাকে তাহলে এটা অবশ্যই বলতে পারি যে এ দেহ বর্তমানের থেকে অনেক বেশিদিন টিকে থাকত ...।'' ইউ জী আমাকে বাক্যবাণে প্রায় উড়িয়ে দিলেন ঃ

> এই রসিকতাটা সমস্ত মূল্যায়নের অতীত। তিনি দিন দিন কি অসম্ভব উপহাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছেন। শরীরটা চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে এটা জোরের সঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি সমস্ত কিছুকে অবাস্তবতার চরম সীমায় নিয়ে যাচ্ছেন। এই যুগে এবং এরকম বয়সে এসব কথা বলতে গেলে একজনকে সবুজ উপত্যকায় বসে অসম্ভব কল্পনাপ্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে হবে। যাঁরা আত্মায় পুরোপুরি বিশ্বাস করে না এবং এর অবিনশ্বরতা সম্পর্কে ভরসা রাখতে পারে না তাঁরাই শরীরকে অমর করে তোলার এসব কল্পকাহিনি গিলতে চায়। কোনও লোকের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আসক্তি থাকা এক কথা, কিন্তু এরকম ধরনের মন্তব্যকে চেটে খাওয়াটা সম্মান জানানোর ছলনা মাত্র।
>
> আপনি কি করে এসব গলাধঃকরণ করছেন? আপনার দেখছি এই

সামান্য মূলগত বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটেনি। এটা যদি আপনি মেনে নেন তাহলে আপনাকে এক অতি নিম্নমানের অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে ধরে নিতে বাধ্য হব।

জেরেন্টোলজিস্টরা, যারা কীভাবে এবং কেন বার্ধক্য আসে তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছেন তারা হয়তো একদিন এই ব্যাপারটা সম্ভব করে তুললেও তুলতে পারেন। হয়তো তা খুব একটা সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়।

‘‘মানবজাতির প্রতি কৃষ্ণমূর্তির অবদান সম্পর্কে আপনার কি কিছু মন্তব্য আছে’’ – আমি জিজ্ঞাসা করলাম এবং তাঁর উত্তর ঃ

কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষায় নেশা ধরানোর মতো টান থাকায় লোকজন আকর্ষিত হয়েছেন এবং বাজারে অন্য সবার থেকে অধিক যুক্তিসম্মত বলে মনে হয়েছে। ধার্মিক চিন্তাধারার জগতে তাঁর সার্বিক স্থান কোথায় এই ব্যাপারে বলার মতো আমার কিছুই নেই। যে সমস্ত ঐতিহাসিক মানব জাতির চিন্তাধারার উপর কাজ করেন তাঁরা যদি তাঁকে বুদ্ধ, যিশু এবং মহম্মদের পাশাপাশি স্থান দিতে চান সেটা পুরোপুরি তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ঃঃ – ঃঃ

লন্ডনের পথে পথে

''অপরের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা জীবনে কোনও পরিবর্তন আনতে কদাচিৎ সাহায্য করে না। যদি তা না-ই হত, তাহলে এতদিনে আমাদের সবার জীবন এক মধুর সংগীতে রূপান্তরিত হয়ে যেত। ''

– ইউ জী

১৯৬১ সালে ইউ জী লন্ডনে এসে হাজির হলেন। নিঃস্ব এবং একাকী। ''কোনও কিছু করার মতো ইচ্ছাশক্তিটুকুও তখন আমার মধ্যে ছিল না। একটা শুকনো পাতার মতন এখানে, সেখানে এবং সর্বত্র উড়ে যেতে লাগলাম।'' বন্ধুরা চোখের সামনে দেখলেন কীভাবে তিনি অধঃপতনের চরমে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ইউ জী-র ভাবনা অনন্য সাধারণ। তাঁর মতে তিনি তখন যা করেছিলেন সেটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল। ইউ জী-র ওই সময়ের দিনগুলোকে বর্ণনা করার জন্য অতীন্দ্রিয়বাদের ''আত্মার অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি যাপন'' (ডার্ক নাইট অফ দ্য সোল) জাতীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়। ইউ জী কিন্তু এ ব্যাপারেও সহমত নন। তাঁর দৃষ্টিতে, ''পার্থিব জগতের সমস্ত লোভনীয় বস্তু সামগ্রীর প্রতি আসক্তি-অনাসক্তির পরীক্ষায় উন্নীত হওয়ার জন্য বীরদর্পে প্রবল সংগ্রাম ধরনের কোনও কিছু তখন আমার মধ্যে ছিল না, না ছিল আত্মাকে মুক্ত করার অসীম বাসনা বা কবিত্বে ভরা চরম সন্ধিক্ষণের পরবর্তীকালের অপেক্ষা, যা ছিল তা হল, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সমস্ত রকমের ইচ্ছাশক্তির অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া।''

ইংল্যান্ডে শীতকালীন ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি দিনের বেশিরভাগ সময় কাটাতেন লন্ডনের সিটি লাইব্রেরিতে, সেখানে যে চেয়ারে তিনি বসতেন,

সেটা ছিল এক বিখ্যাত চেয়ারের পার্শ্ববর্তী চেয়ার। সেই চেয়ারে কার্ল মার্কস বসে দাস ক্যাপিটাল লিখেছিলেন। সমস্ত লাইব্রেরিতে একটা বই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই বই–এর নাম হল 'থিস্যরাস অফ আমেরিকান আন্ডার গ্রাউন্ড স্ল্যাং' (আমেরিকায় গোপনে ব্যবহৃত অশিষ্ট শব্দসংগ্রহ)। রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন আর বিভিন্ন গাছে যে কল গার্লদের নাম ও টেলিফোন নাম্বার লেখা থাকত সেগুলো পড়তেন।

একদিন ইউ জী নিজেকে বললেন, ''এরকম জীবন মোটেই ভালো নয়। বাস্তবিক আমি একটা ভাঁড়ের মতন লোকের দানের উপর দিয়ে জীবন চালাচ্ছি। এটা অত্যন্ত বিকৃত নিম্নমানের জীবনযাত্রা। আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছি।''

সেদিন পথে পথে সন্ধ্যা কাটানোর পর রাতে এসে ইউ জী হাইড পার্কে সবে একটু বসেছেন অমনি এক পুলিশ এসে জ্বালাতন শুরু করে দিলেন। তাঁকে সাবধান করে বলে দিলেন, যদি কিছুক্ষণের মধ্যে পার্ক থেকে বেরিয়ে না যান, তাহলে জেলে পুরে দেবেন। পকেটে তখন পাঁচ পেন্স। 'রামকৃষ্ণ মিশন যাও' – মাথার মধ্যে যেন একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। পাঁচ পেন্সে লন্ডনের সাবওয়ে দিয়ে যতদূর যাওয়া যায় তিনি ততটা গেলেন। তারপর রামকৃষ্ণ মিশনের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন। অবশেষে রাত দশটার সময় ইউ জী রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান দরজার সামনে এসে হাজির হলেন।

'আপনি এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না', মিশনের একজন কর্মচারী জানিয়ে দিলেন যখন ইউ জী স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। ভাগ্যের হয়তো খেলা, স্বামীজী নিজেই এসে হাজির হলেন। ইউ জী তখন স্বামীজীকে একটা নোটবুক দেখালেন যাতে তাঁর বক্তৃতার উপরে খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখা অংশগুলি ছিল এবং বললেন, 'এই ছিলাম আমি, আর এই হল আমার বর্তমান অবস্থা।' স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি চান?' ইউ জী শুধুমাত্র তাঁর অনুমতি চান যাতে করে রাতটা ধ্যানঘরে কাটাতে পারেন এবং পরের দিন ভোর হতেই চলে যাবেন। স্বামীজী বুঝিয়ে বললেন যে, এটা আপাতত সম্ভব নয়। কারণ এই কাজ মিশনের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু স্বামীজী ইউ জী–কে কিছু টাকা দিলেন এবং পরের দিন একটা ঘরের ব্যবস্থা করার কথা দিয়ে বললেন, 'আজ রাতটা কোনও হোটেলে থাকুন এবং দয়া করে কাল সকালে এসে আমার সঙ্গে

দেখা করবেন।'

পরের দিন দুপুরবেলা ইউ জী রামকৃষ্ণ মিশনে প্রত্যাবর্তন করলেন। দুপুরে তাঁর খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁর ওই সময়ের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে করতে ইউ জী বলেন, 'সেদিন প্রথমবার বহুদিন পরে সত্যিকারের মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিলাম। আমার ক্ষুধা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কি জিনিস সেকথাও প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম।'

''লেখাপড়ার কাজ করতে আমি একেবারেই অপারগ। আমি আপনার খাবার থালা ধুয়ে দেব বা অন্য যে কোনও কাজ করতে রাজি, কিন্তু কিছু লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব'' – ইউ জী বলে উঠলেন, যখন স্বামীজী তাঁকে বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশনার কাজে সাহায্য করার প্রস্তাব জানালেন। ভারতীয় দর্শনের উপর জ্ঞান আছে এমন একজন লোককে স্বামীজীর তখন খুব দরকার। তাঁর সহায়ক, যিনি প্রকাশনার কাজে সমস্ত রকম সাহায্য করতেন, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে হয়। স্বামীজী বললেন যে, এই অবস্থায় তিনি কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। ইউ জী অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, লেখার ব্যাপারে তাঁর বিরাট এক সমস্যা আছে। কিন্তু স্বামীজীকে কিছুতেই টলাতে পারলেন না।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর উপর কাজ করার সময় ইউ জী-কে পাঁচ পাউন্ড করে দেওয়া হত। যা মিশন অন্যান্য স্বামীজীদের দিত। ইউ জী তখন টাকা পয়সার মূল্যবোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ তাঁর জীবনে এমন একটা সময় ছিল যখন তিনি এক লাখ টাকার চেক অনায়াসে লিখে দিতে পারতেন। সেই পাঁচ পাউন্ড পেয়ে ইউ জী ঠিক করলেন লন্ডনে যত সিনেমা চলছিল সব দেখবেন। মিশনে তিনি থাকা শুরু করে দিলেন। সকালে প্রকাশনার কাজ, দুপুরে একটার সময় খাওয়াদাওয়া, তারপর সিনেমা দেখতে বেরিয়ে পড়তেন। সব টাকা এভাবে খরচ করে ফেললেন। লন্ডনের আশপাশে যেখানে যত সিনেমা চলছিল, সব দেখে ফেললেন।

''কেন তাঁরা ওইসব অর্থহীন জিনিস করে যাচ্ছেন?'' ইউ জী অবাক হয়ে ভাবতেন যখন রামকৃষ্ণ মিশনের লোকদের ধ্যান করতে দেখতেন। তাঁর জীবনে ওইসব খেলা বহুদিন আগেই সাঙ্গ হয়েছে। তারপর একদিন সেই ধ্যানমন্দিরে তাঁর

এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল।

> আমি চুপচাপ বসে আছি, কিছুই করছি না, শুধু অন্যদের দেখছি আর তাঁদের সবার জন্য মনটা দুঃখে ভরে যাচ্ছিল। ‘‘এই সমস্ত লোকজন বসে বসে ধ্যান করছেন। তাঁরা কেন সবাই সমাধিস্থ হতে চাইছেন? তাঁরা কোনও কিছুই খুঁজে পাবেন না ... আমি এসব বহু করে দেখেছি ... তাঁরা শুধু নিজেদের ঠকাচ্ছেন। এতগুলো জীবন এসব অযথা জিনিস করে বৃথা চলে যাচ্ছে, আমি তাঁদের কীভাবে সাহায্য করে বাঁচাতে পারি? এসব করে তাঁরা কোথাও পৌঁছাতে পারবেন না।’’ আমি শুধু বসে বসে এসব ভাবছিলাম। কিছুক্ষণ পরে পুরোপুরি সব ভাবনাচিন্তা দূর হয়ে গেল। মনটা পুরো শূন্য, হঠাৎ অনুভব করলাম এক অদ্ভুত জিনিস, মনে হল, শরীরের মধ্যে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। মনে হল, এক শারীরিক শক্তি আমার লিঙ্গদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে উপরে উঠে যাচ্ছে এবং মাথার মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, যেন সেখানে একটা ছিদ্র আছে। সেই শক্তিরাশি যেন ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠছিল একবার দক্ষিণাবর্ত এবং পরের বার বামাবর্ত হয়ে। বিমান বন্দরে উইলস সিগারেটের বিজ্ঞাপনে যেমন ছবি দেখা যায় অনেকটা সেরকম। আমার কাছে এটা একটা হাসির ব্যাপার বলে মনে হল। আমি এই অভিজ্ঞতাকে কোনওরকম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয়াতীত ব্যাপারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে কিছু মনে করলাম না। সামাজিক মানুষ হিসাবে আমি ততদিনে শেষ হয়ে গেছি। আমাকে অন্য কেউ খাওয়ায় এবং অন্যের দয়ায় আমার আস্তানা জোটে। আগামীকাল বলে আমার মধ্যে কোনওরকম চিন্তা ছিল না। তথাপি আমার মধ্যে কীসব অদ্ভুত জিনিস হচ্ছে ...

এসব ঘটনার তিনমাস পর ইউ জী স্বামীজীকে বললেন, ‘আমি চললাম, এসব কাজ আর আমি করতে পারছি না।’ এবং ইউ জী যখন রামকৃষ্ণ মিশন পরিত্যাগ করলেন, স্বামীজী তাঁকে পঞ্চাশ পাউন্ড দিলেন। মিশন ছেড়ে যাওয়ার কিছুদিন আগে স্বামীজীকে লেখা ইউ জী-র একটা কৌতুহলী চিঠি এখানে তুলে ধরলাম।

৭ সেপ্টেম্বর, ৬৩

প্রিয় স্বামীজী,

আমি মহারাজের কাছে আপনার চক্ষু অপারেশন যে ভালোভাবে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলাম। আপনি যে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া দুই-এক সপ্তাহের মধ্যেই মিশনে প্রত্যাবর্তন করিবেন তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইলাম, ইহা সত্যিই অতি সুখবর। আমরা সকলেই আপনাকে আশ্রমে দেখিবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। আমি একবার হাসপাতালে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আগ্রহী। কিন্তু ইহা যদি কোনওরূপে আপনার সামান্যতম অসুবিধার সৃষ্টি করে, তাহা হইলে অবশ্যই আসিব না। যদি মনে করেন যে, ইহাতে কোনও অসুবিধা নাই, তাহা হইলে আমি আপনার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব এবং আপনাকে কথা দিতেছি যে, সাক্ষাৎকার অতি সংক্ষিপ্ত হইবে।

হে ঈশ্বর, যদি একবার জানিতাম কি সেই অদৃশ্য হাত যাহা আমাকে মিশনে লইয়া আসিল। আপনি যখন প্রকাশনার কাজে সাহায্য করিবার পরামর্শ দিলেন, তখন আমি এক মুহূর্ত চিন্তা না করিয়াই আপনার দয়ালু পরামর্শে আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিলাম। তখন কি কোনও প্রকারে জানিতাম যে আমার এই আশ্রমে থাকিবার দিনগুলি জীবনের পরম আশীর্বাদধন্য মুহূর্তগুলির মধ্যে চিরকালের জন্য অন্যতম প্রধান হইয়া রহিবে। আপনার সঙ্গে কর্মে লিপ্ত হইয়া যে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা বলিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। আমি শরীরে ও মনে এক সুন্দর পুনরুজ্জীবন অনুভব করিতেছি।

ইহা ছাড়াও এই আশ্রমে একটানা থাকিতে পারায় এবং পরম উৎসাহ ও সতর্কতার সঙ্গে ধ্যানে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজনীয় পরিবেশ পাইবার মধ্য দিয়া আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। আমার জীবনের মধ্যে যে গভীর যন্ত্রণা লুকাইয়া ছিল, যাহা কোনও

মানুষের পক্ষেই বুঝিয়া উঠা সম্ভবপর ছিল না, তাহা কোনও কিছু বুঝিবার পূর্বেই হঠাৎ করিয়া কোন সমীরে মিলাইয়া গেল। আমাকে জাগ্রত করিয়া দিল, আধ্যাত্মিক ঘুমের ঘোর কীভাবে যেন কাটিয়ে গেল। বিশাল খাদের মুখ হইতে নিজেকে অলৌকিকভাবে উঠাইয়া আনিতে সমর্থ হইলাম।

আপনি নিশ্চয়ই জানিয়া থাকিবেন যে, আমাদের প্রায় সকলেরই জীবনে যখন এই রকম কিছু কিছু বিরল মুহূর্ত আসিয়াছে, তখন আমরা সেই 'নিত্য' যাহা সময়ের অতীত তাহাকে ক্ষণিকের তরে হইলেও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমার জীবনেও বেশ কয়েকবার সেই ধরনের মুহূর্ত আসিয়াছে। কিন্তু এই স্থানে, আমার যাহা অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা ক্ষণমুহূর্তের উপলব্ধি বলিয়া ছোট করিতে চাই না, ইহা অনেক অনেক গভীর, বস্তুত ইহা এমনই জীবন্ত যে আমার মধ্যে এক অপরিসীম দৃঢ়তা আনিয়া দিয়াছে। তৎসত্ত্বেও নিজেকে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানাইয়া লইবার চাপ ও ক্লান্তি মনের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের পরিশ্রম বিমুখতার সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবস্থা হয়তো আত্মগর্বের পরিণতি এবং ইহা যদি সত্যি হয়, তাহা হইলে ইহার পরিণতি হইল গভীর হইতে গভীরতর দুঃখ, বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এক শূন্য প্রত্যাশা লইয়া। যদিও আমি অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক শান্ত হইয়াছি, কিন্তু এই শান্ত সমাহিত ভাব যেন মৃত্যুকামী বিবশতা বলিয়া মনে হইতেছে। এই কথা আমি সর্বদা বিশ্বাস করিতাম এবং বর্তমানেও করি, যে কোনও মানুষ তাহার চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা হইতে নিজেই নিজের উদ্যোগে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে।

আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ও মনোযোগের প্রয়াস সত্ত্বেও আমি নিজেকে জীবনের হিংস্র চক্র হইতে মুক্ত করিবার কাজে সফলতা অর্জন করিতে পারি নাই। অথচ এই স্থানে থাকিবার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অনির্বচনীয় দৈবিক শক্তির স্পর্শে আমি পরম আশীর্বাদ ধন্য হইয়াছি। সমস্ত শব্দের ও ভাষার অতীত এক স্বচ্ছতায় আমি

পরিপূর্ণ। কিন্তু বর্তমানের প্রশান্তির মধ্যে না আছে কোনও অলসতা, না আছে কোনও মৃত্যু আহ্বানকারী বিবশতার স্পর্শ – আছে শুধু সজাগ প্রত্যাশা। আর যাহা রহিয়াছে, তাহা হইল এক শান্তিময় একক ভাব এবং হৃদয়ের পরিপূর্ণতা। ইহা বলাই বাহুল্য যে, বর্তমানে আমি পুনরায় জগতের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িব। এক গভীর আনন্দ হৃদয় হইতে সদা নির্গত হইতেছে। নিঃসন্দেহে আমি এক নতুন মানুষে পরিণত হইব।

গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধাপূর্বক
আপনার চিরদিনের
ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি।

ইউ জী–র উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর খবর ততদিনে ভারতে পৌঁছে গেছে। এই সময় শ্রদ্ধেয় ভাবেজী লন্ডনে ইউ জী–র কাছে চিঠি লিখলেন। বারবার করে অনুরোধ করলেন যেন একবার কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করেন। ইতিমধ্যে যখনই কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে ভাবেজীর সাক্ষাৎ হয়েছে কৃষ্ণমূর্তি ইউ জী–র এবং পরিবারের সকলের খোঁজখবর নিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে ইউ জী–র ব্যক্তিগত জীবনের এবং ছেলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার ফলাফল ও পরবর্তী অবস্থার প্রতি খুব উৎসুক ছিলেন। ইউ জী–র অবশ্য কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে কোনও আগ্রহ ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি একটা চিঠি লিখলেন। পরদিনই কৃষ্ণমূর্তি টেলিফোন করে বললেন, ‘আপনি এখানে চলে আসুন। আমরা রিচমন্ড পার্কে হাঁটতে যাব এবং সেই সময় সব কিছু আলোচনা করা যাবে।’

সন্ধ্যাবেলা যখন ইউ জী সেখানে পৌঁছালেন, তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। বাইরে হাঁটতে যাওয়ার বদলে দু’জনে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। ইউ জী বললেন যে, তাঁর ছেলে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছে। এখন সে নিজেই হাঁটতে পারে। ‘আপনি এখানে কি করছেন?’ – কৃষ্ণমূর্তি জিজ্ঞাসা করলেন ইউ জী–কে। ‘‘আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে না যে আপনি বিশেষ ভালো আছেন। আপনি ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্ছেন না কেন?’’ ইউ জী উত্তরে বললেন, ‘‘আমি লন্ডনে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমার কিছু করারই নেই এবং আমি ভারতবর্ষে ফিরে যেতে চাই না। আমার পরিবার আবার

আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইবে, যা করার আমার একদম ইচ্ছা নেই। পরিবারের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক শেষ।'' তখন কৃষ্ণমূর্তি বললেন, ''যদি আপনার পরিবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাঁদের বলে দেবেন এই ব্যাপারে আপনার কোনও আগ্রহ নেই।'' কৃষ্ণমূর্তির এই উত্তর ইউ জী-র কাছে খুবই হাস্যকর বলে মনে হল। তিনি কৃষ্ণমূর্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি কোনওদিন সংসার বলতে কিছু ছিল?' কৃষ্ণমূর্তি অবশ্য এই প্রশ্নকে পুরোপুরি এড়িয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ বসে রইলেন। হঠাৎ কৃষ্ণমূর্তি ইউ জী-কে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছেন?' এই প্রশ্ন শুনে ইউ জী এবার সরাসরি তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলেন কৃষ্ণমূর্তির কোনও ধারণাই নেই তখন কি ঘটনা ঘটে চলেছে ইউ জী-র গভীর অভ্যন্তরে। 'আমি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার কোনও চেষ্টাই করছি না। আপনার পক্ষে আমাকে বোঝা সম্ভব নয়' – ইউ জী বললেন। 'বেশ তাহলে আলোচনা করা যাক, কেন আপনি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত নন?' কৃষ্ণমূর্তি চাইলেন ইউ জী-কে আলোচনার মধ্যে জড়িয়ে নিতে। ইউ জী আর সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, ''দুঃখিত, আমি এখানে আমার সংসারের সমস্যা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আসিনি। তেলেগু ভাষায় একটা প্রবাদের মতন আপনি দেখছি একই রকমের চিকিৎসা করেন, যদি কেউ বজ্রাঘাতে আহত হন বা গলায় ভাত আটকে বিষম খান। এমন কী আমি আপনার কাছে কোনও সাহায্য চাইতেও আসিনি।'' ইউ জী ফিরে আসার আগে কৃষ্ণমূর্তি অনেক বুঝিয়ে রাজি করালেন যেন ইউ জী উইম্বলডনে তাঁর বক্তৃতা শুনতে যান, সেখানে বারোটা বক্তৃতা দেওয়ার কথা আছে।

অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইউ জী প্রথম তিনটি বক্তৃতায় হাজির হলেন। প্রত্যেকদিন বক্তৃতার শেষে কৃষ্ণমূর্তি ইউ জী-র কাছে এসে হাত ধরে জিজ্ঞাসা করতেন, 'বক্তৃতা কেমন লাগল? আপনার কি কোনও উপকার হল?' ইউ জী যথারীতি উত্তর দিতেন, 'আমি মনোযোগ দিয়ে শুনিনি।' পরে অবশ্য কথায় কথায় আমায় বলেছিলেন, 'ওইসব বক্তৃতা ভীষণ একঘেয়ে লাগত, সেই একই পুরানো কথা শুনিয়ে শুনিয়ে তিনি আমায় বোর করে ছেড়েছিলেন।' সেই ছিল কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে ইউ জী-র শেষ সাক্ষাৎকার।

১৯৬১ সালের ৩০ ডিসেম্বর, ইউ জী-র লেখা তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশ্যে পত্রখানি নীচে উদ্ধৃত করা হল, যাতে তিনি বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ করে দেন ঃ

> আমি এখানে ফিরে এসে **১১** সেপ্টেম্বর **১৯৬১**-তে লেখা তোমার চিঠিখানা পেলাম।
>
> এই ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার যে আমি তোমার দৃষ্টি উন্মোচন করতে সক্ষম হইনি এবং প্রকৃত ব্যাপারটা কখনও বোঝাতে পারিনি। তোমার আত্মহত্যা করার প্রয়াসের কথা শুনে খুবই আঘাত পেয়েছি। কিন্তু তোমার প্রতি আমার নিরাসক্তভাব এবং পরোক্ষভাবে তোমার কার্যাবলীকে মেনে নেওয়াটা প্রকৃতই সত্য। এর মধ্যে কোনও দ্বেষ নেই। আমার মধ্যে বিদ্বেষের কোনও চিহ্নমাত্র নেই। সাংসারিক বন্ধন আমার মধ্যে শিথিল হয়ে আপনা-আপনি খসে পড়েছে।
>
> এ সমস্ত জিনিস আমি গভীরভাবে বহু চিন্তা করে দেখেছি। তুমি তো জানো, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানোর মতো লোক আমি নই। বিশেষ করে পারিবারিক ব্যাপারে এবং ঝোঁকের মাথায় আমি কোনও কাজ করি না। আমাদের বিবাহের সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়ে যাক। আমরা দু'জনেই একজন অন্যজনের গভীর দুঃখ চোখের সামনে দেখে সহ্য করতে পারব না। এর থেকে অতীতের সুখস্মৃতি নিয়ে থাকাটাই শ্রেয়। তোমার হয়তো অতীতে সুখ বা শান্তির স্মৃতি বিশেষ কিছুই নেই। হয়তো বহু ব্যাপারে দুঃখ ও কান্নার কথাই মনে পড়বে। আমিও মানসিকভাবে তোমার মতনই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এসবের অভিব্যক্তি খুবই ভিন্ন ধরনের। অতীতে হয়তো বা তোমার গায়ে হাত উঠিয়েছি বা মনে আঘাত দিয়ে অনেক কিছু বলেছি। সেসব কিছু এখন শেষ হয়ে গেছে। তাঁর কোনও রেশ পর্যন্ত আমার মধ্যে নেই। আমার জন্য যদি তোমার খুব কষ্ট হয়, চিঠিতে তুমি অবশ্য তাই লিখেছ, আমি তোমার অনুভূতিকে নিজের মতো করে বুঝতে পারি। আমি জানি, তুমি আমায় কত গভীরভাবে

ভালোবাস। আমাদের সমস্ত মন কষাকষি ও ঝগড়াঝাটি সত্ত্বেও আমি তোমায় গভীরভাবে ভালোবেসেছি। কিন্তু এখন 'ভাঙা ডানা' জোড়া লাগিয়ে ওড়ার চেষ্টা তোমায় সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে ফেলবে। তুমি তোমার জীবনকে শুধু অভিমানের ভিত্তিতে চালাতে পারবে না এবং কোনও বৈবাহিক জীবন শুধুমাত্র সেটাকে ভিত্তি করে টিকে থাকতে পারে না।

আমরা গত আঠারো বছর ধরে পরস্পরকে জানি। এই সুদীর্ঘ আঠারো বছরের বন্ধনকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব। পুরানো অভ্যাস ও স্মৃতি খুব আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকে। আমি তোমাকে কোনওদিন ভুলতে পারব না এবং এটাও ভালো করে জানি যে, আর কোনওদিন কোনওকিছু তোমার প্রতি আমার অনুভূতির তীব্রতার সমকক্ষ হতে পারবে না। আমাদের প্রথম সাক্ষাতেই তোমাকে আমার অস্বাভাবিক ভালো লেগেছিল। সেই ভালো লাগা আমার অন্তরে চিরকাল বেঁচে থাকবে। তারপর থেকে আমাদের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তার কোনওকিছুই আমার সেই ভাবনাকে কোনওদিন পরিবর্তন করতে পারবে না। বস্তুত সেটাই হল স্বাভাবিক, অন্যথা কিছু হওয়া অসম্ভব। আমাদের মধ্যকার বন্ধন হল এক 'নিগূঢ় আভ্যন্তরীণ শক্তি' যাকে সংস্কৃত কবিরা প্রেমের সারমর্ম বলে অভিহিত করেছেন। এটা শুধু যৌন সংক্রান্ত আকর্ষণ নয়। যখন তুমি প্রথম কোনও কিছু অনুভব করো যা এর আগে কোনওদিন অনুভব করনি, তখন যে অনুভূতি হয়, তাকে কি বলবে? আমার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা টানাপোড়েনের অন্তিমে এসে পৌঁছেছি। অশ্রুজল ও গভীর বেদনা হয়তো তোমার দিকে বেশি পড়েছে, কিন্তু ক্রমাগত ক্রুদ্ধভাষা, সর্বদা তিক্ততা এবং প্রতিশোধের মনোভাব তা যতই ন্যায়সম্মত হোক না কেন, কোনওদিন কোনও সমস্যার সমাধান করে আমাদের কোনও বিশেষ জায়গায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে না। এই দীর্ঘস্থায়ী হীনমন্যতা কখনই আকাঙ্খিত নয় এবং এর

কোনও উপযোগিতাও নেই। ক্রোধ এক ভয়ংকর জিনিস, মানুষকে কুরে কুরে খায়। কখনও কখনও ওই সমস্ত 'ব্ল্যাকমেল করার অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করা লাভজনক বলে মনে হয়, যা অবশ্য তোমাদের পরিবারের প্রধান হাতিয়ার। আপাতদৃষ্টিতে এসব ব্যবহার করে তুমি হয়তো ক্ষণিকের তরে স্বস্তিলাভ কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ছেলেমেয়েদের এর জন্য দুর্দশাগ্রস্ত হতে হবে। আমাদের ছেলেমেয়েদের যে অসংলগ্ন জীবনের মধ্যে আমরা ফেলে দিয়েছি তার জন্য আমরা অন্য কাউকে দোষ দিতে পারব না। আমি তাদের জীবনে দুর্দশা ছাড়া আর হয়তো কিছুই দিইনি। আমি এটা ভালো করেই জানি যে, চিরকাল আমার ঘরের দরজার উপর লেখা থাকবে যে আমি আমার সন্তানদের বিভ্রান্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেছি, তাদের জীবনে দুঃখ ছাড়া আর কোনও আশার বস্তু রেখে যেতে পারিনি। তবুও একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, কি করে তোমাদের অবস্থা আগের চেয়েও বেশি কষ্টকর হতে পারে। আমাদের খারাপ অবস্থার সত্যতা অস্বীকার করার কঠোর জেদ তোমার মধ্যে নিদারুণ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করছে।

কেন আমি পৃথিবীর সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়েও তোমার কাছে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয় সে কথা বুঝতে পারি না? যাক সে কথা। আমি এসব ব্যাপার যেভাবে যেদিকে যাচ্ছে তা সে যে জাহান্নামেই হোক না কেন, সেদিকে যেতে দেওয়াটাই, অতীতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে অনেক শ্রেয় মনে করি। যেহেতু আমরা সবাই যে যা চাই ঠিক তাই পাই, কোনও কিছু একটু বেশি কম নয়, তাই আমার জীবনে যা ঘটেছে এবং জীবনপ্রবাহ যে দিকে যাচ্ছে তার জন্য প্রতিবিধানের কোনও প্রশ্ন আসে না। প্রত্যেকটা লোক তাঁর জীবনের গন্তব্যস্থল নিজেই তৈরি করে নেয়। যদি আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাগ্যের কঠোর হাতে শাস্তি পেতে থাকে, তাহলে আমি মনে করি এরজন্য শুধু আমি পুরোপুরি দায়ী নই। তারা

যতটা আমার ঠিক ততটাই তোমার। তোমাকে আমি অনাথ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছি এই ভাবনা যেন তোমাকে অসাড় করে না দেয়। তোমার তো নিজস্ব নাম আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে, অনেক সম্পত্তি আছে। কেন আমি অতীতে যে সমস্ত কাজ করেছি এবং বর্তমানেও করে চলেছি তা বোধগম্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমার সমস্ত কাজকর্ম যদি আমার অদ্ভুত ব্যাখ্যার আলোতে কোনও দর্পণের সামনে তুলে ধরা যায়, তাহলে সবকিছু যুক্তিসম্মত মনে হয়। আপাতত আমি যতদূর জানি যে, এতে আমাদের বেদনাভরা অবস্থার কোনও উপশম ঘটবে না। কিন্তু এই প্রবাহকে পরিবর্তন করার মতো সাধ্যও আমার নেই।

আর একটা কথা বলতে চাই। কোনও সমস্যাকে ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখলে তার সমাধান হয় না। যদি কোনও বিবাহ অসফল ও কষ্টকর হয়, তা থেকে মুক্ত হওয়ার অবশ্যই রাস্তা আছে। যখন একজন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তখন অন্যজনের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আপনা থেকেই এসে যায়। কোনও নারীই তার স্বামীর ক্রীতদাস নয়, শুধুমাত্র জীবনসঙ্গী এবং সমান সমান অধিকার থাকার সূত্রে জীবনের পথ বেছে নেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকা দরকার। যেহেতু নতুন হিন্দু বিলের কোড অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ আইনসম্মত, তুমি কেন কোনও একটা ভিত্তি খুঁজে আইনত ছাড়াছাড়ি বা বিবাহ বিচ্ছেদ করছ না? আমার মনে হয় সেটা করলে আমাদের দু'জনেরই নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হবে। এটা কখনও মনে করো না যে, আমি তোমাকে এমন কিছু করতে উপদেশ দিচ্ছি যা আমি নিজে কখনই করব না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তুমি যাই করো না কেন আমার তাতে কোনও মতামত নেই।

আপাতত ভারতে ফিরে আসার মতো কোনও কারণ নেই। সব সময় খুশি থাকার চেষ্টা কর। তোমার খুব ভালো হোক এটাই আমার আন্তরিক কামনা। ইউ জী

ইউ জী আর কোনওদিন তাঁর কাছ থেকে কিছু শোনেননি।

আমি জানি না সাত সংখ্যাটির এবং তার গুণনীয়কের কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে কিনা। কিন্তু ইউ জী-র বিবাহ জীবন একুশ বছর টিকে ছিল। যদিও এই সমস্ত বছর তাঁরা একসঙ্গে বসবাস করেননি। ইউ জী-র স্ত্রী ১৯৬৩ সালে মারা যান। সেই সময় ইউ জী কোথায় ছিলেন তা কেউ জানত না। তাঁর এক মাসতুতো ভাই যিনি লন্ডনে বসবাস করতেন, তিনি ইউ জী-র লন্ডন বাসিন্দা এক বন্ধুকে চিঠি লিখে ইউ জী-র স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ জানান। সেই বন্ধুটিও জানতেন না ইউ জী কোথায় আছেন। ছ'মাস পরে হঠাৎ একদিন ইউ জী সেই বন্ধুর বাড়িতে আসেন এবং তখন সেই চিঠি ইউ জী-র হাতে আসে। চিঠি পড়তে পড়তে ইউ জী-র মধ্যে কোনওরকম প্রতিক্রিয়া বন্ধু লক্ষ্য করলেন না। বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'চিঠিতে কি আছে?' ইউ জী উত্তরে জানালেন, 'এতে লেখা আছে যে ছ'মাস আগে আমার স্ত্রী মারা গেছে।' বন্ধুটিকে শুধুমাত্র এই কটি কথাই সেদিন বলেছিলেন। কিন্তু ইউ জী ছেলেমেয়েদের তাঁর সমবেদনা জানিয়ে চিঠি দিলেন। ছোট মেয়ে চিঠির উত্তরে ছাড়াছাড়ির পর মায়ের শেষ বছরের দুঃখময় জীবনের কথা বিস্তারিতভাবে লিখে জানান।

ইউ জী-র স্ত্রী ধীরে ধীরে নিদারুণ বিষণ্নতা ও গভীর নৈরাশ্যজনক অবস্থার মধ্যে চলে যাওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। ইলেকট্রিক শক দেওয়ার চিকিৎসা পর্যন্ত করাতে হয়। এই চিকিৎসার কয়েক সপ্তাহ পর হাসপাতাল থেকে তিনি বাড়ি চলে আসেন। কয়েকদিন পরেই এক দুর্ঘটনায় তিনি পা পিছলে পড়ে যান। ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ইউ জী তখন ভারতে ফিরলেন না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ১৯৬৭ সালে প্রায় ১৪ বছর পর তিনি যখন ভারতে ফিরলেন ততদিনে তাঁর মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে এবং তাদেরও ছেলেমেয়ে হয়েছে।

যখনই আমার ইউ জী-র ছেলেমেয়েদের বিষয়ে কিছু মনে হয় তখনই বসন্তকুমারের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। ইউ জী-র সঙ্গে আমি যত সময় কাটিয়েছি, তার মধ্যে ১৯৮২ সালের গ্রীষ্মকালে বোম্বাই শহরে কাটানো দিনগুলো ছিল সবচেয়ে গভীর আবেগপূর্ণ সময়, আর বসন্তের নামটা আমার সেই সময়ের স্মৃতিগুলোকে জীবন্ত করে তোলে। বসন্ত ততদিনে ভারতের এক নামকরা লিপিকার (কপি রাইটার) হয়ে গেছে। তার মুখটা এখনও আমার মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করে

ভাসছে। সুদর্শন বসন্ত ছিল মিষ্টি, শান্ত ও কোমল স্বভাবের ছেলে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার সামনেই বসন্ত ইউ জী–কে জানালো যে তার পিঠে খুব ব্যথা।

সেই সময় আমাদের দু'জনের কোনও ধারণাই ছিল না যে কিছুদিনের মধ্যেই সেই আকর্ষণীয় যুবক সারকোমায় (দ্রুতগতিতে বেড়ে ওঠা ক্যানসার) মারা যাবে। তার বয়স তখন মাত্র বত্রিশ বছর। বাঙ্গালোরে ইউ জী টেলিগ্রামের মারফত খবর পেলেন যে বসন্ত ক্যানসারে আক্রান্ত। তাঁর এই খবরের প্রতিক্রিয়া দেখে কেউ বুঝতে পারল না যে তিনিই বসন্তের বাবা। ইউ জী অস্বাভাবিক রকমের 'অমনযোগী' রয়ে গেলেন। বাঙ্গালোরে আমাদের বন্ধুরা অনেক অনুনয়–বিনয় করে রাজি করালেন ইউ জী–কে, বসন্তের জীবনে আর যে কটা দিন আছে সে কটা দিন তিনি বম্বেতে ছেলের কাছেই থেকে যাবেন।

সন্ধ্যায় একটু দেরি করে ইউ জী–র ফ্লাইট বম্বেতে এসে পৌঁছাল। আমি বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলাম তাঁকে নিয়ে সোজা হাসপাতালে যাওয়ার জন্য, যেখানে বসন্তকে ভর্তি করা হয়েছে। আমায় দেখার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সদ্যোজাত ছেলে কেমন আছে?' আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের কোনও চিহ্ন আছে কিনা তা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করলাম। ইউ জী–কে শুধু স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এটা কোনও ভনিতা করা স্বাভাবিকতা নয়। সিটি হাসপাতালের দিকে পথ ধরে গাড়ি চলতে থাকল। ইউ জী শান্ত কণ্ঠে অস্বস্তিকর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠলেন, 'মৃত্যুর কাল গণনা তাহলে শুরু হয়ে গেছে। একটাই শুধু আশা যে ক্যানসার যেন মাথায় ছড়িয়ে না পড়ে।'

জীবনের শেষ কটা দিন বসন্ত রোজ ইউ জী–র সঙ্গ লাভ করেছে। ইউ জী ছিলেন বন্ধু, সেবক ও শান্তিদাতার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। বসন্তের আরোগ্যলাভের সম্ভাবনার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ কতই না গভীর ছিল। সেই সময় আমাদের জীবনে আরও এক সমস্যা দেখা দিল, ভ্যালেন্টাইন হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যক্ষা রোগের আক্রমণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হল। আমার ও ইউ জী–র শহরের দুই প্রান্তের দুই হাসপাতালে হাজিরা দেওয়া শুরু হয়ে গেল।

''কি করে একথা মেনে নেওয়া যায় যে ইউ জী–র নির্বাণ লাভ হয়েছে? তিনি সাধারণ একজন পিতার মতনই ব্যবহার করছেন। বিশেষ করে তিনি যেভাবে

হাসপাতালের চারদিকে সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'' সে ইউ জী যা-ই করতেন না কেন, লোকে তাঁর সমালোচনা করত। তাঁর টেলিগ্রাম পাওয়ার পর শান্ত ও সহজ মনোভাব দেখে বাঙ্গালোরে আমাদের বন্ধুরা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

তাঁরা সবাই চিৎকার করে বলেছিলেন, 'তিনি একজন নির্মম হৃদয়হীন ব্যক্তি। তাঁর এখন মৃত্যুপথগামী পুত্রের সঙ্গে সময় কাটানো উচিত। এ কেমন ধরনের জীবন্মুক্ত লোক?' আর যখন তিনি সমস্ত মনোযোগ ও ভালোবাসা পুত্রের প্রতি স্নেহভরে উজাড় করে দিয়েছিলেন তখনই সবাই বলে উঠেছিলেন, 'তিনি সত্যি একজন অত্যন্ত সাধারণ লোক।' এই সমস্ত আলোচনা ও সমালোচনা ইউ জী-কে স্পর্শ করতে পারল না।

'সে মারা গেছে' – ইউ জী টেলিফোন করে বললেন, যেন একটা সাধারণ ঘটনা জানাচ্ছেন। তিনি আমাকে হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন শবদাহের বন্দোবস্ত করার জন্য। আমরা সবাই জানতাম যে বসন্তের জীবনকাল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আমাদের এক বন্ধু আশা করেছিল যে ইউ জী এই অবস্থায় অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটাবেন। বসন্তের মৃত্যুর খবর পেয়ে যখন আমরা হাসপাতালে ঢুকছিলাম, এমনকী তখনও আমার এক বন্ধুর ধারণা ছিল যে ইউ জী তাঁর মৃত ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলবেন। কিন্তু হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটেছিল তা আমাদের সবাইকে আশ্চর্য করে দিল। ইউ জী যথাশীঘ্র সম্ভব মৃতদেহকে হাসপাতাল থেকে এনে কোনওরকম অনুষ্ঠান ছাড়াই দাহ করতে চাইলেন। হাসপাতাল কিছুতেই মৃতদেহ দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তখন ভোর ছ'টা। আমাদের সবার কাছে যত টাকাপয়সা ছিল তা হাসপাতালের বিলের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

ইউ জী হেসে উঠলেন এবং বললেন, 'মৃত্যুকে ঘিরে যে গাম্ভীর্য ও আবেগপ্রবণতার সৃষ্টি হয়, সেসব আপনাদের ভুলে যাওয়া উচিত। শেষপর্যন্ত সবকিছু টাকাতেই এসে দাঁড়ায়।' আমরা রীতিমতো চমকে উঠলাম। এরকম একটা সময়ে নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে যে শালীনতাপূর্ণ ব্যবহার আশা করা যায়, ইউ জী-র মধ্যে তার ঘাটতি ছিল। যে ধরনের অলৌকিকতা সবাই আশা করেছিলেন, সেসব তো কিছুই হয়নি, উপরন্তু আমরা সবাই ইউ জী-র ব্যবহারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর মধ্যে অভিমানের কোনওরকম চিহ্ন ছিল না। তিনি আইনসম্মত

যে সমস্ত কাজের প্রয়োজনীয়তা ছিল, বিশেষ করে শবদাহের ব্যাপারে, সেসব কিছু ধৈর্য ধরে করলেন। তারপর অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সেখান থেকে চলে গেলেন।

চোখের সামনে শবদেহ ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হয়ে গেল, মনের মধ্যে ইউ জী–র সেই কথাটা ধ্বনিত হতে লাগল। ‘‘যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রযুক্তি এই তরুণকে সাহায্য করতে না পারে যে ক্যানসারের কবলে পড়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে, তাহলে পৃথিবীর আর কোনও শক্তির পক্ষেই তাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। যদি আপনাদের মধ্যে কারও মনে এরকম ভাবনা থাকে যে অবতার সত্য সাঁইবাবা, যিনি বর্তমানে এই শহরে আছেন, বসন্তকে ভালো করে দেবেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর সাহায্য গ্রহণ করুন। কিন্তু আমি বলছি, তিনি কিছুই করতে পারবেন না।’’ বসন্তের বন্ধুরা সাঁইবাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ঠিক একদিন পরেই বসন্তের মৃত্যু হয়।

বসন্তের মৃত্যুতে আমি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এই ঘটনার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে আমি একটা চলচ্চিত্র নির্মাণ করি। ছবিটির নাম ছিল ‘সারাংশ।’ ১৯৮৫ সালে সেই ছবি মস্কোতে ‘ক্রিটিক্স অ্যাওয়ার্ড’ লাভ করে।

তখন একদিন বোম্বাই শহরতলীতে আইনজীবীর অফিসে বসন্তের সম্পত্তির বিষয়ে কাজকর্ম সারতে যাওয়ার পথে ইউ জী–কে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন করেছিলাম, ‘আপনার মনে কি কোনওরকম অনুশোচনা হয় না বা দুঃখ জাগে না, যা আপনি আপনার স্ত্রী ও সন্তানাদির সঙ্গে করেছেন সেজন্য?’ তিনি সরাসরি উত্তর দেন, ‘না’। ‘আচ্ছা ইউ জী, আমাকে বলুন তো, যদি আপনাকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হয় প্রথম থেকে জীবন শুরু করতে, তাহলে আপনি কি করবেন?’ উত্তরে ইউ জী সেদিন বলেছিলেন, ‘‘যদি আমার আবার জীবন শুরু করতে হয়, তাহলে কোনও কিছুরই পরিবর্তন হবে না। অপরের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা জীবনে কোনওরকমের পরিবর্তন আনতে কদাচিৎ সাহায্য করে না। যদি তা না–ই হত, তাহলে আমাদের সবার জীবন এতদিনে এক মধুর সংগীতে রূপান্তরিত হয়ে যেত।’’

ঃঃ – ঃঃ

শেষ সময়

"জন্ম এবং মৃত্যু এক যুগপৎ প্রক্রিয়া। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝামাঝি কোনও অন্তর নেই।"

– ইউ জী

আমাদের লন্ডনে থাকার সময় শেষ হয়ে গেল। সানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্যে যেই প্লেনটা আকাশে উঠে এল সঙ্গে সঙ্গে আমিও গত সপ্তাহের কয়েকটা ঘটনার স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলাম। একজন বলেছিলেন, 'যে কোনও গল্প দু'বার বললেই কল্পকাহিনি হয়ে যায়।' ইউ জী সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সহমত ছিলেন এবং আর একটু যোগ করে দিয়ে বললেন, 'সমস্ত আত্মচরিত কথাই মিথ্যা এবং অন্যের লেখা জীবনকথা দ্বিগুণ মিথ্যা।' মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ইউ জী–র কথা শুনলে আমি তাঁর জীবন চরিতের উপর যত কাজ করেছি সবটাই বৃথা হয়ে যাবে।

আমরা আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। হঠাৎ আমাদের প্লেনটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। 'অনুগ্রহ করে আপনারা সিট বেল্ট বেঁধে নিন' – এয়ার হোস্টেজ ঘোষণা করলেন। আমরা খুবই অশান্ত আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছি ... প্লেনের ঝাঁকুনিতে সবার মধ্যে একটা ভয়ের প্রবাহ বয়ে গেল। সেই প্রবাহ আমাকে জাগিয়ে দিল বা আমি যে জেগে আছি সে ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলাম। ইউ জী এসব কিছুর মধ্যে নির্বিকারে পুরো সময়টা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেন। লন্ডন থেকে সানফ্রান্সিসকো একটানা এগারো ঘণ্টার ফ্লাইট। মহাসাগরের বিশাল জলরাশির উপর দিয়ে উড়ে চলেছি – এই ভাবনাই আমার মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। ভীতিজনক ভাবনার হাত থেকে মুক্তির তাগিদে আমি ইউ জী–র লন্ডন ছাড়ার পর কি হল, সেই চিন্তার সূত্র ধরে ডুবে গেলাম।

তাঁর কাছে তখনও ভারতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্লেনের টিকিট কাটা ছিল। প্যারিসে তিনি টিকিট ফেরত দিয়ে দিলেন, যেহেতু ডলার দিয়ে টিকিট কেনা হয়েছিল, সেহেতু ৩৫০ ডলার ফেরত পেলেন। নব্বই দিন ইউ জী প্যারিসের এক হোটেলে ছিলেন, ঠিক লন্ডনের মতনই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সময় কাটাতে লাগলেন। একটাই শুধু পার্থক্য এবং তা হল এখানে তাঁর পকেটে কিছু টাকা ছিল।

প্যারিসে থাকার সময় চার্লস ডি গলের এক মন্তব্য তিনি দেখতে পেলেন, 'যে জাতি ৩৬০ রকম পনির (চিজ) তৈরি করতে পারে সে জাতিকে শাসন করা কঠিন ব্যাপার।' সেই নব্বই দিন প্যারিসে থাকাকালীন ইউ জী রোজ নতুন নতুন ধরনের পনির খেয়েছেন (এখনও ইউ জী–র অন্যতম প্রিয় খাদ্য হল পনির)।

যখনই ইউ জী লক্ষ্য করলেন যে, প্যারিসে তাঁর জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে পুরানো ধাঁচের মধ্যে চলে যাচ্ছে তখনই প্যারিস ত্যাগ করলেন। কিন্তু ভারতে ফেরার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে অদ্ভুত একটা দ্বিধা ছিল, বিশেষ করে যখনই মনে হত ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়স্বজনদের সম্মুখীন হওয়ার কথা। সেই সাক্ষাৎকারের কাল্পনিক চিত্র তাঁর মধ্যে নিদারুণ ভীতির সঞ্চার করত। ১৫০ ফ্রাঁ পকেটে নিয়ে তিনি জেনিভা (সুইজারল্যান্ডের এক বড় শহর) রওয়ানা দিলেন। জেনিভায় হোটেলে থাকাকালীন তাঁর পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ার পরও হোটেলে থাকতে লাগলেন। দু' সপ্তাহ পরে যখন হোটেল কর্তৃপক্ষ বিল মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চাপের সৃষ্টি করল, ইউ জী–র তখন পকেট গড়ের মাঠ। আকাশের দিকে দু' হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিমায় ক্ষমা চাইলেন। ভারতীয় কনস্যুলেটে যাওয়া ছাড়া সেই অবস্থায় আর কোনও গত্যন্তর রইল না।

''আমাকে ভারতে পাঠিয়ে দিন। আমার কাছে আর কিছু নেই। আমি শেষ হয়ে গেছি'' – ইউ জী ভারতীয় কনস্যুলেটের কর্মচারীকে বললেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ফেরার ব্যাপারে যে প্রতিরোধ তাঁর মধ্যে ছিল, সেটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তাঁর পেপার কাটিং সংগ্রহের ছোট বইটা কনস্যুলেটের সহাধ্যক্ষকে দেখালেন। 'ভারতবর্ষ যত প্রতিভাবান বক্তা পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ...' নরম্যান কাজিন এবং সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য দেখে সহাধ্যক্ষ খুবই অভিভূত হয়ে গেলেন। কিন্তু উত্তরে বললেন, 'এরকম একজন লোককে আমরা সরকারের টাকায় ভারতে ফেরত পাঠাতে পারি না। আপনি ভারত

থেকে টাকা চেয়ে পাঠান এবং ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে এসে থাকুন।'

এই সেই ভারতীয় কনস্যুলেট যেখানে ইউ জী-র সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন ডি কারভীনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। যখন ইউ জী সহাধ্যক্ষর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, তখন ভ্যালেন্টাইন গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করছিলেন। ভ্যালেন্টাইন ভারতীয় কনস্যুলেটে অনুবাদকের কাজ করতেন। হয়তো এসব কপালেরই লিখন, ঠিক সেদিনই রিসেপসনিস্ট অনুপস্থিত থাকায় ভ্যালেন্টাইন লোকজনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সেখানে নিযুক্ত ছিলেন। ইউ জী এবং ভ্যালেন্টাইন কিছুক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে গল্প করলেন, দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ভ্যালেন্টাইন বললেন, 'আপনি যদি চান তাহলে আমি আপনার সুইজারল্যান্ডে থাকার বন্দোবস্ত করতে পারি। যদি ভারতে যেতে না চান, তাহলে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।' একমাস কনস্যুলেটে থাকার পর সহাধ্যক্ষ তাঁকে অন্য কোনও ব্যবস্থা করতে বললেন। কিন্তু ভ্যালেন্টাইনের সাহায্যে আরও কিছুদিন সেভাবেই চলল। তারপর ভ্যালেন্টাইন নিজে ইউ জী-র জন্য সুইজারল্যান্ডে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দিলেন। কিছুদিন পরে নিজেও চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন। ভ্যালেন্টাইনকে ধনী বলা চলে না। কিন্তু তাঁর যা টাকাপয়সা ছিল, তার সঙ্গে পেনশন যোগ করে দু'জনের জীবন চালাবার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মাদাম ভ্যালেন্টাইন ডি কারভীন নিজ গুণেই এক অসাধারণ নারী ছিলেন। ১৯০১ সালের আগস্ট মাসে সুইজারল্যান্ডে তাঁর জন্ম হয়। ভ্যালেন্টাইনের পিতা ছিলেন এক সুপ্রসিদ্ধ ব্রেন সার্জেন। যাঁর লেখা বই কুড়িটি ভাষায় অনূদিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তকে তাঁর মৌলিক কাজের উল্লেখ দেখা যায়। ভ্যালেন্টাইনের পিতার নামানুসারে একে 'ডি কারভীন সিনড্রোম' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর ঠাকুরদাদা ছিলেন এক বিশিষ্ট ধর্মযাজক। ভ্যালেন্টাইন আঠারো বছর বয়সে সুইজারল্যান্ড ছেড়ে প্যারিসে চলে যান স্বনির্ভর জীবন যাপন করার জন্য। তিনি কোনওরকম ধর্মমতে বিশ্বাস করতেন না এবং বহু বিষয়ে তাঁর মতামত সমসাময়িক লোকজনদের কাছে খুবই বিদ্রোহী বলে বিবেচিত হত। তাঁদের দীর্ঘ বন্ধুত্বের সময়ে ইউ জী কোনওদিন একবারের জন্যও ভ্যালেন্টাইনকে চোখের জল ফেলতে দেখেননি।

ভ্যালেন্টাইন একটি শিল্পী ও লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফটোগ্রাফি এবং

আধুনিক কলাবিদ্যায় তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তাছাড়া ফরাসি পরীক্ষামূলক নাটকগোষ্ঠীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কবি দার্শনিক এন্টনীন আরটাউড, যিনি একজন নৈরাজ্যবাদী বলে প্রখ্যাত, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। আরটাউডের লেখা এক নাটকে তিনি ভালিনের সঙ্গে অভিনয় করেন। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের কস্টিউমের নকশাও তিনি করতেন। তিনি ছিলেন প্রশিক্ষিত নার্স, যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীকালে রেডক্রসের হয়ে সুইজারল্যান্ডে কাজ করেছেন।

ভ্যালেন্টাইন খোলাখুলি তাঁর ছেলেবন্ধুর সঙ্গে বসবাস করতেন। যেটা সেই সময়ে সামাজিক দৃষ্টিতে নীতিবিরুদ্ধ কাজ ছিল। তিনি এবং তাঁর বন্ধু ছিলেন প্রথম দু'জন যাঁরা মোটর সাইকেলে করে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম মহিলা যিনি প্যারিসে প্যান্ট জামা পরিহিত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

তিনি যাযাবরদের উপর শিক্ষামূলক ছবি তৈরি করেন এবং ফরাসিতে প্রথম মহিলা প্রোডিউসার হিসাবে গণ্য হন। তাঁর প্রোডাকশন কোম্পানির নাম ছিল 'ডি কারভীন ফিল্মস'। তিনি পিতার চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর গবেষণা নিয়েও একটা শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

স্পেনে ফ্রাঙ্কো এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তাঁর সামিল হওয়ার প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয়। পঞ্চাশের দশকে তিনি গাড়ি চালিয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন এবং সেই যাত্রাই ছিল তাঁর প্রথম ভারত যাত্রা, যা তিনি পরবর্তীকালে প্রায় সারাজীবন চালিয়ে গেছেন।

ভারতীয় কনস্যুলেটে দৈবাৎ সাক্ষাৎকারের পর ইউ জী ও ভ্যালেন্টাইনের জীবন মিলেমিশে এক হয়ে যায়। ভ্যালেন্টাইনের জীবন সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত তাঁরা দু'জন 'উদ্দেশ্যহীন সহযাত্রী' হিসাবে জীবন কাটিয়ে দেন।

পঁচাশি বছর বয়সে ভ্যালেন্টাইন অ্যালজাইমার রোগে (যাতে স্মৃতিশক্তি ক্রমাগত লোপ পায়) আক্রান্ত হন। তিনি অনেক মন্থর হয়ে পড়েন। স্মৃতিশক্তি ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে। কিন্তু তাঁর চোখের সেই দীপ্তি এবং উজ্জ্বলতা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বজায় থাকে। তাঁর জীবনের শেষ দিকে বাঙ্গালোরে দক্ষিণ ভারতীয় এক পরিবারের সঙ্গে তিনি থাকতেন যাঁদের সঙ্গে ১৯৬৯ সালে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

২০ জানুয়ারি, ১৯৯১ সাল। রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিক বাহিনির ক্রমাগত বোমাবর্ষণে

ইরাক যখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, দূরভাষের ডাক জানিয়ে দিল ভ্যালেন্টাইনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগের কথা। পরম শান্তিতে সেই সন্ধ্যায় তিনি চিরদিনের জন্য চলে গেলেন ...। তাঁর বয়স হয়েছিল নব্বই। জ্যোতিষশাস্ত্রের ভবিষ্যৎবাণী, 'ভ্যালেন্টাইন একশো বছর বাঁচবেন' – ব্যর্থ করেই তিনি ইহলোক তাগ করলেন।

ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুকালে ইউ জী ক্যালিফোর্নিয়াতে ছিলেন। মৃত্যুর সংবাদ যখন জানানো হল, তখন তিনি যে বন্ধুরা ভ্যালেন্টাইনের দেখাশুনা করতেন তাঁদের নির্দেশ দিলেন, শেষকৃত্য পালন করতে অত্যন্ত শান্ত ও নিরভিমানের সঙ্গে। তিনি বিদেশিনী। তাঁর শবদাহ করতে গেলে পুলিশের অনুমতি দরকার। সুইস কনস্যুলেটে তাঁর মৃত্যুর খবর জানাতে হবে। শবদাহ কোনও রকম অনুষ্ঠান ছাড়াই করা দরকার যেহেতু তাঁর কোনও ধর্মেই বিশ্বাস ছিল না। 'দেহভস্মের কি ব্যবস্থা করা হবে?' ইউ জী জিজ্ঞাসা করলেন। 'কাবেরী নদীর পবিত্র জলে ভাসিয়ে দেব।' বন্ধুরা উত্তর দিলেন।

ভ্যালেন্টাইন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির ভ্রমণ ফান্ড তৈরি করেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার লোকজনের থেকে তিনি মাঝে মাঝেই এই প্রশ্ন শুনতে পেতেন, কেন তিনি তাঁর সমস্ত কিছু উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র ইউ জী-র সঙ্গ লাভের জন্য। কিন্তু তিনি কোনওদিন এই প্রশ্নের উত্তর দেননি।

তাঁর ডায়েরির এক ছোট্ট অনুচ্ছেদে ফরাসি ভাষায় যা লেখা ছিল, তাই হয়তো সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, ''কোথায় আমি তাঁর মতন আর একজন মানুষ খুঁজে পাব। অবশেষে আমি এমন একজনের দেখা পেলাম যাঁর মতো মানুষের দেখা পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ।''

১৯৫৩ সালে ইউ জী যখন প্রথম সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতের সানেন উপত্যকায় ভ্রমণরত, তাঁর মধ্যে কি যেন একটা বলে উঠেছিল, 'ট্রেন থেকে নেমে পড় এবং কিছু সময় এখানে থেকে যাও।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাই করেছিলেন। সেখানে থাকার সময় তিনি নিজেকে বলেছিলেন, 'এই সেই জায়গা যেখানে আমি আমার বাদবাকি জীবন কাটাতে চাই।' তখন তাঁর কাছে ছিল প্রচুর অর্থ, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কিছুতেই তার সঙ্গে একমত হলেন না। সেখানকার আবহাওয়া ইউ জী-র স্ত্রীর ভয়ানক অপছন্দ হয়েছিল। তখন থেকেই সানেন উপত্যকায় থাকার পরিকল্পনা ইউ জী-র কাছে অপূর্ণ স্বপ্ন হয়ে ছিল। আর এখন হঠাৎ করে সেই স্বপ্ন সফল

হয়ে গেল। ভ্যালেন্টাইন সানেন উপত্যকায় ইউ জী–র বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে ফেললেন।

তারপর একদিন জে কৃষ্ণমূর্তিও সানেন উপত্যকায় এসে হাজির হলেন। প্রতি গ্রীষ্মে জে কৃষ্ণমূর্তি সেখানে বক্তৃতা ও সেমিনারের আয়োজন করতে লাগলেন। ইউ জী–র সে সময় জে কৃষ্ণমূর্তির ব্যাপারে কোনওরকম আগ্রহ ছিল না। তাঁর উনপঞ্চাশ বছর বয়সের আগে তিনি কোনওদিন একবারের জন্যও ভ্যালেন্টাইনকে তাঁর সত্য অনুসন্ধানের কথা বলেননি। যদিও তাঁর মধ্যে অনুসন্ধানের কোনওরকম রেশ পর্যন্ত ছিল না এবং কোনও কিছু পাওয়ার কোনও অভিলাষও ছিল না। তবুও তিনি অনুভব করলেন সেই আশ্চর্য কিছু ঘটছে তাঁর মধ্যে।

সেই সময় তাঁর মধ্যে বিভিন্ন রকমের প্রক্রিয়া চলছিল (যাকে তিনি ইনকিউবেশন অর্থাৎ রোগের প্রাক্কালে যা ঘটে সেই কাল বলে অভিহিত করেন), সমানে মাথা ব্যথা এবং মস্তিষ্কে দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করতেন। রোজ গাদা গাদা অ্যাসপিরিন খেতেন প্রচণ্ড মাথা ব্যথার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, কিন্তু তাতে কোনও ফল হত না। একদিন ভ্যালেন্টাইন তাঁকে বললেন, ‘‘আপনার কি কোনও খেয়াল আছে অ্যাসপিরিন আর কফির পেছনে কি রকম টাকা খরচ করছেন? রোজ কম করে পনেরো কাপ কফি খাচ্ছেন, জানেন এতে কত খরচ হয়, তিন থেকে চারশো ফ্রাঙ্ক মাসে কফিতে, এসব কি হচ্ছে?’ ইউ জী কাউকে বোঝাতে পারলেন না কি ধরনের মাথা ব্যথা তাঁকে পীড়া দিচ্ছে।

> সমস্ত রকমের অদ্ভুত ব্যাপার আমার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। আমার মনে আছে, যখনই আমি আমার শরীরে এভাবে (এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের এবং পায়ের উপর ঘষে দেখালেন) ঘষা দিতাম তখনই স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হত, তারপর ফসফরাস যেমন আভার সৃষ্টি করে, আমার শরীর সেরকমভাবে জ্বলজ্বল করতে থাকত। ভ্যালেন্টাইন তাঁর বেডরুম ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন, তিনি ভাবতেন বোধহয় মাঝরাতে কোনও গাড়ি আলো জ্বালিয়ে এদিক দিয়ে যাচ্ছে। যখনই আমি বিছানায় পাশ ফিরতাম স্ফুলিঙ্গের মতন আলোর ঝলক দেখা দিত। সে এক রীতিমতো কৌতুকজনক ব্যাপার। এসব স্থির তড়িৎশক্তির খেলা। তাই আমি শরীরকে

> তড়িৎ-চৌম্বকীয় ক্ষেত্র (ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড) বলে অভিহিত করি। প্রথমে ভাবতাম নাইলন কাপড়ে স্থির তড়িৎ খুব সহজেই এবং প্রচণ্ড বেশি উৎপাদিত হয়, তাই এসব হচ্ছে। তখন নাইলনের পোশাক পরা বন্ধ করে দিলাম। আমি আমার মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত আগাগোড়া নাস্তিক। আমি কখনও কোনও কিছুতে বিশ্বাস করিনি। এমনকী আমার চোখের সামনেও যদি কোনও অলৌকিক ঘটনা ঘটে যেত, আমি সেসব মানতে চাইতাম না, এমনই ছিল মানসিক গঠন। আমি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে, এসব জিনিস আমার নিজের মধ্যেই দেখা দেবে।

যেহেতু 'আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত চিন্তা' সমূহ তাঁর মধ্য থেকে মুছে গিয়েছিল, তাই ইউ জী তাঁর মধ্যে যা হচ্ছিল তার সঙ্গে মোক্ষ বা নির্বাণ জাতীয় কোনও কিছু ঘটেছে বলে মনে করলেন না। কিন্তু মনের পশ্চাৎপটে, 'নির্বাণ বা মোক্ষ লাভের অবস্থাটা কি?' সেই প্রশ্নটা সবসময় জীবন্ত ছিল।

১৯৬৩ সালে গেস্টাডে জে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে দেখা না করে রাস্তায় চলাফেরা করা মুশকিল হয়ে উঠল। ইউ জী সবসময় তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। কারণ তিনি ততদিনে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আর প্রয়োজন নেই। একদিন তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন, তখন হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ইউ জী সম্পূর্ণ ভিজে গেছেন। ঠিক তখন জোরালো ব্রেক খেয়ে রাস্তাকে আঁকড়ে ধরার জন্য তীব্র আর্তনাদ করে কৃষ্ণমূর্তির মার্সেডিজ বেন্‌জ ইউ জী-র পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজা খুলে গেল, ভেতর থেকে কৃষ্ণমূর্তি চীৎকার করে ইউ জী-কে বললেন, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।' 'ধন্যবাদ' ইউ জী উত্তরে জানালেন, 'কিন্তু আমার কোনও জীবনবিমা নেই এবং আপনার গাড়ি চালানোর উপর আমার কোনও ভরসা নেই।' 'তাহলে নিজের পোশাক নিজেই সামলান' বললেন কৃষ্ণমূর্তি এবং গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন।

১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ইউ জী ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে প্যারিসে ছিলেন। কয়েকজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, ''আপনার পুরানো বন্ধু কৃষ্ণমূর্তি এখানে বক্তৃতা দেবেন, একবার গিয়ে শুনুন কি বলছেন আজকাল।'' ভ্যালেন্টাইন কোনওদিন কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতা শোনেননি, তাই ঠিক করলেন যে তাঁরা বক্তৃতা শুনতে যাবেন।

তাঁরা যখন সেখানে পৌঁছালেন, দেখলেন যে প্রবেশ করার জন্য সবাইকে দুই ফ্রাঙ্কের টিকিট কাটতে হবে। ইউ জী এরজন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বললেন, 'এসব ছেড়ে চলুন বোকার মতন কিছু করা যাক। ক্যাসিনো ডি প্যারিসে যাওয়া যাক।' যদিও ক্যাসিনো ডি প্যারিসে টিকিটের দাম কুড়ি ফ্রাঙ্ক তবুও সেটাই করবেন বলে ঠিক করলেন। সেখানে শো দেখতে দেখতে ইউ জী-র অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হল, ''আমি বুঝতে পারছিলাম না যে নর্তকীরা মঞ্চে নাচ করছিল না আমিই নাচ করছিলাম। এক অদ্ভুত আন্দোলন আমার শরীরের মধ্যে অনুভূত হচ্ছিল। যেন কোনও বিভাজন নেই। যেন আমার মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে নর্তকীদের দেখবে।'' এই অভিজ্ঞতা – যতক্ষণ থিয়েটারে নাচ হচ্ছিল ততক্ষণ ছিল – ইউ জী-কে বিহ্বল করে দিল।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ইউ জী তাঁর জীবনে শেষবারের মতন স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে তিনি দেখলেন যে, গোখরা সাপের ছোবলে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। মৃতদেহকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বাঁশের কাঠামোয় করে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর শরীরকে চিতার উপর রাখা হল। সেই আগুনের হলকা তাঁর শরীরে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। তিনি দেখলেন যে তাঁর ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কেটের তাপমাত্রা খুব বেশি হয়ে গিয়েছিল। এই স্বপ্নকে তাঁর পরবর্তীকালে যে মৃত্যু ঘটেছিল তার ভূমিকা স্বরূপ ঘটনা হিসাবে ধরা হয়।

যদিও ইউ জী আর স্বপ্ন দেখেন না, কিন্তু তাঁর মধ্যে মাঝে মাঝেই সেই 'মৃত্যুর অভিজ্ঞতা' ঘটে। অবশ্য একে 'মৃত্যুর অভিজ্ঞতা' বলে অভিহিত করলে একটা ভুল ধারণার জন্ম হয়, কারণ মৃত্যুকে কারোর পক্ষেই অভিজ্ঞতার আওতায় আনা সম্ভব নয় এবং তাঁর পক্ষেও নয়। ইউ জী বলেন, ''এটা কোনও কবিত্বে ভরা বা প্রেম বিজড়িত জিনিস যেমন, 'সমস্ত অতীতের মৃত্যু' ঘটল বলে কিছু নয়। জন্ম এবং মৃত্যু এক যুগপৎ প্রক্রিয়া। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে কোনও অন্তর নেই।''

এই মৃত্যুর প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে ইউ জী মাঝে মাঝেই যান, তা বিভিন্ন রকমের জায়গায় এবং যে কোনও সময়ে ঘটে যেতে পারে। একবার রোমে বন্ধুদের সঙ্গে জেমস বন্ডের সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফরাসি দেশের এক প্রখ্যাত ডাক্তার নাম লেবোয়ার। যাঁকে স্বাভাবিক সন্তান প্রসবের ব্যাপারে কর্তৃত্ব বলে মানা হয়। এক দৃশ্যে যখন গুলিগোলা চলছিল, লেবোয়ার দেখলেন

হঠাৎ ইউ জী মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রীতিমতো ঘাবড়ে গেলেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পরে অবশ্য ইউ জী ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন। লেবোয়ার বললেন, ''ইউ জী, আপনি যেভাবে পড়ে গেলেন, দেখে মনে হল গুলির আঘাতে যখন কেউ পড়ে যায় ঠিক সেরকম।'' লেবোয়ার আরও বললেন যে, ইউ জী যখন ধীরে ধীরে নড়াচড়া শুরু করলেন, তখন আমার মনে পড়ছিল নবজাতক শিশুদের হাত–পা নাড়ানোর কথা। ইউ জী তখন বললেন, ''এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচলনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল যোগাসনের। যার দ্বারা শরীর স্বাভাবিক গতি প্রকৃতিতে ফিরে আসে। আজকাল যাকে হঠযোগ বলা হয়, তা অবশ্য কসরৎ ছাড়া আর কিছুই না।''

প্রত্যেকবার ইউ জী–র মৃত্যু ঘটে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে। একে আগে থেকে কিছুতেই আঁচ করা যায় না। কোনওভাবেই জানা সম্ভব নয় যে কখন এবং কীভাবে এই ঘটনা ঘটবে। এটা সেই আশ্চর্যজনক এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার অন্তর্গত। ইউ জী–র কাছে এটা শরীরের পুনর্জীবনের প্রক্রিয়া। যখন শরীরের নিজেকে আর পুনর্জীবিত করার ক্ষমতা থাকে না তখন যা হয় তাকে আমরা মৃত্যু বলি। ইউ জী সেই প্রক্রিয়াকে এইভাবে বর্ণনা করেন, ''এটা সত্যিকারের মরে যাওয়ার মতনই। হাত, পা ঠান্ডা হয়ে যায়, শরীর শক্ত হয়ে যায়, আর ভেতর থেকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের চেষ্টা চলতে চলতে হঠাৎ সবকিছু থেমে যায়।''

এক প্রত্যক্ষদর্শী এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলেন যে, ইউ জী–কে সত্যিই এক মৃতদেহের মতন দেখাচ্ছিল। ইউ জী এই অবস্থা সম্পর্কে কোনওরকমের বর্ণনা দিতে অক্ষম থেকে যান। তিনি বলেন, ''লোকে যাকে বলে 'মৃত্যুর অভিজ্ঞতা' তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।'' তিনি আরও যোগ করে দিয়ে বলেন, ''সেই সব অভিজ্ঞতা শুধু বই লেখার, সেমিনার আয়োজনের এবং অর্থ উপার্জনের উপযোগী।'' তিনি অবশ্য বলেন যে, এই প্রক্রিয়া শুধু যে তাঁর মধ্যেই ঘটে তা নয়, এটা এই গ্রহের সমস্ত জীবজগতে ঘটছে, এমনকী গ্রহের নিজেরও। তিনি বলেন যে, মানুষ এই ঘটনার ব্যাপারে সচেতন নয়, কারণ তাঁর চিন্তা সমস্ত কিছুকে সবসময় আড়াল করে রাখে।

ক্যাসিনো ডি প্যারিসের ঘটনা এবং তাঁর সেই স্বপ্ন যাতে তিনি দেখেছিলেন শরীর জ্বলে যাচ্ছে, তা ছিল আরও বহু অদ্ভুত ঘটনার ভূমিকা মাত্র।

ঃঃ – ঃঃ

কী সেই অবস্থা?

‘‘খড়ের গাদায় একবার আগুন লেগে গেলে, ভেতরে ভেতরে সে আগুন সমানে জ্বলতে থাকে, আপনি বাইরে থেকে কোনও আগুন দেখতে পান না, কিন্তু যখন একে ছুঁয়ে দেখতে যান, তখন সে আগুন আপনাকে পুড়িয়ে দেয়’’

– ইউ জী

‘‘তাঁর নাম ডগলাস রোজেনস্টাইন। তিনি তখন সানেন উপত্যকায় ছিলেন, যখন আমার (ইউ জী-র) জীবনে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ (যাকে ইউ জী ক্যালামিটি বলেন) সৃষ্টি হয়। তিনি অবশ্য ওই দুর্ঘটনার আগে থেকেই আমাকে জানতেন’’, বললেন ইউ জী, যখন আমাদের গাড়ি ক্যালিফোর্নিয়ার কারমেল নামের ছোট্ট এক শহরে এসে পৌঁছাল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, এমন কোনও লোকের সঙ্গে কি দেখা করা সম্ভব যিনি ইউ জী-কে ১৯৬৭ সালের ঘটনার আগে থেকেই জানতেন। আমি নিজে জানতে চেয়েছিলাম যদি কেউ আমায় ক্যালামিটির আগেকার অবস্থার সঙ্গে পরবর্তীকালে ইউ জী-র কোনও বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে কিনা, সেটা বলতে পারেন। ‘‘এখানে থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে আপনার অবশ্যই দেখা হবে। চিন্তার কোনও কারণ নেই ...।’’

কারমেলে যে বাড়িটায় আমরা উঠেছি, তাকে প্রাসাদ বললে হয়তো ভুল হবে না। কিন্তু ভীষণ নিস্তব্ধ, যা আমার মোটেই পছন্দ নয়। শান্তিপূর্ণ ভাব সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে। আগামীকাল আমার লেখার কাজ শুরু হবে। একটা অদ্ভুত আশঙ্কা আমায় ছেয়ে ফেলল। রাতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি যে এই কাজের অযোগ্য সেই ভাবনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে লাগলাম। এই যে কাজটা

হাতে নিয়েছি তা কি সম্পন্ন করতে পারব?

আর একজন সমব্যাথীকে খুঁজে পাওয়ার মধ্যে অপূর্ব একটা আশ্বস্তভাব আছে। স্কট একারসলির আগমন আমাকে সেই বহু প্রত্যাশিত নিরাময় এনে দিল। তাঁর উপস্থিতি যেন আমার মধ্যে ওষুধের মতো কাজ করল। ১৯৭৮–৭৯ সালে ভারতের মহাবলীশ্বরে ইউ জী–র সঙ্গে আমি এবং স্কট একসঙ্গে বেশ কয়েকদিন ছিলাম। আমাদের বন্ধুত্ব বেশ গভীর হয়ে উঠেছিল। তিনি আমাকে তার সঙ্গে ইউ জী–র প্রথম সাক্ষাৎকারের গল্প তখনই বলেছিলেন।

স্কট বর্তমানে গৃহনির্মাতা এবং ভাস্কর; একসময়ে ক্যালিফোর্নিয়ার ওহাইতে 'লাইভ ওক স্কুল'–এর ডিরেক্টর ছিলেন। এই স্কুলের শিক্ষা প্রণালী জে কৃষ্ণমূর্তির দর্শনের উপর ভিত্তি করে শুরু হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের জুন মাসে শিক্ষা বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের বোর্ড অফ ডিরেক্টর স্কট এবং অন্যান্য সমস্ত শিক্ষকদের সুইজারল্যান্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জে কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে শিক্ষণের উপর আলোচনা করার জন্য। মাঝে মাঝেই স্কটের সঙ্গে জে কৃষ্ণমূর্তির রীতিমতো ঠোকাঠুকি লেগে যেত। কিন্তু আলোচনা কখনও কোনও এক মতে এসে শেষ হত না। স্কট আলোচনা সভায় যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন। কয়েকদিন পরে স্কটকে ডাইরেক্টারের চাকরিটা পর্যন্ত খোয়াতে হল। তখন থেকে শুরু হয়েছিল স্কটের জীবনে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একাকীত্ব। কৃষ্ণমূর্তির লোকজনের কাছ থেকে পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে তিনি সমস্ত বন্ধুবান্ধবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। পয়সাকড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় স্কট তখন একাকী সানেনের কাছাকাছি জলেঘেরা স্যাঁতসেঁতে নিচু জমিতে ছোট্ট একটা তাঁবুতে আস্তানা গাড়লেন। এখানে থাকাকালীন এক পুরানো বন্ধু এসে স্কটকে আর এক কৃষ্ণমূর্তি অর্থাৎ ইউ জী–র সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিলেন।

> আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার আমি বর্ণনা করতে পারব না বা সেদিন কি কথাবার্তা হয়েছিল, তাও আমার মনে নেই। তবে এটা পরিষ্কার মনে আছে ইউ জী–র স্যালে থেকে বেরিয়ে আসার পর সবকিছু ভিন্ন রকমের বলে মনে হয়েছিল। আমার গভীর হতাশা কীভাবে যেন শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই হতাশার জায়গায় এক আশ্চর্য রকমের প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল

> আমার মনের ভেতরটা। বহুদিন পরে নিজেকে অদ্ভুতভাবে আনন্দিত এবং সুরক্ষিত বলে মনে হয়েছিল।

স্কটের অবশ্য কোনও ধারণাই ছিল না যে এই সাক্ষাতের পর এক অস্বাভাবিক শারীরিক যন্ত্রণা তাঁর মধ্যে দেখা দেবে। ঠিক পরের দিন তাঁর ফ্লু-জাতীয় গা ব্যথা, শিরদাঁড়ায় ও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সকালে ঘুম ভাঙল। দিনের পর দিন তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। অবশেষে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর বাইরে আসার শক্তি পর্যন্ত তাঁর মধ্যে ছিল না। একদিন সন্ধ্যার একটু আগে যখন সূর্য প্রায় অস্তাচলে, সেই সময় স্কটের মনে হয়েছিল যেন সেটাই হবে তাঁর জীবনের অন্তিম রাত। এক বান্ধবীকে অনুরোধ করলেন যদি তাঁকে কোনওরকমে একটু তাঁবুর বাইরে নিয়ে আসতে সাহায্য করে, জীবনে শেষবারের মতো একটু সূর্যাস্ত দেখতে চান। যাই হোক পরের দিন মরিয়া হয়ে সেই বন্ধু যে তাঁকে ইউ জী-র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁকে ধরলেন এবং বললেন ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করতে যে, তিনি কি মুমূর্ষুকে সারিয়ে তুলতে পারেন না? ইউ জী সংবাদ পাঠালেন যে সেসব ধরনের কিছুই তিনি করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও সেদিন বিকেলবেলা ইউ জী স্কটের তাঁবুতে এসে হাজির হলেন।

> ইউ জী একাই এসেছেন। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। এই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। কোনও রকমে নিচু হয়ে তাঁবুর মধ্যে চলে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যাবে কি না? তাঁর সেই আগমনে আমি খুব সম্মানিত বোধ করেছিলাম। জানি না ইউ জী-র দেখতে আসা আমাকে সেরে উঠতে সাহায্য করেছিল কি না। কিন্তু দু'দিন পরে অর্থাৎ শরীর খারাপ হওয়ার ঠিক সাতদিন পরে আমার সমস্ত রকমের বিধ্বস্ত ভাব পুরোপুরি চলে গেল।
>
> কিন্তু এই ধরনের অসুস্থতা আমার জীবনে বারবার দেখা দিতে লাগল। প্রত্যেক দ্বিতীয় বছর ইউ জী-র সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়তাম। বেশ কয়েক বছর পরে বুঝলাম যে আমার অসুস্থতার সঙ্গে ইউ জী-র সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার কোথায় যেন যোগাযোগ আছে। যখনই আমার ভেতর এই দুটো ঘটনার মধ্যে

> এক রহস্যজনক যোগাযোগ আছে বলে মনে হল, আমি গিয়ে ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলাম। ইউ জী পুরোপুরি ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর সেই প্রিয় বাক্যটা শুনিয়ে দিলেন, 'এসব ভুলে যান।'

দীর্ঘ নয় বছর পর আবার স্কট ফ্রাঙ্কফোর্টে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মুম্বইতে ইউ জী-র সঙ্গে একান্তে কিছুদিন সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। তখনই স্কট মনে মনে ঠিক করে ফেললেন তাঁর এবং ইউ জী-র মধ্যে যা-ই চলছিল না কেন, সেসবের এখন শেষ হওয়া দরকার, তাই ইউ জী-কে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করে বিস্তারিতভাবে একটা চিঠি লিখলেন। নিজের মনের কুসংস্কার এবং ভুল ধারণাগুলো পরিষ্কার করার ব্যাপারে ইউ জী-র সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালেন। তিন বছর স্কট ইউ জী-র কাছে কোনও চিঠি লেখেননি বা চিঠি পাননি। সেই ঘটনার পর ইউ জী এবং স্কট অনেকবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা করেছেন কিন্তু তিনি বললেন যে, আর কখনও সেরকমভাবে তিনি অসুস্থ হননি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি স্কটকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''এই এত বছর ধরে তুমি ইউ জী-কে জান, যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কীভাবে তুমি ইউ জী-কে বর্ণনা করবে?'' তিনি তখন যা বলেছিলেন, তা ছিল এরকম ঃ

> তিনি এমন এক ক্ষত সৃষ্টিকারী কাঁটা যা কখনই চলে যেতে চায় না। ব্যথা ও ঘা সবসময় থাকবে। আর সেটা আরও খারাপ রূপ নেবে যখন তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। তখন এই ব্যাপারটা সংক্রামক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হবে। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর তিনি অমর হয়ে যাবেন। আর তখনই সত্যি সত্যি ব্যাপারটা শুরু হবে। লোকজন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় একত্রে মিলিত হয়ে আলোচনা শুরু করবে। ''ইউ জী সত্যি সত্যি কি বলতেন? তাঁর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?'' ইত্যাদি ইত্যাদি ...। জে কৃষ্ণমূর্তির মৃত্যুর পর তাঁকে ভুলে যাওয়া ছিল খুবই সহজ ব্যাপার। মহেশ! এই পৃথিবীতে উৎসাহ পাওয়ার মতো অনেক ভালো জিনিস আছে। সত্যিকারের দর্শনও প্রচুর আছে। কিন্তু দর্শনবিধ্বংসী কোনও কিছু নেই। ইউ জী সবকিছু বলেন ঠিক যা

যেরকম সেরকম ভাবে, পৃথিবীতে এমন ক'জন আছেন যিনি সমস্ত আশা ছিনিয়ে নেন? কেই বা এমন আছেন যিনি পায়ের তলা থেকে মাটিটুকু পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেন? এরকম কেউ নেই।

ইউ জী-র সঙ্গে থাকাকালীন কখনও কখনও জানি না কি যেন একটা চেতনাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলে। তাই তোমাকে অবশ্যই সেখান থেকে চলে যেতে হবে। গাছপালাঘেরা পল্লীতে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে কিছুদিন থাকতে হবে। কারণ ধীরে ধীরে যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে, তখন বেশ কিছু জিনিসের প্রয়োজন হবে। তার মধ্যে একটা জিনিস হল আত্ম-অনুভূতির ভাবনা, কারণ যা আমাদের মধ্যে আছে তা হল সেই ভাবনাটা, আত্মা বলতে তো কিছু নেই। নিজের বলে কিছু আছে এই জোরটা থাকা দরকার। যখন যুবক ছিলাম তখন ওসব পরোয়া করিনি। এখন দেখতে পাচ্ছি যে ক্ষয়ে যাওয়া 'আমি' একটু না থাকলে জীবনটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই মুশকিল। ইউ জী যা বলেছেন সেটাই যদি মেনে নাও তাহলে চলার মতো কিছুই থাকবে না। আর সেভাবে বেঁচে থাকা ভীষণ শক্ত। বিশেষ করে বয়স যখন বেশি হয়ে যায়। অল্প বয়সে এসব নিয়ে যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছি তাই এসব এখন সামাল দিতে হচ্ছে।

ইউ জী-র সঙ্গে গত কুড়ি বছর ধরে এই আশা-নিরাশার বিষয় নিয়ে আমি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। ইউ জী বলেন যে, আশা বলতে কিছু নেই কিন্তু একেবারে নিরাশ হওয়ার মতোও কিছু নয়। কোথায় যেন একটা সামান্য ইঙ্গিত আছে, আমি সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। মনে হয় সেটাই আমি চাই, কিন্তু ইউ জী বলেন, পাওয়ার মতো কিছুই নেই। তুমি হয়তো ব্যাপারটা জানো, যদি সত্যি সত্যি কখনও তাঁর সম্মুখীন হয়ে থাকো। যদি একবার সে জিনিসের স্পর্শ পেয়ে থাকো, তাহলে কোনওদিন তা নিয়ে আর রসিকতা করতে পারবে না। এর ভীষণ যন্ত্রণা, কখনও কখনও মনে হয় উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাই, অন্য কিছু করে এসব ভুলে থাকি।

কিন্তু ইউ জী যেন নিজের ছায়া। তুমি যেখানে আছ, তিনিও সেখানে আছেন।

ইউ জী হলেন বহু মেজাজের মানুষ। তাই আমি তাঁর এলাকায় খুব সতর্ক হয়ে পা রাখি। তাঁর ব্যাপারে এত বেশি জিনিসই আমি বুঝি না যে একদিন তাঁকে বুঝতে পারব বলে যে আশা ছিল, সে ব্যাপারে এখন পুরো হাল ছেড়ে দিয়েছি।

তিনি কোনও কোনও লোকের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠুর হতে পারেন, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে পারেন, বেশিরভাগ লোক শেষ পর্যন্ত তাঁর বিস্ফোরণে পালাতে বাধ্য হবেন, যদি বেশিদিন তাঁর আশপাশে থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ বাইশ বছর কোনওদিন তিনি আমায় ভর্ৎসনা করেননি, এমনকী উচ্চস্বরে কথা পর্যন্ত বলেননি। ইউ জী ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও মাঝে মাঝে এমন ভাষায় তিরস্কার করেন যে, তাঁদের মনে হয় যেন আর কোনওদিন তাঁর মুখ দেখতে না হয়। কিন্তু আমার সঙ্গে চিরকাল স্নেহপ্রবণ, কোমল এবং হাস্যরসিক হয়ে থাকলেন।

তুমি ইউ জী-র প্রতি স্নেহ, ভালোবাসা জাতীয় জিনিস কিছুতেই দেখাতে পারবে না। তাঁর এসব একদম পছন্দ না এবং কোনওভাবেই অনুমতি পাবে না। তাঁর প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা তিনি অর্থহীন অভিমানের অভিব্যক্তি বলে সযত্নে উড়িয়ে দিয়েছেন। ঠিক আছে, তাহলে সেটাই হয়তো সত্যি। কিন্তু আমার হৃদয় সেটা কোনওদিন মেনে নেবে না। আমি জানি আমার এই পৃথিবী ভীষণ নিঃসঙ্গ জায়গা, তবুও ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি, যিনি আমার জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এটুকু না শুনে যে তিনি আমার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, তিনি আমার প্রতি যত্নশীল ছিলেন, একদিন বৃদ্ধ হয়ে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

পরে স্কট আমায় একটা চিঠি লিখে জানালেন যে, সেদিন তিনি যা বলেছিলেন সেটা সম্পূর্ণ নয়। আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বললেন যে, নিম্নলিখিত কয়েকটা

লাইন যেন তাঁর কথার শেষে জুড়ে দিই ঃ

> আর একটা শেষ কথা, মহেশ। আমি ইউ জী–র প্রতি এমন জোরালো ভাবপ্রবণতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাণের পিঞ্জরে এমন আলোড়ন তুলবে যে তাঁর সমস্ত পাখনা এলোমেলো হয়ে যাবে। সেই বাক্য এমন অভিমান সৃষ্টি করবে যাতে তার গলা ধরে যাবে – চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠবে, আমি নিশ্চিত মহেশ, তিনি তোমাকে বলবেন এসব কথা যেন তাঁর জীবন চরিতে উল্লিখিত না হয়। কিন্তু সেটা কিছুতেই হতে দেবে না; আমি আগে যা বলেছি, তা যদি তুমি ছাপাও তাহলে এখন যা বলতে যাচ্ছি সেটাও ছাপতে হবে। ‘‘ইউ জী আপনি কি শুনছেন? আপনার প্রত্যাখ্যানের ভয়ে আমি কোনওদিন সোজাসুজি আপনাকে একথা বলতে পারিনি। আমি বিশ্বের সবার সামনে চিৎকার করে বলতে চাই, আমি আপনাকে ভালোবাসি।’’

১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে, ইউ জী–র জীবন আর একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। ইউ জী–র কাছে ‘‘কি সেই অবস্থা?’’ প্রশ্নটার এক অসামান্য তীব্রতা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে ভাবপ্রবণতার কোনও লেশমাত্র ছিল না। যতই গভীরভাবে তিনি এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন, ততই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়ার হতাশাজনিত অনুভূতি বাড়তে লাগল। কিন্তু প্রশ্নের তীব্রতা মনের মধ্যে দিনকে দিন বেড়েই চলল।

‘‘এ যেন এক খড়ের গাদা। খড়ের গাদায় যদি আগুন লেগে যায়, তাহলে সমানে ভেতরে ভেতরে সে আগুন জ্বলতে থাকে। বাইরে থেকে হয়তো আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না, কিন্তু যদি ছুঁতে যান তাহলে সে আগুন আপনাকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। ঠিক সেভাবে আমার ভেতরে ভেতরে সেই প্রশ্নের আগুন জ্বলতে লাগল; কি সেই অবস্থা? আমি চাই সে অবস্থা।’’

ইউ জী অবশ্য ততদিনে শেষ হয়ে গেছেন। কৃষ্ণমূর্তি বলেছিলেন, ‘‘তোমার কোনও উপায় নেই ...’’, কিন্তু তবুও ইউ জী জানতে চেয়েছিলেন কি সেই অবস্থা যে অবস্থায় বুদ্ধ ছিলেন, শঙ্করাচার্য ছিলেন, রামকৃষ্ণ এবং অন্যান্য মহান শিক্ষকেরা ছিলেন।

ঠিক সেই বছর জে কৃষ্ণমূর্তি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আবার সানেন উপত্যকায় এলেন। বন্ধুরা তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন একথা বলে ''এবার বক্তৃতা শুনতে কোনও পয়সা লাগবে না। আপনাকে বক্তৃতা শুনতে আসতেই হবে।'' বক্তৃতা শুনতে শুনতে ইউ জী–র মনে হল যে কৃষ্ণমূর্তি নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন না। পক্ষান্তরে ইউ জী–র অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন। ''কেন আমি তাঁর অবস্থার কথা জানতে চাই? তিনি সেই অবস্থাকে বর্ণনা করছেন কোন এক 'স্পন্দন', 'জাগরণ', 'স্তব্ধতা' বলে ... আর সেই গভীর স্তব্ধতায় মন বলে কিছু নেই, যা আছে তা হল শুধুমাত্র কর্ম প্রক্রিয়া'' ইত্যাদি ইত্যাদি; নিজেকে বললাম, ''আমি ঠিক সেই অবস্থাতেই আছি। গত ত্রিশ, চল্লিশ বছর ধরে কি সব হাবিজাবি করে যাচ্ছি, এসব লোকের কথা শুনে আপ্রাণ চেষ্টা করছি সেই অবস্থাকে বুঝতে, যে অবস্থায় বুদ্ধ, যিশু প্রভৃতি লোকেরা ছিলেন? আমারও সে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন আমি সেই অবস্থাতেই আছি।'' যেই ভাবা সেই কাজ, বক্তৃতা চলাকালীন উঠে চলে এলেন, আর কোনওদিন তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কিন্তু সেই প্রশ্ন 'কি সেই অবস্থা?' ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে নতুন এক প্রশ্নে রূপান্তরিত হল। ''কি করে আমি জানব যে আমি সেই অবস্থাতে আছি, বুদ্ধের অবস্থা, যা আমি গভীরভাবে চিরকাল চেয়ে এসেছি, অন্যের কাছে, সবার কাছে জানতে চেয়েছি?'' কিন্তু ভাগ্যচক্রের এমনই অমোঘ পরিণতি যে ঠিক পরের দিনই প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল।

ঃঃ – ঃঃ

বিপত্তি

"কোনও কিছু ঘটবার আগে সমস্ত রকমের অনুসন্ধান শেষ হয়ে যেতে হবে।"

– ইউ জী

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯১। ক্যালিফোর্নিয়ার কারমেল শহর, এখন ভোর সাড়ে চারটে। আমি আমার লেখার টেবিলের সামনে বসে আছি। গত একপক্ষ কাল ধরে আমি মোটামুটি এভাবেই কাজ করে যাচ্ছি। ভোরের এই সময়টা ও তার নিস্তব্ধতার গভীরতা আমার অস্থিমজ্জায় শীতল কম্পন জাগায়। আমি অবাক হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কেন এই একাকীত্বের নির্বাসন নিলাম। লেখার কাজটা বড়ই একাকী। আমার মনে হয়, যে কোনও কাজ গভীরভাবে করতে গেলে একাকীত্ব ভাবটা অনিবার্য। প্রত্যেক সৃষ্টিকর্তা তাঁর স্বপ্নের ও সেই স্বপ্নের শেষ অভিব্যক্তির মধ্যে যে অন্তর থেকে যায় তাকে গভীর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অনুভব করেন। সেই খাদ কোনওদিন ভরাট হয় না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অদ্ভুত একটা নিশ্চয়তা আছে, হয়তো বা তা সম্পূর্ণ মায়াঘেরা, যে আরও অনেক কিছু যেন বলার ছিল।

আমার এই জন্মদিনটা যেন অনেক দীর্ঘস্থায়ী বলে মনে হচ্ছিল। গতকাল সন্ধ্যাবেলা থেকে আমার জন্মদিনকে অভিনন্দন জানিয়ে ক্রমাগত ফোন কল এসেছে ভারত থেকে এবং সারা রাত ধরে আমাকে তার উত্তর দিতে হয়েছে। এখান থেকে ভারতের সময়ের ব্যবধান তেরো ঘণ্টা। 'এখনও আমার জন্মদিন শুরু হয়নি এখানে, বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও?' জিজ্ঞাসা করল আমার নয় বছরের ছেলে রাহুল। সে ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে মুম্বই-এর দিনরাতের পার্থক্যটা বুঝে উঠতে পারল না। আমি বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। যখন রাহুলকে বললাম যে, গত

কয়েকদিনে কারমেলে তিন-তিনবার ছোট এবং মাঝারি ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার, ও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। 'বাবা! তোমার কি ভাগ্য, দারুণ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে সময় কাটছে, তাই না?' সেই সময় লাইনটা কেটে গেল।

ইউ জী-র শরীর ভালো যাচ্ছে না। এটা তাঁর স্বাভাবিক 'হৃদযন্ত্রের অনৈচ্ছিক আক্ষেপ' (কার্ডিও স্প্যাসম) জনিত সমস্যা। কোনও রকম খাদ্য ও পানীয় তাঁর পাকস্থলীতে যাচ্ছে না। ইউ জী-কে ভীষণ দুর্বল ও কৃশকায় দেখাচ্ছে। ১৯৩৯ সালের পর এই প্রথম তাঁর তিন কিলোগ্রাম ওজন কমেছে। সাধারণত তাঁর ওজন কখনই বাড়ে-কমে না। আমাদের সবার মধ্যেই একটা অলিখিত আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাঁর শরীরকে কেন্দ্র করে, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে একেবারেই ভাবনাহীন। তিনি ঠিক তাঁর মতনই আছেন। অধ্যাপক নারায়ণমূর্তি তাঁকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টায় সফল হয়েছেন। ইউ জী-র হোমিওপ্যাথিক পিল খাওয়ার ব্যাপারটা এক মজাদার ঘটনা। তাঁকে তখন সত্যি সত্যি এক বাচ্চা ছেলের মতন মনে হয়। এই ওষুধ তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখে। 'যদি এই ওষুধে কোনও কাজ না হয়, তাহলে আমাদের সবার উচিত তাঁকে ডাক্তার দেখাতে রাজি করানো', বললেন অধ্যাপক নারায়ণমূর্তি। ইউ জী কিন্তু বলেন, 'কেবলমাত্র একবারই আমি ডাক্তার দেখাব যখন প্রয়োজন হবে ডেথ সার্টিফিকেটের' এবং একথাও আমরা ভালো করে জানি যে, এটা কোনও রসিকতা নয়। আমিও ধীরে ধীরে নৈরাজ্যপূর্ণ হতাশার দূষিত জলাভূমিতে ডুবতে লাগলাম।

নিজেকে আবার অনেক কষ্টে একত্র করে লিখতে বসলাম, যাকে চলচ্চিত্রের ভাষায় বলা যেতে পারে ইউ জী-র জীবনের ক্লাইম্যাক্স অর্থাৎ চরম পরিণতি; ঠিক সেই সময় পায়ের নিচে আবার পৃথিবী দুলে উঠল। রিখটার স্কেলে ৫.১ মাত্রার ভূমিকম্প বলে জানান দিল দূরদর্শন।

ভারতীয় পঞ্জিকার মতে (চান্দ্র মাস অনুযায়ী) তাঁর উনপঞ্চাশতম বর্ষ জন্মদিনের ঠিক একদিন আগে তিনি জে কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতা থেকে উঠে চলে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর ইউ জী একটা গাছের নিচে ছোট বেঞ্চিতে এসে বসলেন। সামনে পর্বত ও সাতটি উপত্যকায় ঘেরা পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর জায়গা সানেন উপত্যকা ঃ

আমি চুপচাপ বসে আছি। আমার সেই প্রশ্নটা কোনও সাধারণ প্রশ্ন

> নয়। মনে হল যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই সেই প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। 'আমি কি করে জানবো যে আমি সেই অবস্থাতে আছি?' জিজ্ঞাসা করলাম নিজেকে। ''আমার ভেতরে যেন একটা বিভাজন অনুভব করলাম, দ্বৈত সত্ত্বা; একটা ভাগ যেন জানে যে সে সেই অবস্থাতে আছে। সেই অবস্থার গুণাবলীর জ্ঞান – যা আমি পড়েছি, শুনেছি এবং উপলব্ধি করেছি – সবাই যে অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে। এটা হল সেই জ্ঞান যা আমার অবস্থাকে দেখছে, অর্থাৎ সেই জ্ঞান যা এই অবস্থাকে আমার মধ্যে উপস্থাপিত করেছে।''
>
> নিজেকে বললাম, ''দেখ বৎস, চল্লিশ বছর পরেও তুমি একপাও এগোতে পারোনি; যেখানে ছিলে ঠিক সেখানেই আছ। যখনই তুমি কোনও প্রশ্ন কর; সেই একই জ্ঞান মনের উপর সেই অবস্থাকে উপস্থাপিত করে। তুমি ঠিক একই অবস্থাতে আছ, একই প্রশ্ন করে চলেছ, 'কি করে আমি জানবো?' কারণ সেই জ্ঞান অন্য সবার সেই অবস্থার বর্ণনা বিবরণ তোমার মধ্যে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তুমি নিজেকে এখনও প্রতারণা করে চলেছ। তুমি সত্যিই মূর্খ।'' কিন্তু তা সত্ত্বেও এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল ভেতরে – যে এটাই সেই অবস্থা।

ইউ জী–র কাছে তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্নের কোনও উত্তর ছিল না, 'কি করে জানবো যে এটাই সেই অবস্থা?' সেই প্রশ্নটা যেন ঘূর্ণিপাকের রূপ ধারণ করল। ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল। অহর্নিশি। তারপর হঠাৎ করে প্রশ্নটা মিলিয়ে গেল। কোনও কিছুই ঘটল না। শুধু প্রশ্নটা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেল – এমনকী ইউ জী নিজেকে এ কথাও বললেন না যে, 'হে ঈশ্বর! অবশেষে আমি উত্তর পেলাম।' সব কিছু মিলিয়ে গেল। যে অবস্থায় তিনি ছিলেন বলে ভাবতেন, বুদ্ধের অবস্থা, যিশুর অবস্থা – সেই অবস্থার ভাবনাটাও সম্পূর্ণ উবে গেল।

> প্রশ্নটা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেল। সব কিছুই যেন সেইসঙ্গে শেষ হয়ে গেল। তারপর থেকে কোনওদিন আর নিজেকে এ কথা বলার চেষ্টা করিনি, 'আমার কাছে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আছে।' যে

> অবস্থাতে থাকার সম্বন্ধে সব সময় বলতাম, 'আমি সে অবস্থাতে আছি ...' সবকিছু পুরোপুরি হারিয়ে গেল। প্রশ্নটা যেন কীভাবে চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। এটা কোনও শূন্যতা নয় বা সেরকম কোনও কিছু নয়, শুধু সমস্ত জিজ্ঞাসা যেন কোথায় হারিয়ে গেল।

তাঁর সেই মৌলিক প্রশ্নের শেষ হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে, অর্থাৎ যখন তিনি আবিষ্কার করেন যে সে প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই, এক শারীরিক ঘটনা বলে ইউ জী মনে করেন; এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা ভেতরে হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সৃষ্টি করেছিল, আমার প্রতিটি কোষে, প্রতিটি স্নায়ুতে, প্রতিটি গ্ল্যান্ডে বিস্ফোরণ ঘটেছিল।' আর সেই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে যে মায়া বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে 'আমি' বলে জিনিসটা সৃষ্টি করে তা ধ্বংস হয়ে গেল; তার কোনও চিহ্নই রইল না। সেই অবস্থা সম্পর্কে ইউ জী আরও বলেন ঃ

> চিন্তা তখন আর বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না। আর একবার যখন এই যোগাযোগ ভগ্নপ্রাপ্ত হয়, তখন সব শেষ হয়ে যায়। এরপর থেকে যখনই কোনও চিন্তার উদ্ভব হয়, সেই চিন্তার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আবার বিস্ফোরণ ঘটে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু টানাপোড়েনের ইতি ঘটে, এবং সমস্ত রকমের চিন্তা প্রাকৃতিক ছন্দে জাগে ও মিলিয়ে যায়।
>
> সেদিনের পর থেকে আমার মধ্যে কোনও বিষয়ের উপর আর কোনও রকমের প্রশ্ন জাগে না। কারণ এই অবস্থায় কোনও রকমের প্রশ্ন থাকা সম্ভব নয়। যে প্রশ্ন আমার মধ্যে জাগে তা খুবই সাধারণ, যে রকম 'কীভাবে আমি হায়দ্রাবাদ যাব?' যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দরকার এ সমাজে সুস্থ লোকের মতো চলতে গেলে, এবং যে কোনও লোকের কাছে এ সবের উত্তর পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য সব প্রশ্নের (আধ্যাত্মিক বা অধিবিদ্যা সংক্রান্ত) উত্তর কারোর কাছেই নেই। সুতরাং কোনও রকমের প্রশ্নই আর আমার মধ্যে রইল না।

আমার মাথার মধ্যে সবকিছু এমন কঠিনভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে, যেন অন্য কিছু থাকার মতন কোনও জায়গাই আর আমার মস্তিষ্কে নেই। এই প্রথম আমি অনুভব করলাম যে, আমার মধ্যে সব কিছু ভীষণ আঁটসাট হয়ে আছে। যে সমস্ত সংস্কার এবং বাসনা বা যে নামেই তাকে অভিহিত করুন না কেন, তা আমার মধ্যে কখনও কখনও জেগে ওঠে কিন্তু মস্তিষ্কে কোনও খালি জায়গা না থাকায় আর টিকে থাকতে পারে না। কোনও রকমের বিভাজন (যা অতীতের সংস্কার, চিন্তার আকারে আমাদের মধ্যে থাকে) এখানে স্থায়ী হতে পারে না। বস্তুগত ভাবেই আমার মধ্যে সেটা অসম্ভব। এবং এই এককীকরণের জন্য কোনও কিছু করার কোনও রকমের প্রয়োজনীয়তাও নেই। সেই কারণেই আমি বলি যখন এই ধরনের বিস্ফোরণ একবার ঘটে (আমি বিস্ফোরণ কথাটা ব্যবহার করি, কারণ এটা নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের মতন) তারপর শৃঙ্খলিত বিক্রিয়ার মতন (চেইন রিঅ্যাকশন) সেই শক্তি সৃষ্টি প্রক্রিয়া সমানে চলতে থাকে। শরীরের প্রতিটি কোষ, এমনকী অস্থিমজ্জার কোষগুলো পর্যন্ত এই বিস্ফোরণের ফলে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমি যদিও এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে চাই না – কিন্তু এই সমস্ত দৈহিক রূপান্তর অপরিবর্তনীয়, দেহের মৌলিক রাসায়নিক গঠন পুরোপুরি বদলে যায়।

সত্যি সত্যি এ এক পারমাণবিক বিস্ফোরণ। সমস্ত দেহটা বিধ্বংস হয়ে যায়। এই জিনিসটা সহজ ব্যাপার নয়, মানুষ শেষ হয়ে যায়। এই বিস্ফোরণের আঘাত প্রতিটি কোষে, প্রতিটি স্নায়ুতে পরিবর্তন আনে। প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তখন সময় কেটেছে। তার মানে এই নয় যে আপনি সেই বিস্ফোরণকে উপলব্ধি করতে পারবেন। যা দেখতে পাবেন তা হল তার পরবর্তী অবস্থা। বিস্ফোরণের প্রকৃত ফল হল, দেহের রাসায়নিক গঠনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন লাভ।

এই পরিবর্তিত অবস্থায় শরীরের প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার নিজের

নিজের কাজ করে। এদেরকে পরিচালিত করার মতো ভেতরে কেউ নেই – এটুকু শুধু আমি বলতে পারি। আর দেহের রাসায়নিক গঠন যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেকথা যে বলতে পারি তার কারণ হল, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহের মূল রসায়ন পালটে না যায় ততক্ষণ অবধি এই প্রাণীকে চিন্তামুক্ত করা সম্ভব নয়, চিন্তার নিরবচ্ছিন্নতা ভঙ্গ করা অসম্ভব। যেহেতু আমার মধে চিন্তা জাগে ও মিলিয়ে যায় এবং এদের মধ্যে কোনও যোগাযোগকারী কেউ নেই তাই সেগুলো বিচ্ছিন্ন; এবং এই কারণে আমি বলতে পারি যে আমার মধ্যে কিছু হয়েছে, কিন্তু কী হয়েছে সেটা উপলব্ধি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার মধ্যে যা ঘটেছে তা আমি যা আশা করেছিলাম, মনে মনে স্বপ্ন দেখতাম বা চাইতাম সেইসবের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেসব কিছুর আওতার বাইরে। তাই আমি এই ঘটনাকে আমার মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটেছে বলে দাবি করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি আমি জানি না কি হয়েছে আমার মধ্যে। আমি যেটা বলতে পারি সেটা হল, আমি কীভাবে আমার চাহিদাগুলো মিটিয়ে প্রত্যেকটা দিন কাটাই। আমার মনে হয় যে আপনারা যেভাবে দিন কাটাচ্ছেন তার সঙ্গে আমি যে ভাবে বেঁচে আছি তার মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু মূলগতভাবে আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকা সম্ভব নয়। আপনাদের ও আমার মধ্যে কোনওরকম পার্থক্য কি করে থাকা সম্ভব? তা অসম্ভব। কিন্তু আমি যেভাবে নিজেকে ব্যক্ত করতে চাইছি এবং আপনারা যেভাবে নিজেদের ব্যক্ত করতে চাইছেন তা দেখে মনে হয় যে কোনও একটা ভিন্নতা আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোথাও কিছু একটা ভিন্ন প্রক্রিয়া চলছে আর সেটাই আমি বোঝার চেষ্টা করছি, কি সেই ভিন্নতা।

সেই বিস্ফোরণের পর ইউ জী লক্ষ্য করলেন সারা সপ্তাহ ধরে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে একটা মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং তারা অন্যভাবে কাজ করতে শুরু করেছে। সাতদিনের দিন তাঁর শরীরের পুরোপুরি মৃত্যু ঘটল এবং তাঁর মধ্যকার সমস্ত পরিবর্তনগুলো চিরস্থায়ী হয়ে গেল।

যে সাতদিন ধরে তাঁর মধ্যে নানারকম পরিবর্তন ঘটেছিল তার প্রত্যেকটা দিন কোনও না কোনও একটা নতুন জিনিস তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। ইউ জী আবিষ্কার করলেন যে তাঁর শরীরের ত্বক (গায়ের চামড়া) অত্যন্ত কোমল ও মসৃণ হয়ে গেছে। তাঁর চোখের পাতা পড়া বন্ধ হয়ে গেছে, তাঁর মুখের স্বাদ, ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণের প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে।

প্রথম দিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে তাঁর দেহ কোমল ও মসৃণ হয়ে গেছে, যেন রেশম দিয়ে মোড়া, শুধু তাই নয়, ত্বক থেকে যেন আলোর আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। একটা রং–এর আভা। ‘আমি তখন দাড়ি কামাচ্ছিলাম, যতবার চেষ্টা করি, দেখি রেজার ব্লেড পিছলে যাচ্ছে। ভাবলাম ব্লেডের ধার কমে গেছে, নতুন ব্লেড লাগালাম। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না। মুখে হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, দেখি স্পর্শানুভূতিও পালটে গেছে।’ ইউ জী এসব ব্যাপারকে কোনও গুরুত্ব দিলেন না, শুধু সবকিছু গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন।

দ্বিতীয় দিন তিনি একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁর মনটা যেন সংযোগমুক্ত অবস্থায় কাজ করছে। ইউ জী তখন দোতলার রান্নাঘরে, ভ্যালেন্টাইন টমেটো স্যুপ তৈরি করছিলেন। কিছুক্ষণ স্যুপের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি মনে করতে পারলেন না, ভ্যালেন্টাইন কি রান্না করছিলেন। ভ্যালেন্টাইন বললেন, এটা টমেটো স্যুপ। ইউ জী চেখে দেখলেন এবং মনে মনে নিজেকে বললেন, টমেটো স্যুপের এরকম স্বাদ। স্যুপ খাওয়ার পর আবার ভুলে গেলেন, সংযোগ হারিয়ে ফেললেন; যেন তাঁর ‘মন’ বলে কিছু নেই। আবার ভ্যালেন্টাইনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এটা কি?’ আবার ভ্যালেন্টাইন জানালেন যে এটা টম্যাটো স্যুপ। ইউ জী আবার এক চুমুক খেলেন, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভুলে গেলেন নামটা। এভাবে বেশ কিছু সময় কেটে গেল, এই ‘সংযোগবিহীন মনের অবস্থাটা’ বড়ই কৌতুকজনক।

ইউ জী–র কাছে মনের এই অবস্থাটা এখন স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তিনি বলেন যে, তিনি আর কোনওরকম চিন্তাভাবনা বা ধারণার মধ্যে দিয়ে সময় কাটান না, সাধারণত সমস্ত লোক যেমন একাকী সময় কাটান। তাঁর মন যখন প্রয়োজন তখন কাজ করে অর্থাৎ যদি কেউ প্রশ্ন করে বা যদি তিনি কোনও টেপ রেকর্ডার মেরামত করেন সে রকম সময়ে তিনি মনের উপযোগ করেন। আর যখন কোনও

কাজ থাকে না, তখন তাঁর মধ্যে মন বলে কোনও কিছুই থাকে না, ফলে চিন্তা বলেও কিছু থাকে না; যা থাকে তা হল জীবনের অভিব্যক্তি।

তৃতীয় দিন ইউ জী-র বন্ধুরা জোর করে নিজেদের নিমন্ত্রিত করে খেতে এলেন। ইউ জী রান্না করতে রাজি হয়ে গেলেন।

> আমি ঠিকমতো গন্ধ শুঁকতে বা খাওয়ার স্বাদ নিতে পারলাম না। এই দু'টো ইন্দ্রিয় যেন পুরোপুরি পালটে গেছে। যখনই কোনও গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে তখনই ওলফ্যাকট্রি কেন্দ্রে সামান্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তা সে দামী আতরের গন্ধই হোক বা গোবরের গন্ধ হোক না কেন। আর যখনই কোনও খাবার চেখে দেখার প্রয়াস করি শুধু প্রধান প্রধান স্বাদ বুঝতে পারি – আর অনেক পরে ধীরে ধীরে অন্য স্বাদগুলো জেগে ওঠে। এরপর থেকে কোনও সেন্ট বা পারফিউম আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। তেল মশলার খাদ্য আমার মধ্যে কোনও সাড়া জাগায় না। শুধু ঝাল বা ওই জাতীয় প্রধান স্বাদ ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝতে পারি না।

চতুর্থ দিন তাঁর দৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। ইউ জী এবং বন্ধুরা গেস্টাডের রিয়ালটো রেস্টুরেন্টে বসে ছিলেন। এখানে বসে তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন এক অসাধারণ 'প্রসারিত দৃষ্টিশক্তি'-র ক্ষমতা, যেন অপসারী দর্পণের মধ্য দিয়ে তিনি সব কিছু দেখছেন।

> সব কিছু যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে এবং আমার মধ্যে চলে যাচ্ছে। তারপর আবার আমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা রীতিমতো ধাঁধা-লাগানো, যেন চোখ দু'টো আপনা-আপনি আমার সহযোগ ছাড়াই বিশাল স্বনিয়ন্ত্রিত ক্যামেরার মতন ফোকাস পরিবর্তন করছিল। এখন অবশ্য এসব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছি এবং এভাবেই আমি সবকিছু দেখি। আমাকে যখন গাড়িতে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, আমার চোখ দু'টো সিনেমার ক্যামেরাম্যানের মতন ঘুরতে থাকে। অন্য দিক থেকে আসা গাড়িগুলো যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করে, তারপর

> নির্গত হয়ে চলে যায়। আর যখন আমার দৃষ্টি কোনও কিছুর উপর নিবদ্ধ হয়, তখন পৃথিবীর আর কোনও কিছু আমার মধ্যে থাকে না। দৃষ্টি সম্পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে সহাবস্থান করে, ঠিক ক্যামেরার মতন।

সেদিন রেস্টুরেন্ট থেকে ফিরে এসে ইউ জী আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে তাঁর চোখ দু'টো স্থির হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারলেন যে চোখের পলক পড়ছে না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট এভাবে কেটে গেল, তবুও পলক পড়ল না। 'স্বভাবসিদ্ধ ভাবে আমার চোখের পলক পড়া সেদিন থেকে শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর এখনও তাই।'

পঞ্চম দিন লক্ষ্য করলেন তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিবর্তন। বাইরে কুকুরের ডাক শুনতে শুনতে মনে হল তাঁর ভিতর থেকে সেই শব্দ নির্গত হচ্ছে। সমস্ত শব্দ যেন তাঁর অন্তরের গভীর স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হচ্ছে এবং এখনও সেরকম হয়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তন ঘটেছে পাঁচদিনে। ষষ্ঠ দিনে ইউ জী তাঁর ঘরে সোফায় শুয়ে ছিলেন। ভ্যালেন্টাইন রান্নাঘরে কাজ করছিলেন।

> হঠাৎ মনে হল আমার শরীর অদৃশ্য হয়ে গেছে, সোফায় কেউ নেই। আমি আমার হাতের দিকে তাকালাম – ভালো করে দেখলাম ... 'এটা কি আমার হাত?' যদিও আমার মধ্যে এরকম কোনও প্রশ্ন জেগে ওঠেনি, কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই ছিল। আমি আমার শরীরকে স্পর্শ করলাম, কিছুই নেই। সেই স্পর্শ ছাড়া আর কোথাও কিছু ছিল না, সেই স্পর্শের স্থান ছাড়া কোনও জায়গায় কোনওরকম অনুভূতি নেই। তখন ভ্যালেন্টাইনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি আমায় সোফায় দেখতে পাচ্ছেন? আমার ভেতরে কোনও কিছু বলছে না যে এখানে আমার শরীর বলে কিছু আছে।' তিনি ভালো করে ছুঁয়ে দেখে বললেন, 'এটা আপনার শরীর।' কিন্তু তাঁর কথা আমার মধ্যে কোনওরকম আশ্বস্ত ভাব জাগাতে পারল না। আমি নিজেকে বললাম, 'এসব অদ্ভুত ব্যাপার কেন আমার মধ্যে জাগছে? আমার শরীর হারিয়ে গেছে।' সেই যে শরীর চলে গেল, আর কোনওদিন ফিরল না।

তাঁর শরীরের মধ্যে যা আছে তা হল শুধু স্পর্শানুভূতি, আর কিছুই না; কারণ তাঁর দৃষ্টির অনুভূতির সঙ্গে স্পর্শের অনুভূতির কোনও যোগাযোগ নেই বা কোনও সম্পর্ক নেই। সুতরাং তাঁর পক্ষে তাঁর নিজের শরীরের প্রতিমূর্তি গড়া সম্ভবপর হয় না, যেখানে কোনও স্পর্শ নেই সে জায়গা তাঁর চেতনায় আসে না।

শেষ পর্যন্ত সাতদিনের দিন, ইউ জী তখন সেই সোফাতেই শুয়ে ছিলেন। 'সংযোগবিহীন মনের অবস্থা' আনন্দের সঙ্গে অনুভব করছেন। ভ্যালেন্টাইন মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে আসছেন, ইউ জী দেখে চিনতে পারছেন যে তিনি ভ্যালেন্টাইন। যেই ভ্যালেন্টাইন ঘরের বাইরে চলে যান, ব্যস আবার শূন্যতা, কোনও কিছু নেই। মনে মনে ভাবলেন, 'এ আবার কি? আমার পক্ষে ভ্যালেন্টাইনকে কেমন দেখতে সেটাই মনে আনা সম্ভব হচ্ছে না।' রান্নাঘর থেকে বাসনপত্রের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ শুনে আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'আমার ভেতর কেন এসব শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে? কিন্তু ঠিকমতো বুঝতে পারতাম না কোথা থেকে আওয়াজ আসছে।' অবশেষে তিনি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর ভেতরে তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে যোগাযোগ করার মতো কেউ নেই। সমন্বয়সাধনকারী 'স্বয়ং' অদৃশ্য হয়ে গেছে। তারপর যা ঘটেছিল ...

> আমার ভেতরে যেন কিছু হচ্ছে বলে আমি অনুভব করতে লাগলাম। সমস্ত জীবনশক্তি ধীরে ধীরে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে এক বিন্দুতে এসে জড়ো হতে লাগল। নিজেকে বললাম, 'তুমি এখন জীবনের অন্তিম সময়ে এসে গেছ। তোমার এবার মৃত্যু ঘটবে।' ভ্যালেন্টাইনকে ডেকে বললাম, ''আমার মৃত্যু আসন্ন, ভ্যালেন্টাইন। আপনাকে আমার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হবে। জীববিজ্ঞানীদের আমার দেহটা দান করলেও করতে পারেন। তাঁরা হয়তো কোনও কাজে লাগাতে পারবে। আমি শবদাহ বা কবর দেওয়া কোনওটাতেই বিশ্বাস করি না। আপনার নিজের সুবিধা ও সুস্থতার জন্যই এই দেহটাকে কিছু একটা করতে হবে, না হলে কয়েকদিন পরে পচন ধরে দুর্গন্ধ বেরোবে। সেক্ষেত্রে আগে থেকেই দান করা ভালো, তাই না?'' ভ্যালেন্টাইন ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ''ইউ জী, আপনি একজন বিদেশি। সুইজারল্যান্ডের

> সরকার আপনার দেহ গ্রহণ করবে না। চুপ করে থেকে এসব কিছু ভুলে যাবার চেষ্টা করুন।''

জীবনশক্তির সেই ভয়ার্ত আন্দোলন শেষ পর্যন্ত এক বিন্দুতে এসে থেমে গেল। ভ্যালেন্টাইনের বিছানাটা খালি পড়ে ছিল। ইউ জী কোনওরকমে নিজেকে বিছানার উপর টেনে আনলেন, শুয়ে পড়লেন মৃত্যুর অপেক্ষায়। ভ্যালেন্টাইন পুরো ব্যাপারটা উপেক্ষা করে বাইরের কাজে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে যাবার আগে তিনি ইউ জী–কে বললেন, ''একদিন আপনি বললেন আমার মধ্যে অমুকটা পালটে গেছে, পরের দিন বললেন আর একটা কি যেন বদলে গেছে। তৃতীয় দিন আর নতুন একটা কিছু। এসব কি হচ্ছে? আর এখন বলছেন যে মৃত্যু পথযাত্রী! আপনার মৃত্যুর কোনও লক্ষণ নেই। খুব সুস্থ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে, আপনি ঠিক আছেন।'' বলতে বলতে ভ্যালেন্টাইন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইউ জী তাঁর কাহিনি বলতে থাকলেন ঃ

> একটা সময় এসে গেল যখন মনে হল ক্যামেরা তাঁর অ্যাপার্চার বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এটাই একমাত্র তুলনা যেটা আমার মাথায় আসছে। আমি এখন ঘটনাটা যেভাবে বর্ণনা করছি সত্যি তখন যা ঘটেছিল তা অবশ্যই অনেক আলাদা, কারণ সেই সময় কেউ সেখানে এসব জিনিস চিন্তা করছিল না। অবশ্যই সেই সময় যা ঘটেছিল তা আমার অভিজ্ঞতার এক অংশ, তা না হলে আমি আপনাদের এসব বলছি কীভাবে। সে যাই হোক, ক্যামেরার অ্যাপার্চার বন্ধ হতে চাইছে আর আমার ভেতর থেকে কিছু একটা সেই অ্যাপার্চার খুলে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে সমস্ত রকমের ইচ্ছাশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। সেই কোনওরকমে চোখের পাতা মেলে রাখার প্রচেষ্টাটুকুও ফুরিয়ে গেল। হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল, আলোর শেষ রেশটুকু নিভে গেল। এরপর কি হয়েছিল তা জানি না।

এই প্রক্রিয়া চলেছিল প্রায় উনপঞ্চাশ মিনিট ধরে – মৃত্যুর প্রক্রিয়া। সম্পূর্ণ শারীরিক মৃত্যু এবং ইউ জী বলেন যে এখনও নিয়মিত এসব ঘটে তাঁর মধ্যে ঃ

> আমার হাত পা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যায়, শরীর শক্ত হয়ে যায়,

> হৃদস্পন্দন কমতে থাকে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মন্দ হতে থাকে, তারপর শ্বাস নেবার জন্য ভেতর থেকে আকুতি জাগে যেন বাতাস ফুরিয়ে এসেছে। সেই সময় অবধি আমি উপস্থিত থাকি। তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কোথায় হারিয়ে যাই। এরপর কি হয় কেউ জানে না।

ইউ জী যখন এ অবস্থা থেকে ফিরে আসেন, তখন গৃহকর্ত্রী জানালেন যে, তাঁর ফোন এসেছে। ইউ জী কোনওরকমে মাতালের মতন নিচে নেমে এলেন ফোনের উত্তর দিতে। তিনি কিছুই জানেন না কি হয়েছে তাঁর। সম্পূর্ণ শারীরিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উঠে এসেছেন তিনি। কি তাঁকে আবার ফিরিয়ে এনেছে এই জীবনের মধ্যে তাও তিনি জানেন না। কতক্ষণই বা তিনি ওই অবস্থার মধ্যে ছিলেন তাও তিনি জানেন না। ''আমি সেই সময়ের কথা বা অবস্থার কথা কিছুই বলতে পারব না, কারণ যে সত্তার অভিজ্ঞতা হয় সেই সত্তাই সেখানে ছিল না। শেষ হয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করার মতো কেউ সেখানে ছিল না ...''

ডাগলাস রোজেস্টাইন যে এই সমস্ত ঘটনার, যাকে সবাই বলে 'ক্যালামিটি' অর্থাৎ বিপত্তির প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁর উদ্ধৃতি খুবই সময়োপযোগী বলে মনে হবে। কারমেলে আসার আগে তিনি যা লিখেছিলেন তার এক অংশ উল্লেখ করছি। বাদবাকি তিনি আমার ক্যামেরার সামনে বিবরণ দিয়েছেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর উপর আমার দারুণ হিংসা হয়েছিল। এখানে এরকম একজন লোক আছেন যিনি বলতে পারেন যে ইউ জী-র জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনার তিনি সাক্ষী।

> আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে আমি এক অতি দুর্লভ পরিবর্তনের সাক্ষী, হয়তো বা একমাত্র সত্যিকারের রূপান্তর – একজন সাধারণ লোকের মৃত্যু বা পুণর্জন্মের প্রত্যক্ষদর্শী। ইউ জী সত্যই একজন সাধারণ লোক, কোনও ঈশ্বর মানব বা ঈশ্বর নির্বাচিত কেউ অথবা কোনও বিশ্ব শিক্ষক নন। ১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমার জীবনে এই অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় যখন আমি সানেন উপত্যকায় জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতা শুনতে আসি। আমি নদীর ধারে বন্ধুদের সঙ্গে তাঁবু পেতেছি, সেই সময় একদিন আমার এক বন্ধু এসে জানাল

যে, সে নাকি একজন অদ্ভুত ধরনের ভারতীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। বন্ধু আমাকে ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিল; ভদ্রলোক সানেন গ্রামের তিনশো বছরের পুরানো 'স্যালে পিফিনেগ' যার অর্থ 'জোরালো বাতাস' নামে পাহাড়ের উপর অবস্থিত এক বাড়িতে থাকেন।

আমার সেদিনের কথা এখনও পরিষ্কার মনে আছে, যখন প্রথমবার আমি ইউ জী–কে দেখি। তিনি হলেন আমার দেখা প্রথম ভারতীয় ব্যক্তি। ইউ জী তখন একজন মার্কিন সঙ্গীতজ্ঞের (যিনি সানেন গির্জায় অর্গান বাজান) সঙ্গে উচ্চস্বরে তর্কালাপ করছিলেন। তখন জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তিকে সর্বসাধারণের সমক্ষে অভিযুক্ত করছিলেন। আমি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতা শুনেছি এবং আমার খুব ভালো লেগেছিল। প্রথমবার ইউ জী–র কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল তিনি সম্পূর্ণ বেসুরো লোক। কিন্তু তর্কের মধ্যে নাক গলাতে ইচ্ছা হয়নি তখন। চুপচাপ বসে বসে দেখলাম উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। আমার বিচার শক্তির বাইরে কিছু একটা ইউ জী–র প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। যদিও আমার বুদ্ধিমত্তা রীতিমতো আহত হয়েছিল। কিন্তু তবুও আমি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়েছিলাম। সেই বুদ্ধির যুদ্ধ বহু বছর ধরে চলেছিল ...। যাই হোক সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার।

১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মে যা হচ্ছিল তাকে আমি পরবর্তী ঘটনার সূচনামূলক প্রস্তুতি বলে মনে করি। সে বছর অনেকবার আমি ইউ জী–র সঙ্গে খাওয়া–দাওয়া করেছি। ইউ জী এবং ভ্যালেন্টাইন আমাদের তাঁবুতে আসতেন মাঝে মাঝে, আর সবাই মিলে রান্নাবান্না করে খেতাম। 'স্যালে পিফিনেগে' সে সময় যে সব আলোচনা হত ও খাওয়া–দাওয়া হত, তাকে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছিল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণীয় দিনগুলো। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতা শুনে ফেরার পর সবাই মিলে বসে দুর্বোধ্য আলোচনার ব্যাখ্যা করতাম। ইউ জী এক নিঃশ্বাসে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির দর্শনকে

চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতেন, আবার পরমুহূর্তেই তাঁর প্রশংসা করতেন। এভাবেই কেটে গেল গ্রীষ্মকাল; ইউ জী এবং কৃষ্ণমূর্তি দু'জনেই আমাকে উৎসাহিত করলেন ভারতে গিয়ে যোগসাধনা করতে।

ভারত থেকে ফেরার পর আবার গ্রীষ্মকালে স্যানেনে এসে হাজির হলাম। মনে হল ইউ জী ঠিক আগের মতনই আছেন। শুধু জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির দর্শনের উপর তাঁর আক্রমণের তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতাম বক্তৃতা শুরুর আগে তিনি একা একা দাঁড়িয়ে আছেন। কোনও কিছুতে পরিপূর্ণ নিমগ্ন, আর অন্যরা সবাই সামাজিকতায় ব্যস্ত।

বক্তৃতা আগস্ট মাসের মাঝামাঝি শেষ হতেই জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি সবাইকে অবাক করে, আরও বক্তৃতা দেবেন বলে ঘোষণা করলেন। বক্তৃতার শেষ দিনে আবার ইউ জী-কে দেখলাম। দেখে মনে হল তিনি কৃষ্ণমূর্তির বক্তৃতার ব্যাপারে কোনও রকমেই জড়িত নন। পরের দিন আমি ভ্যালেন্টাইন ও ইউ জী-র সঙ্গে খেতে খেতে ইউ জী-র মুখে শুনলাম গতকালের কাহিনি, সোফায় শুয়ে তাঁর মনে হয়েছিল যে তাঁর শরীর অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভ্যালেন্টাইনও স্বীকার করল যে গতকালের পাগলামির এসব ঘটনা সব সত্যি। আমারা খেতে খেতেই এসব আলোচনা চালাচ্ছিলাম। ইউ জী বর্ণনা করছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা, শরীরের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন কি মনে হচ্ছে? আপনার শরীর কি আপনার কাছে বর্তমান?' যে কর্তৃত্বের সঙ্গে ইউ জী সেদিন উত্তর দিয়েছিলেন, সে জিনিস আমি এর আগে কোনওদিন কারোর মধ্যে দেখিনি। বলে উঠলেন, 'না, এ শরীর চিরকালের জন্য চলে গেছে। আর ফিরে আসা সম্ভব নয়।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করে আপনি এ ব্যাপারে এত সুনিশ্চিত?' সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ভাষাকে অতীতকাল থেকে বর্তমান কালে ফিরিয়ে আনলেন, তারপর থেকে ২৫ বছর কেটে গেছে, আজ পর্যন্ত কোনওদিন আমি তাঁকে শরীরের প্রক্রিয়া

সম্পর্কে বর্ণনা করার ব্যাপারে অতীতকাল ব্যবহার করতে শুনিনি। সেদিন আমি গেস্টাডে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম। বিকেল গড়িয়ে সবে সন্ধ্যা হয়েছে। দিগন্তে চাঁদ সবে হালকাভাবে ভেসে উঠেছে। হঠাৎ কিছু একটা যেন ইউ জী–কে 'স্যালে পিফিনেগে' ফোন করার কথা বলল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম। ঘরের কর্ত্রী উত্তর দিলেন, আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম তাঁর চিৎকার, 'ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি আপনার ফোন।' ভ্যালেন্টাইন ফোনের উত্তর দিতে এলেন, তাঁর স্বরে ভীষণ দুশ্চিন্তার সুর অনুভব করলাম, 'ইউ জী–র কিছু একটা হয়েছে। তাঁর শরীর নড়াচড়া করছে না। ভয় হচ্ছে কোনও সর্বনাশ না হয়ে যায়।' আমি বললাম, 'যান ইউ জী–কে ডাকুন, আমি কথা বলতে চাই।' ভ্যালেন্টাইন বললেন, 'আমার মনে হয় না তাঁর ফোনে আসার সামর্থ আছে বলে।' আমি জোরাজুরি করতে ইউ জী অবশেষে কথা বলতে এলেন; তাঁর স্বর শুনে মনে হল যেন বহুদূর থেকে কথা বলছেন। তিনি বললেন, 'ডাগলাস রোজেনস্টাইন একবার এসে দেখুন কি হচ্ছে আমার মধ্যে।' মনে হল যেন মৃত ব্যক্তিকে দেখার নিমন্ত্রণ পেলাম এবং দৌড় লাগালাম। তখন এই দু'জায়গার মধ্যে ট্রেন চলত না। গেস্টাডের থেকে স্যানেন মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। স্যালে পিফিনেগে আমরা ঢুকে সোজা উপরে চলে গেলাম ইউ জী–কে দেখতে। সেই দৃশ্য আমার আজও পরিষ্কারভাবে মনে আছে। ভ্যালেন্টাইন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। ইউ জী সোফায় পড়ে আছেন যেন সব শেষ। ইউ জী–র দেহ যোগের ভাষায় ধনুরাসনের আকার ধারণ করেছে। ততক্ষণ পূর্ণিমার চাঁদ পাহাড়ের শিখর অতিক্রম করেছে। আমি ইউ জী–কে বললাম একবার জানালায় এসে চাঁদ দেখে যান। তিনি অবশেষে উঠে এলেন। আজও ভুলতে পারছি না, তিনি যেভাবে চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। যেন অদ্ভুত কিছু ঘটছে সেই চাঁদের মধ্যে। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না?' তিনি বললেন,

'যা ঘটেছে তার নাম শেষ মৃত্যু।'

অধ্যাপক নারায়ণ মূর্তি যিনি এতক্ষণ ধরে ডাগলাসের বর্ণনা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, 'আপনি কি বলতে চান যে তিনি বলেছিলেন তাঁর শেষ মৃত্যু ঘটতে চলেছে?' ডাগলাস উত্তর দিলেন, 'না না মৃত্যু হয়ে গেছে, ইউ জী বলেছিলেন যে, সেই দূরভাষের ডাক অর্থাৎ ফোন কল তাঁকে সেখান থেকে ফিরিয়ে এনেছিল।' মূর্তি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার তখন কি মনে হয়েছিল, ডাগলাস?' 'আমার ভীষণ আনন্দ হয়েছিল, তাঁর ফিরে আসার জন্য আমি দারুণ খুশি।' 'লক্ষ্য করার মতন কি কোনও পরিবর্তন ছিল তাঁর মধ্যে' জিজ্ঞাসা করলাম আমি। 'তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আমি কোনও পরিবর্তন দেখতে পাইনি। তিনি আগে যেমন ছিলেন, পরবর্তীকালেও সেই একই রকম রয়ে গেলেন, এক অসাধারণ দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর মধ্যে কোনওরকমের দুশ্চিন্তার লেশমাত্র ছিল না। যেন ভেতর থেকে সমস্ত রকমের সন্দেহ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ একই ধরনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথাবার্তা। তখন তিনি আমায় যে কথাটা বলেছিলেন সেটা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না, এত বছর ধরে তা আমার মধ্যে রয়ে গেছে।' তিনি বলেছিলেন, ''ডাগলাস, একটা কথা আমি নিশ্চিতভাবে জেনেছি – সমস্ত রকমের খোঁজখবর ভেতর থেকে সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবার পরই কোনও কিছুর বিকাশ সম্ভব।''

মিলভ্যালি ছেড়ে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ডাগলাস ইউ জী-র সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্য আমাদের সবাইকে জানান ঃ

> এই পৃথিবীর বুকে আজ পর্যন্ত যত ধ্বংসাত্মক মানুষ পা রেখেছেন ইউ জী হলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই সমস্ত ধার্মিক শিক্ষকদের থেকেও অনেক অনেক বেশি, যাঁদের মানুষ গত ২৬০০ বছর ধরে দিশাহীনভাবে অনুসরণ করে চলেছে। হ্যাঁ, এমনকী আমি বুদ্ধদেবকেও এই তালিকায় রেখেছি। তাঁর ধ্বংসাত্মক আক্রমণ এমন পরিপূর্ণ যে বেশিরভাগ মানুষের পক্ষে তা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর। সমস্ত মহান ও পবিত্র জিনিস যা আপনি বিশ্বাস করেন, সমস্ত ধারণা যার উপর আপনার ভরসা আছে, যা আপনি আশা করতে পারেন – আপনার নিজেকে টিকিয়ে রাখার

বাসনা – আপনার পরিবার, সমাজ, সভ্যতা সমস্ত কিছু চলে যাবে। আর কোনওদিন কোনও কিছুর উপর আপনার বিশ্বাস থাকবে না। কোনও কিছু অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে না, আর যখন এ সবকিছুই অর্থহীন বলে মনে হবে, হয়তো তখন আপনার দ্বারা কিছু করা সম্ভব হবে। সেদিন হয়তো শুনতে পাবেন ইউ জী কি বলার চেষ্টা করছেন ... তার জন্য চাই অদম্য সাহস।

ঃঃ – ঃঃ

পরবর্তী ফল

"প্রতিটি মানুষ তার অনুপম বিশেষত্বকে প্রকাশ করতে না পারার কারণ হল অপরের অভিজ্ঞতার প্রবল প্রভাবে সে জর্জরিত হয়ে আছে।"

– ইউ জী

১৯৬৭ সালের গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি তাঁর জীবনে যে ঘটনা ঘটেছিল তাকে ইউ জী 'বিপত্তি' বলে অভিহিত করেন।

> আমি এই ঘটনাকে বিপত্তি বলি তার কারণ হল, যে সমস্ত লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জাতীয় ঘটনাকে অসাধারণ, পরম সুখকর, আনন্দঘন, প্রেম উদ্রেককারী ভাবাবেশের অন্তিম উচ্ছাস বলে মনে হয়, তাদের আমি জানাতে চাই যে এটা এক নিদারুণ শারীরিক যন্ত্রণা। আমার কাছে অবশ্য এটা কোনও বিপত্তি নয়, কিন্তু যারা মনে মনে কল্পনা করছেন যে, দারুণ কিছু একটা ঘটেছে তাদের কাছে এটা চরম বিপত্তি; আমি কোনওদিন নিজেকে বা অন্য কাউকে একথা বলতে পারব না যে আমার জ্ঞানালোক প্রাপ্তি বা ঈশ্বর লাভ হয়েছে, আমি মুক্ত মানুষ বা মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমার জন্ম বা আমিই মানবজাতিকে মুক্ত করব।

আটদিন পরে তিনি যখন সোফায় বসেছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন ঃ

> ... মনে হল আমার ভেতর থেকে অসামান্য শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটছে – সেই অসম্ভব শক্তির প্রকোপে আমার শরীর থরথর করে কাঁপতে

> লাগল, তারপর শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সোফা, পুরো স্যালে সহ সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম যে এই আন্দোলন কারোর নিজের পক্ষে সৃষ্টি করা অসম্ভব। কোথায় যে সেই কম্পনের উৎস, বাইরে না ভেতরে, নিচ থেকে আসছে না উপর থেকে আসছে, কিছুই বুঝতে পারলাম না। এইভাবে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই কম্পন আমি কোনওভাবেই থামাতে পারলাম না, অসহায়ভাবে সব সহ্য করতে হল, বেশ কয়েকদিন ধরে এভাবেই চলল।

তিনদিন ধরে ইউ জী বিছানায় পড়ে রইলেন। যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে তাঁর সমস্ত শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছিল। তাঁর কথা অনুযায়ী সেই ব্যথা যেন সমস্ত কোষে কোষে অনুভূত হয়েছিল। আর এই ধরনের শক্তির বহিঃপ্রকাশ মাঝে মাঝে ঘটতে লাগল পরবর্তী ছ'মাস ধরে। যখনই তিনি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

> এসব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া, রীতিমতো শারীরিক যন্ত্রণা এবং এর নিজস্ব একটা রূপ ও আকার আছে। এ যেন দু'কূল ছাপানো নদী, যে শক্তির প্রবাহ ঘটেছে তার শারীরিক সীমার ব্যাপারে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই; যেন এ যন্ত্রণাকে সে গ্রাহ্যই করে না। তার নিজের প্রচণ্ড ভরবেগ হল তার বিশেষত্ব। এটা কোনও ভাবোচ্ছ্বাস বা পরমানন্দের ব্যাপার নয়। সেই সব আবেগভরা কবিতা পুরো পাগলের প্রলাপ।

ইউ জী–র ব্যাখ্যা হল এইরকম ঃ চিন্তাশক্তি তাঁর অস্তিত্বকে অসাধারণ চাপের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করত আর যেই মুহূর্তে সেই নিয়ন্ত্রণ রহিত হয়ে যায় – তাঁর সমস্ত শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এমনকী যেভাবে তিনি হাত নাড়েন সেটাও অদ্ভুতভাবে বদলে গেল। হাতের তালু পেছন দিকে চলে গেল। ''লোকে বলে আমার হাতের ভঙ্গিমা নাকি 'মুদ্রা'র মতো।''

তাঁর শরীরের হরমোন সম্পর্কিত পরিবর্তন সেই সময় লক্ষ্য করা যায়। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে তিনি পুরুষ না মহিলা। হঠাৎ বাঁ দিকের বুক স্তনের মতো ফুলে উঠেছিল। তিন বছর ধরে নানারকম পরিবর্তনের পর তাঁর শরীর অবশেষে এক নতুন নিজস্ব ছন্দে কাজ করতে লাগল।

ইউ জী সবসময় বলেন যে, পৃথিবীর কাছে তাঁর এই ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়া বর্ণনার ফলাফল হয়তো খারাপও হতে পারে। এসব জিনিস পড়ার সাঙ্ঘাতিক কুফল হল, মানুষ চেষ্টা করে তাঁর এই বহিঃপ্রকাশকে নকল করার। মানুষের প্রবণতা হল নিজেদের দেহের মধ্যে এসব বহিঃপ্রকাশের লক্ষণকে কৃত্রিমভাবে আরোপ করা আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করা যে দারুণ কিছু ঘটছে তাঁদের মধ্যে।

ইউ জী-র বন্ধুবান্ধবরা লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর পেটে, গলায় এবং মাথায় যেখানে যেখানে কুণ্ডলিনী চক্র আছে বলে সবাই জানি, সেসব জায়গাও ফুলে উঠেছে। সেই বিভিন্ন আকারের ও রং-এর ফোলা দাগগুলো নিয়মিত জেগে উঠত আবার মিলিয়ে যেত। তাঁর তলপেটে চুরুটের মতো কয়েকটা দাগ জেগে উঠল। নাভির একটু উপরে বাদামের আকারে শক্ত হয়ে ফুলে উঠল। বুকের মাঝখানে গোল মেডেলের মতো বেশ বড় আকারে নীল হয়ে ফুলে উঠল এবং ঠিক তার একটু উপরে গলার কাছাকাছি ছোট মেডেলের আকারে বাদামি লাল রং-এর ফোলা দাগ জেগে উঠল। এই দু'টো রঙিন মেডেল যেন গলার চতুর্দিকে রং-বেরংয়ের ফুলে ওঠা নেকলেশ থেকে ঝুলছিল, ঠিক যেরকম হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিতে দেখা যায়। আরও বেশ কিছু সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল, ইউ জী-র গলা এমনভাবে ফুলে উঠেছিল, দেখে মনে হতো তাঁর চিবুক যেন গোখরো সাপের ফনার উপর ভর দিয়ে আছে, যেরকম শিবমূর্তিতে দেখা যায়। নাকের উপর কপালের ঠিক মাঝখানে সাদা পদ্মের আকারে ফুলে উঠল। সারা মাথায় বিভিন্ন জায়গায় এমনভাবে ফুলে উঠল, যেন মনে হচ্ছিল বুদ্ধমূর্তির কারুকাজ। মোসেজের (ইহুদি ধর্মশিক্ষক যিনি 'টেন কমান্ডমেন্ডস' পেয়েছিলেন) মাথায় এবং কোনও কোনও 'তাও অতীন্দ্রিয়বাদীর' মাথায় শোনা যায় শিং-এর আকারে ফোলা দাগ দেখা যেত, ঠিক সেরকম ইউ জী-র মাথার দু'পাশে শক্ত হয়ে ফুলে উঠত আবার মিলিয়ে যেত। গলার শিরা ও ধমনী নীল হয়ে সাপের মতো ফুলে ফুলে মাথায় উঠে যেত।

ইউ জী বলেন, চারদিকের সমস্ত রকম ঘটনা তাঁর শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। তাঁর কথায় ঃ

> বাইরে যা কিছু ঘটছে ভিতরেও তা সবই ঘটছে ... একেই বলে শারীরিক প্রতিবেদন, একেই বলে স্নেহ। আপনি একে রোধ করতে পারবেন না। তার কারণ হল, যে ঢাল মানুষের মধ্যে থাকে তা

> আমার মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে; ফলে বাইরের সমস্ত ঘটনায় আমি অসহায়ভাবে জড়িয়ে পড়ি।

বিভিন্ন চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ইউ জী জানতে পারলেন যে শরীরের 'নিশ্ছিদ্র' গ্ল্যান্ডগুলো ঠিক সেখানে সেখানে অবস্থিত, যেখানে হিন্দুরা চক্রের অবস্থান বলে ব্যাখ্যা করেছেন। থাইমাস গ্ল্যান্ড নাকি বাচ্চাদের দেহে অত্যন্ত সক্রিয়, এবং সে কারণেই হয়তো শিশুদের সহানুভূতি অত্যন্ত অসাধারণ। বয়ঃসন্ধিক্ষণের পরবর্তীকালে সেই গ্ল্যান্ড ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, বৈজ্ঞানিকরা সেরকমই বলেন। যখন দেহে এই ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে, যাকে শাস্ত্রে বলে পুনরায় জন্মলাভ করা, তখন আবার সমস্ত গ্ল্যান্ডগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে যার ফলে দেহের অনুভূতি অস্বাভাবিকতা লাভ করে।

মানুষের অনুভূতি চিন্তার মধ্য দিয়ে জাগে না বা কোনও অভিমানের মধ্য দিয়েও নয়; হঠাৎ হয়তো কারোর উপর আপনার দারুণ সহানুভূতি জাগল। কেউ যদি আমার সামনে আঘাত পায়, সেই আঘাত আমার ভেতরে অনুভূত হয় – ব্যথা জাগে না কিন্তু গভীর অনুভূতি জাগে। আপনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বলে ওঠেন 'আঃ'।

ইউ জী-র জীবনে এরকম একটা ঘটনা উপরোক্ত আলোচনাকে বোঝাতে সাহায্য করবে। দক্ষিণ ভারতের এক কফি বাগানে তিনি কিছুদিন থাকবার জন্য এসেছেন। কফি বাগানে তখন কোনও এক মহিলা কর্মচারী কোনও কারণে তার ছেলেকে খুব মারধর করছিল। ভদ্রমহিলা বাচ্চাটিকে এমন জোরে মেরেছিল যে ছেলেটা প্রায় নীল হয়ে গিয়েছিল। তখন একজন ইউ জী-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কেন বাধা দিলেন না?' ইউ জী উত্তরে বললেন, 'আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কার উপর করুণা দেখাই, মা না ছেলে?' মা ও ছেলে দু'জনেই এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ছিল; মা তার রাগ সংবরণ করতে পারছিল না আর ছেলেটি পুরো অসহায়। আমি দেখলাম আমার পিঠেও একই রকম দাগ জেগে উঠেছে, যেখানে যেখানে বাচ্চাটা মার খেয়েছে। আমিও সে ঘটনার সামনে উপস্থিত থাকায় শাস্তি পেলাম। ইউ জী বলেন যে, এই ধরনের ঘটনা সম্ভব, তার কারণ হল, চেতনা এখানে অবিভাজ্য হয়ে গেছে। আর যখন অনুভূতি এই অবস্থায় আসে, তখন কারও সম্পর্কে বিচার করা আর সম্ভব হয় না।

আর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক ঃ সত্তরের দশকের মাঝামাঝি ইউ

জী তখন উত্তর গোয়ার এক পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণ করছিলেন। মুম্বই-এর অনেক বন্ধু তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। একদিন সকালবেলা একদল লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সবাই মিলে একটা ছোট পাহাড়ের পাদদেশে এসে জমায়েত হলেন। ভ্যালেন্টাইনও এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গ দিতে। কিন্তু যখন দেখলেন যে পাহাড়ের রাস্তা খুবই খাড়া এবং পিচ্ছিল তখন তিনি ঠিক করলেন যে ফিরে যাবেন। সেই সময় সবার মধ্যে আলোচনা হল যে, যদি ভ্যালেন্টাইন পড়ে যান তাহলে কে কি করবে। ইউ জী কোনও কথাই বললেন না। কিছুক্ষণ পর ভ্যালেন্টাইন ঠিক করলেন যে তিনিও তাঁদের সঙ্গে নিচে নামবেন। নিচে নামতে নামতে সত্যি সত্যিই ভ্যালেন্টাইন পা পিছলে পড়ে গেলেন, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারলেন না; কেউ উঠে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে পারলেন না, এমনকী যিনি তাঁর পেছনে ছিলেন তিনিও না। ইউ জী তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন যে, যদিও প্রত্যেকে অঙ্গীকার করেছিলেন যে কিছু না কিছু করবেন, কিন্তু সত্যি যখন ঘটনা ঘটল, তখন কেউ কিছু করলেন না। তখন তাঁদের মধ্যে একজন ইউ জী-কে উলটে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু আপনি কেন কিছু করলেন না?' ইউ জী উত্তরে বললেন, ''আমি একথা বলিনি যে আমি তাঁকে সাহায্য করব। কিন্তু আপনারা যদি জানতে চান যে আমি এই ঘটনার সঙ্গে কীভাবে জড়িত ছিলাম, তাহলে নিজের চোখে দেখে নিন।'' একথা বলতে বলতেই তিনি তাঁর প্যান্ট হাঁটুর উপর উঠিয়ে দেখালেন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে দেখলেন যে তাঁর হাঁটু ভ্যালেন্টাইনের হাঁটুর মতোই ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। কেউ নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ইউ জী ধীর কণ্ঠে বললেন যে, এই ঘটনার কোনও তাৎপর্য নেই।

ইউ জী বলেন যে, 'তৃতীয় চক্ষু', যাকে শাস্ত্রে বলে আজ্ঞা চক্র, তা আসলে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড। যদি একবার চিন্তার ভার থেকে শরীর মুক্ত হয়ে যায়, তখন এই গ্ল্যান্ড শরীরকে চালায় এবং এই গ্ল্যান্ডই সমস্ত রকমের আজ্ঞা দেয় কি করতে হবে, না করতে হবে – চিন্তার কোনও উপযোগিতা থাকে না। সম্ভবত এই কারণেই একে আজ্ঞা চক্র নাম দেওয়া হয়েছে। ইউ জী আরও বলেন যে, চিন্তা আমাদেরকে ঢালের মতো ঘিরে রেখেছে, বাইরের সমস্ত কিছুর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তাই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

এখানে নিজেকে রক্ষা করার জন্য চিন্তার উপযোগ করার মতন

> যেহেতু কেউ নেই, সেহেতু চিন্তা এখানে জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। চিন্তাকে ভস্মীভূত হবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শেষ হতে হয়। চিন্তা হল এক ধরনের কম্পন, আর যখন চিন্তার আয়ণীকরণ দেহের মধ্যে ঘটতে থাকে, তখন দেহ থেকে ভস্ম জাতীয় জিনিস নির্গত হয়ে সমস্ত দেহকে ঢেকে ফেলে ... সেই সময় দেহের তাপমাত্রা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়।

ইউ জী তাঁর ক্যালামিটি বা বিপত্তিকে সর্বদা শারীরিক এবং জৈবিক ভাষায় ব্যাখ্যা করেন এই কারণে যে এর মধ্যে কোনও মনস্তাত্ত্বিক বা অতিন্দ্রীয়জনিত বা ধার্মিক ব্যাপার নেই। ইজ জী–র মতে, এই ধরনের ঘটনা আরও অনেকের নিশ্চয়ই ঘটেছে। কিন্তু এটা এমনই ঘটনা যে এর জন্য কারোর পক্ষেই কোনও প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভবপর নয়। কোনও রকমের শুদ্ধিকরণ বা তপস্যা বা সাধনা দিয়ে এ জিনিসকে ঘটানো সম্ভব নয়।

অধ্যাপক নারায়ণমূর্তি বলেন যে, যদি ইউ জী–র শিক্ষাকে এক বাক্যে সংক্ষিপ্ত করতে হয় তাহলে বাক্যটি হবে নিম্নলিখিতঃ ‘‘চেতনা এমনই বিশুদ্ধ যে আপনি কোনও কিছু করে চেতনাকে শুদ্ধ করার প্রয়াসের অর্থ হল চেতনাতে অশুদ্ধতার উপনিবেশ ঘটানো।’’ ইউ জী বলেন ঃ

> চেতনাকেও সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে যেতে হবে। এখান থেকে সমস্ত রকমের শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। কোনও কিছুর রেশ পর্যন্ত থাকবে না। যাকে আপনারা শুদ্ধ, পবিত্র বলে জানেন সে সমস্ত কিছুই এখানে আবর্জনা, অথচ আপনি সমস্ত প্রচেষ্টা করেও এ জাতীয় ঘটনা ঘটাতে পারবেন না। যদি একবার কোনও রকমে সামনের দরজা ভেঙে যায় – যদিও নিজের প্রচেষ্টায় এ কাজ অসম্ভব, তখন বাঁধের দরজাগুলো সব খুলে যায় আর ভেতরের সব কিছু বেরিয়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।
>
> এই নির্গমনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আপনার চোখের সামনে সব অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে ওঠে। হঠাৎ আপনার সমস্ত চেতনা যেন বুদ্ধ, মহাবীর, যিশু, মহম্মদ, সক্রেটিস এবং যাঁরা এ ধরনের অবস্থার মধ্যে এসেছিলেন তাঁদের মতো হয়ে যায় এবং আপনি নিজে

তাঁদের রূপ ধারণ করেন, কোনও মহান ব্যক্তি বা নেতার রূপ ধারণ করেন না। এর মধ্যে একজন 'কালো রং'-এর লোকও আছে। আবার দেখলাম নগ্ন মহিলা, খোলা স্তন ও লম্বা ছাড়া চুল। পরে জানতে পেরেছিলাম ভারতে নাকি আক্কামহাদেবী এবং লালেশ্বরী নগ্ন অবস্থায় পূজিত হতেন। হঠাৎ মনে হল নিজের স্তন জেগে উঠেছে, চুল লম্বা হয়ে গেছে, এমনকী যেন লিঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

কিন্তু তখনও চেতনা বিভক্ত, আপনিও আছেন আর সঙ্গে সেই রূপগুলো, যাতে আপনার চেতনা পরিবর্তিত হয়েছে, ধরুন বুদ্ধ বা যিশু বা ভগবান জানেন কোন সব লোক। তখন অবস্থাটা এরকম, ''আমি কি করে জানব যে আমি সেই অবস্থায় আছি?'' কিন্তু সেই বিভাজন বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না; কোথায় যেন মিলিয়ে যায় আর তার জায়গায় অন্য কিছুর আবির্ভাব ঘটে। এ ধরনের ঘটনা হয়তো প্রচুর লোকের মধ্যে ঘটেছে। এ সবই হল ইতিহাস; কত শত মুনি, ঋষি, পাশ্চাত্যের সন্ন্যাসী – কত মহিলা! সেই সমস্ত লোকেদের মধ্যে যে চেতনার উদ্ভব ঘটেছিল তা আপনার চেতনারও অংশ। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই বাক্যটা ব্যবহার করতে খুব ভালোবাসি ''সমস্ত ঋষি লাইন দিয়ে আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।'' তার কারণ হল, এখানে কোনও কিছুর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়, যে কোনও ভাবনার অস্তিত্ব এখানে অশুদ্ধতার জন্ম দেয়।

এই সমস্ত ভালো-মন্দ, পবিত্র-অপবিত্র, শুদ্ধ-অশুদ্ধ জিনিসের নির্গমন ঘটতেই হবে। তা না হলে চেতনা অশুদ্ধ আবর্জনাময় থেকে যাবে। এরপরই আপনি সেই আদি অকৃত্রিম অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন। আর একবার যদি চেতনা সেই আদি অকৃত্রিমতার সংস্পর্শে আসে নিজেই নিজের থেকে, তাহলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কিছুর পক্ষে একে ছোঁয়া সম্ভবপর হবে না, একে আর অশুদ্ধ করা যায় না। সেই সময় অবধি আপনার সমস্ত

অতীত যদিও থাকবে কিন্তু আপনার জীবনকে আর কোনওভাবে
তা প্রভাবিত করতে পারবে না।

ইউ জী–র জীবনে সেই 'বিপত্তি' ঘটে যাবার পরও তিনবছর ধরে বিভিন্ন দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠত।

তিনি বলেন যে, সেই 'বিপত্তি' ঘটার পরও সবচেয়ে বিহ্বলকর বিভ্রান্তিকর ব্যাপার হল যে, ইন্দ্রিয়গুলো যে যার তার মতো কাজ করা শুরু করেছিল। দেহের মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে যোগাযোগ করার মতো কেউ না থাকায় এসব ঘটেছে। আর এসব কিছু ভ্যালেন্টাইনের সামনে এক অভাবনীয় সমস্যার রূপ নিয়ে হাজির হল। ''আমরা হয়তো হাঁটতে বেরিয়েছি, একটা ফুলের দিকে চোখ পড়তেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওটা কি'?'' ভ্যালেন্টাইন বলল, 'একটা ফুল'।'' একটা গরুর দিকে চোখ পড়ল, জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি'?'' ছোট শিশুর মতন সবকিছু আবার শিখতে হল। ঠিক শিখতে হল তা বলব না, কারণ সমস্ত জ্ঞান পশ্চাৎপটেই ছিল। কিন্তু কখনওই সামনে আসছিল না।

আমার এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভ্যালেন্টাইন বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন – না করবেন বা কি করা দরকার। তিনি তখন জেনিভার এক প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মনস্তত্ত্ববিদ জানালেন যে রোগীকে না দেখে তাঁর পক্ষে কোনওরকম সাহায্য করা সম্ভবপর নয়। তাই ভ্যালেন্টাইনকে বললেন ইউ জী–কে জেনিভায় নিয়ে আসতে। ইউ জী আপত্তি করলেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তাঁর ভেতরে অসাধারণ কিছু ঘটেছে। ইউ জী–র পক্ষে তখন সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হল এটাই যে, যাঁরাই তাঁকে দেখতে আসতেন তাঁরা কেউ কোনওভাবেই বুঝতে পারছিলেন না যে ইউ জী–র দেহ কীভাবে কাজ করছে এবং ইউ জীও বুঝতে পারছিলেন না যে অন্য সবার দেহ কেন অন্যভাবে কাজ করছে। ''কীভাবে আমাদের পক্ষে কোনও আলোচনা চালানো সম্ভব? আমাদের মধ্যে আলোচনা বন্ধ হয়ে যেত। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে বোঝানোর চেষ্টা করতাম, কিন্তু কোনও ফল হত না। একটা পাগলের সঙ্গে আমার প্রায় কোনও পার্থক্য ছিল না। সেইজন্যই আমি বলি যে এই ধরনের 'বিপত্তি' ঘটলে হয় পুরো উপরে উঠে যাবেন, নয়তো পুরো উলটে যাবেন।''

নিচে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর তুলে ধরলাম যা সাধারণত লোকে তাঁর 'বিপত্তি'

সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রশ্ন ও সেই উত্তরের মধ্য দিয়ে তিনি এ বিষয়ে কি বলতে চান সেটা দেখা যাবে;

> *প্রঃ যাঁরা এই জিনিস 'উপলব্ধি' করেছেন তাঁরা কি পরস্পরের থেকে ভিন্ন?*
>
> ইউ জীঃ হ্যাঁ, কারণ তাঁদের জীবনের পশ্চাৎপট ভিন্ন ধরনের। এই পশ্চাৎপটই একমাত্র জিনিস যা নিজেকে প্রকাশ করে। কারণ আর কিই বা আছে? আমার অভিব্যক্তি হল আমার অতীত –কীভাবে আমি সংগ্রাম করেছি, কোন পথে আমি এগিয়েছি, কীভাবে অন্য সবার পথ বর্জন করেছি এবং সেই সময় অবধি আমি বলতে পারব আমি কি করেছি আর কি করিনি ... এই ধরনের লোক সত্যিই আলাদা রকমের। শুধু আপনার থেকেই নয় – সমস্ত লোকের থেকে ভিন্ন ধরনের এমনকী তাঁদের থেকেও আলাদা যাঁরা একই অবস্থায় ছিলেন। কারণ প্রত্যেকের অতীত পুরোপুরি ভিন্ন।
>
> *প্রঃ যদিও সে সমস্ত ব্যক্তি যাঁদের মধ্যে এই ধরনের বিস্ফোরণ ঘটেছে সবাই অনন্য। কারণ তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের অতীতকে অভিব্যক্ত করেছেন কিন্তু সবার মধ্যেই এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।*
>
> ইউ জীঃ সে ব্যাপারে হয়তো আপনার মাথা ব্যথা আছে, কিন্তু আমার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি নিজেকে কখনও কারোর সঙ্গে তুলনা করি না।

ইউ জী–র 'বিপত্তি' ঘিরে যে তথ্য পাই তাকে একত্র করতে ইউ জী–র নিজের এই বক্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ

> এটুকুই পড়ে আছে সেখানে। আমার জীবনী এখানেই শেষ ... এর বেশি আর কিছুই লেখার নেই, আর কোনওদিন থাকবেও না। লোকে এসে যখন প্রশ্ন করে আমি শুধু তার উত্তর দেই, আর যদি কেউ না আসে তাতেও আমার কিছু যায় আসে না ... । মানবজাতিকে শোনানোর মতন আমার কাছে কিছুই নেই। শুধু এটুকুই বলার আছে যে, মোক্ষ বা ঈশ্বর লাভের যে সমস্ত মহান ও

> পবিত্র পথ আছে সে সবই অর্থহীন এবং আত্মসচেতনতার মধ্য দিয়ে মনের আমূল পরিবর্তন ঘটানোর সমস্ত বক্তৃতাকে আমি আবর্জনা বলে মনে করি। মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর অসম্ভব। মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থা আসতে পারবে একমাত্র সম্পূর্ণ শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে।

তাঁর শরীরের মধ্যে অভাবনীয় সব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। ইউ জী তাঁর এসব পরিবর্তনের ঘটনায় এমনই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে 'বিপত্তি'র পর একবছর তিনি কোনওরকম কথাই প্রায় বলেননি। তাঁর ব্যক্তিত্ব এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল যে, তাঁকে সবকিছু আবার নতুন করে শিখতে হয়েছিল। এক বছরের মধ্যে তিনি তাঁর কথাবার্তা বলার সমস্ত ক্ষমতা প্রায় পুনরুদ্ধার করেন। তবুও এই ব্যাপারে তিনি বিশেষ কিছুই বলতেন না। 'এই ধরনের ঘটনার পর বলার আর কি–ই বা থাকতে পারে', তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন নিজের মধ্যেই প্রশ্নের উত্তর জ্বলে উঠল, 'আমি যা কিছু ঠিক বলে মনে করি, পুরোপুরি সেটাই বলব।' সেই প্রথম এক বছর বাদ দিয়ে, তারপর থেকে আজ অবধি তিনি সমানে লোকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন, একাজে তাঁর কোনও ক্লান্তি নেই। এখন ইউ জী বলেন ঃ

> আমি জানতাম না আমার মধ্যে কি হচ্ছিল। আমার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করার কোনও কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। কোনও একভাবে আমার মৃত্যু ঘটে এবং অতীতের সমস্ত ভার মুক্ত হয়ে আবার জীবন ফিরে পাই। এ ঘটনা ঘটেছে কোনও রকম প্রচেষ্টা ছাড়াই এবং আমার ধার্মিক পশ্চাৎপটকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে। সেটাই হল এ ঘটনার অলৌকিকত্ব। এই জিনিসকে কখনও আদর্শ বলে গণ্য করা যায় না এবং অন্যের পক্ষে একে অনুকরণ করা অসম্ভব।

ঃঃ – ঃঃ

পরের বছরগুলো

“যান্ত্রিকভাবে আমাদের পক্ষে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত মানুষ তৈরি করা অসম্ভব।”

– ইউ জী

গত কয়েকদিন ধরে বারবার আমার মধ্যে এই ভাবনাটা জেগে উঠছে যে আমি শুধু শুধু ‘ইউ জী’ নামের এই অসম্ভব সমস্যার সমাধান করার জন্য সময় নষ্ট করছি। ভোরের নিস্তব্ধতায় আমারই হতাশা আমার ভেতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অন্ধকার ঘরে সূর্যের আলো আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ইউ জী–র জীবনকে রূপ দেওয়ার অক্ষমতা আমার কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ‘তুমি আমাকে জানো না। তুমি ভাবছো তুমি আমাকে জানো।’ ইউ জী দূরভাষের অপর প্রান্তের ব্যক্তিকে এই কথাগুলো পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য আমার মধ্যে বারুদসহ গোলার মতো প্রবেশ করে গেল আর কোনওকিছু ভাবার আগেই আমার আন্তরিকভাবে ইউ জী–কে বোঝার দাবিকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চুরমার করে দিল। এই জীবনী লেখার পেছনে অন্তহীন সময় কাটানো সত্ত্বেও মনে হচ্ছে যেন এই ব্যক্তি ও তাঁর জীবনকে ঠিকভাবে তুলে ধরার যে লক্ষ্য আমি স্থির করেছিলাম, তার থেকে আমি বহুদূরেই পড়ে আছি। ইকারাসের পৌরাণিক গল্পকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে পরাজয়কে রোমাঞ্চকর করার কৌশল বা হাতিয়ার এক জিনিস, আর নিজের আত্মসম্মানের জ্বলেপুড়ে যাওয়া অবশিষ্টাংশের দিকে তাকিয়ে থাকার আঘাত সহ্য করা এবং ভালোভাবেই জানা যে এর কোনও আধ্যাত্মিক ফল নেই তা হল সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

কোনও কিছু খোঁজার অভিযানমূলক গল্পে সাধারণত মুখ্য ভূমিকার একজন

এক বস্তুর সন্ধানে, এক জ্ঞানের সন্ধানে বা কোনও কর্ম সম্পন্ন করার জন্য যাত্রা শুরু করেন। পথের নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে, নিজের জীবনকে ভয়ংকর বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে সেই ব্যক্তি অবশেষে কোনও এক স্থানে উপনীত হন বা কোনও কিছুর সন্ধান পান। কিন্তু গল্প সেখানেই শেষ হয় না। সেই বিজয়ের পর তিনি নায়ক হয়ে ঘরে ফেরেন কিছুটা পুরস্কৃত হওয়ার জন্য, কিন্তু মূলতঃ তাঁর নবলব্ধ বস্তুকে সবার মধ্যে এনে তার ফলদ্বারা বন্ধু, পরিবার, দেশ বা সমগ্র জাতিকে সমৃদ্ধ করতে, সে যে কোনও বস্তুমূলক জ্ঞান হোক বা অতীন্দ্রিয় গভীর জ্ঞান হোক না কেন।

মানবজাতির ইতিহাসে আমরা এই ধরনের বহু লোকের কাহিনি বারবার শুনেছি, যাঁরা তাঁদের অনুসন্ধানের অভিযানে সফল হয়ে ফিরে এসেছেন ও মানুষকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অমূল্য অভিজ্ঞতা দিয়ে। তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধার্মিক আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

ঊনপঞ্চাশ বছর ধরে অনুসন্ধানের পর এবং তাঁর অস্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তনের পর ইউ জী-র কাছে এমন কি আছে যা তিনি বিশ্বকে অর্পণ করতে পারেন, যে বিশ্ব অধীর আগ্রহী হয়ে কোনও কিছুর দিকে তাকিয়ে আছে যা তাকে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে? ইউ জী-কে যখনই প্রশ্ন করা হয় তাঁর 'বিপত্তি'-র ফলাফল কি, তিনি তখনই 'চিনা বাদামে'র এক কার্টুন মনে করিয়ে বলেন ঃ

আমি জানি না কেন এটা হল
বা কখন এটা হল
বা কীভাবে এটা হল
আমি এটাও জানি না যে কি হল
সত্যি সত্যি কি কিছু হয়েছিল?

এই ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বলার ব্যাপারে ভারতের এক ছোট গল্প ইউ জী-র খুব প্রিয়।

এক ছিল ছোট গ্রাম। সেই গ্রামের শেষ প্রান্তে এক পরিত্যক্ত জায়গায় বারোটি ছোট ছোট ছেলে খেলা করতে গিয়েছিল। খেলতে খেলতে তারা হঠাৎ এক বড়সড় সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তি

> আবিষ্কার করে ফেলল। হাতির মস্তকবিশিষ্ট সেই আদি ঈশ্বর, জ্ঞানের ঈশ্বর, যে ঈশ্বরমূর্তি মানুষের সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করে দেয়। সবাই আনন্দে আটখানা হয়ে সেই মূর্তির চতুর্দিকে দু'হাত তুলে নাচতে লাগল। গণেশ মূর্তির বিশাল উদরের দিকে নজর পড়তেই এক বালকের অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠল, কি আছে সেই পেটের মধ্যে। সে মূর্তির কাছে এসে নাভির মধ্যে আঙুল দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। হাতে এক তীব্র দংশনের জ্বালা অনুভূত হল। এক ঝটকায় আঙুল বের করে আনল। ব্যথায় চিৎকার করার পরিবর্তে ছেলেটি বন্ধুদের কাছে ভান করতে লাগল যে তার মধ্যে অসাধারণ কিছু হয়েছে। পাশের বন্ধুও তার পথ অনুসরণ করে গণেশের নাভিতে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করতে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল সেই তীব্র দংশনের জ্বালা। এবং একের পর এক সবাই সেই একই জিনিস অনুভব করল। কিন্তু সবশেষে কনিষ্ঠতম বালকটি আঙুল দেবার পরই চিৎকার করে উঠল, 'কাঁকড়া বিছে! কাঁকড়া বিছে' বলে। সবাই সবার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটাকে স্বীকার করে নিয়ে কান্না জুড়ে দিল।

ইউ জী হল সেই গল্পের ছোট ছেলেটির মতন, চিৎকার করে পৃথিবীকে বলার চেষ্টা করছেন যে, তিনি সেই বিছার হুল ফোটানোর তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেছেন। 'চিন্তা হল আপনার শত্রু' লেখা বইতে এই যন্ত্রণার চিৎকার শোনা যায়।

> ... আমার মধ্যে যা ঘটেছে তা আমার সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঘটেছে। আমি যা করেছি বা যা করিনি তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। 'অতীতের বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে নাকি আমি এই অবস্থায় এসেছি', লোকের এই সমস্ত ধারণার সঙ্গে আমার মধ্যে যা ঘটেছে, তার কোনও যোগাযোগ নেই। বর্তমানে আমার পক্ষে আমাকে কোনও একটা সময়কে স্থির করে একথা বলা খুবই কষ্টকর ঃ দেখ এখন তোমাকে আর তোমার অতীতের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা কর কীভাবে তুমি এই অবস্থায় এসে হাজির হলে। এই কারণেই আমি সবসময় জোর দিয়ে বলার চেষ্টা

করছি যে এই ঘটনা পুরোপুরি কার্য–কারণের বাইরে। এ যেন, আমার প্রিয় বাক্য অনুসারে, বজ্রাঘাত হওয়ার মতন। একটা কথা আমি ভালো করে জানি আর তা হল যা আমি সারা জীবন ধরে খুঁজেছিলাম, তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। জীবনের যে লক্ষ্য আমি স্থির করেছিলাম আত্ম উপলব্ধি, ঈশ্বর উপলব্ধি, মনের গভীর পরিবর্তন, সব মিথ্যা হয়ে গেল। উপলব্ধি করার কিছুই রইল না, কোনও কিছুর সন্ধান পর্যন্ত সেখানে মিলল না। কোনও কিছু থেকে মুক্ত হবার সমস্ত চাহিদা এবং শারীরিক প্রয়োজনগুলো পর্যন্ত সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল। পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। সেই কারণে আমার ভেতর থেকে এখন যা আসে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার উপর, আপনি যা কিছু এখান থেকে নিয়ে আসতে পারেন।

সত্যি কথা বলতে কি আমার মধ্যে যোগাযোগ করার মতো কিছুই নেই। কারণ কোনো পর্যায়ে কোনো রকমের যোগাযোগ আসলে কখনই সম্ভবপর নয়। আমাদের কাছে একটাই হাতিয়ার আছে আর তা হল আমাদের বুদ্ধি। আমরা অনেকভাবে দেখেছি যে এই হাতিয়ার আমাদের কোনওকিছু বোঝাতে সাহায্য করেনি। অতএব একবার যখন আপনাদের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই শস্ত্রের এখানে কোনও উপযোগ নেই এবং অন্য কোনওরকম শস্ত্র আমাদের এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে না, তখন যে হতভম্ব অবস্থার সৃষ্টি হয় তার মধ্য দিয়ে এটাই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে বোঝার মতন কিছুই নেই। সেই অর্থে আমার পক্ষে কোনও মঞ্চে বসে লোকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে কোনও কিছু বলার চেষ্টা করাই হবে অন্যায়ভাবে সুযোগ গ্রহণ করার সমান।

আমার মধ্যে যা পড়ে আছে তা আমার কাছে অত্যন্ত অসাধারণ – অসাধারণ এই কারণে যে একে কোনওরকম প্রচেষ্টা করে আমি পাইনি। প্রত্যেকটি মানুষ যা ভেবেছে, অনুভব করেছে ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তা আমার ভেতর থেকে পুরোপুরি নির্গত হয়ে গেছে। আমার কাছে অন্যকে শিক্ষা দেবার মতন কিছু নেই এবং থাকবেও

না। একে ‘শিক্ষা’ বলা চলে না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটা পদ্ধতি, কৌশল বা নতুন চিন্তাধারাকে বোঝায় যার প্রয়োগে জীবনধারায় পরিবর্তন সাধন করা যায়। কিন্তু আমি যা বলার চেষ্টা করছি তা শিক্ষা–শিক্ষণের বাইরে। আমি কীভাবে কাজ করছি এটা শুধু তারই বর্ণনা। আমি যা বলছি তা মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থার বর্ণণা মাত্র। ঠিক এইভাবেই আপনিও কাজ করেন, যখন চিন্তার প্রক্রিয়া ভেতর থেকে খসে পড়ে যায়।

আপনার প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে ধার্মিকতা, আনন্দ, সৌন্দর্যময়তা ও ভাবাবিষ্টতার কোনও সম্পর্ক নেই। ওই সমস্ত জিনিস অভিজ্ঞতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাঁরা মানুষকে শত শত বছর ধরে ধার্মিক পথে চলতে বলেছেন তাঁরাও হয়তো ওই অভিজ্ঞতাময় ধার্মিক অবস্থার মধ্যেই ছিলেন। এবং আপনার পক্ষেও এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব। সে সমস্ত অবস্থাগুলো চিন্তালব্ধ অবস্থা। তাই এইসব অবস্থা যে রকম ভাবে আসে ঠিক সেই রকমভাবেই মিলিয়ে যায় ...। যা নিরন্তর তাকে কখনই অভিজ্ঞতায় লাভ করা যায় না, তাকে বোঝা যায় না, তাকে আকারে ধরা যায় না, আর তাকে মানুষের পক্ষে রূপ দিয়ে বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেই পরিত্যক্ত রাস্তা আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। দূরে কোনও স্বর্গভূমি নেই, আপনি শুধু মরীচিকার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেন।

‘‘আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার কি কোনও লোককে তার সন্ধানের ব্যাপারে কোনওরকম সাহায্য করতে পারে না?’’ আমি ইউ জী–কে একদিন রান্নাঘরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যখন তিনি আমাকে দেখাচ্ছিলেন কীভাবে কাপড় ধোয়ার যন্ত্র সারাতে হয়। ‘‘দেখ, এখানে থাকার সময় তুমি কফি বানাতে শিখলে, পাউরুটি টোস্ট করতে শিখলে, বাসনমাজা শিখলে, কাপড় ধোয়ার যন্ত্র ব্যবহার করতে শিখলে – যা অন্য সবাই শিখতে পারে। আমার কাছ থেকে শুধু এটুকুই শেখার আছে।’’ তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন। ‘‘ইউ জী রসিকতা ছেড়ে পরিষ্কারভাবে কিছু বলুন। একাজ শেষ করার একটা সময়সীমা আছে।’’ আমি রেগে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মানুষ আপনার কাছ থেকে কি পেতে পারে?’

> আমার জীবন যাত্রা এবং আমি যা বলছি তা কোন লোককে তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করবে না। যদি তাদের মধ্যে কোনও ক্ষমতা থাকে হয়তো তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। কিন্তু এটা আধ্যাত্মিক প্রগতি বা ক্ষমতায় প্রযোজ্য নয়, কারণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলতে কোনও কিছু নেই। যদি আপনি খুনি হন তাহলে হয়তো আরও নিপুণভাবে খুন করতে পারবেন। তার মানে এই নয় যে আমি খুন করতে উদ্বুদ্ধ করছি। যা আপনার ভেতরে আছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

আমি যখন আমার জীবনের উপর দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি আমার সফলতা ও বিফলতা, আর আমার অন্তহীন ভুল কাজ। এসব কিছু থেকে এটা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আজ আমি যেখানে আছি, ইউ জী-র সাহায্য ছাড়া সেখানে থাকা কোনওদিন সম্ভব হত না। আমি যখনই ইউ জী-র সঙ্গে থাকি তখনই আমি আমার ভেতরে এক বলিষ্ঠ শক্তি প্রবাহ অনুভব করি। আমি যা কিছু বলি বা লিখি তা সেই শক্তি প্রবাহের ফল, তাঁর সংস্পর্শই হল তার উৎস। আমি কোনও মুহূর্তের জন্য একথা কখনওই ভাবি না যে আমার মধ্যে মহান কিছু আছে। তার সঙ্গে কাটানো দিনগুলো মনে হতেই আমি এক অদ্ভুত শক্তি ও প্রেরণা লাভ করি।

আমি সবসময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে সমস্ত কথা বলেন আমার কাছে তার কি মূল্য আছে? সত্যি কথা বলতে কি এর কোনও মূল্যই নেই। যদিও আমি এখন ‘একজন কেউ’ কিন্তু আমার অন্তরে আমি ভালোভাবেই জানি যে আমি একজন অত্যন্ত সাধারণ লোক; এমনই একজন যে আসলে কিছুই না। আমি সমস্ত রকমের ধর্মমত প্রয়োগ করে দেখেছি। কোনও কিছুই আমাকে স্বস্তি দিতে পারেনি। এখন আমি কোথায় যাই? ইউ জী বলেন, ‘নিজে উঠে দাঁড়ান, আর হাঁটতে শুরু করে দিন।’

তিনি যা বলেন তা মেনে নেওয়া যায় না, আর যেভাবে বলেন তা সত্যিই বৈপ্লবিক। সে কারণেই হয়তো এই ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগে না যখন বিখ্যাত দার্শনিক তাঁকে ‘কসমিক নকশালাইট’ বলে অভিহিত করেন। আজ পর্যন্ত আমি এমন কোনও লোকের সঙ্গে পরিচিত হইনি যিনি যা কিছু বলেন সে সম্পর্কে তাঁর

মত নিশ্চিত। এই নিশ্চয়তাই আমাদের প্রবণতা, অভিমত বা বক্তব্যের উপর রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করে। ইউ জী বলেন, ‘‘যতক্ষণ ভেতরে ‘আপনি’ আছেন, ততক্ষণ আপনি মৃতবৎ। যদি কোনওভাবে বা দৈবাৎ ‘আপনি’ যা আপনি নিজেকে জানেন, সম্পূর্ণ অনুপস্থিত হয়ে যায় এমনকী ক্ষুদ্রাতি–ক্ষুদ্র মুহূর্তের জন্য হলেও, তাহলে হয়তো জীবনকে স্পর্শ করতে পারবেন। কিন্তু কোনওদিন জানতে পারবেন না সেখানে কি আছে।’’

বার্নার্ড সেলবি, একজন ব্রিটিশ পোস্টম্যান যাঁর সঙ্গে আমার ১৯৭৯ সালে কোডাইকানালে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। যিনি ম্যানচেস্টারে লেবার পার্টির নেতা, লোকসভার সদস্য হওয়ার চেষ্টা করছেন, তিনি সেদিন বলেছিলেন ঃ

> আমি গত চোদ্দো বছর ধরে ইউ জী–কে চিনি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি তাঁকে জানি না। একই সঙ্গে তাঁকে জানি আবার জানি না। তাঁর ব্যাপারটা হল এরকম, যতই তাঁর সঙ্গে আপনি দিন কাটাবেন যতই তাঁকে জানতে পারবেন, ততই আবিষ্কার করবেন যে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছুই আপনি জানেন না ...। যখনই আমি তাঁকে দেখি, আমার মধ্যে একটা নেতিমূলক ভাব জেগে ওঠে, আমার অজ্ঞানতা গভীর হয় ...।

এই জীবন্ত গুণাবলী কীভাবে ইউ জী–র জীবনে কাজ করে – তাঁর দিনগত জীবনে? ইউ জী বলেন, ‘আমি বসি, খাই, চলি, কথা বলি আর ভ্রমণ করি।’ কিন্তু এই গল্পের মধ্যে আরও অনেক কিছু আছে, একটা শেষ না হওয়া গল্প – আর আামি সেই গল্পকে এখন নিজেই নিজেকে বলতে দেব।

ক্যালামিটির পর ইউ জী ভারতে প্রতাবর্তন করলেন। এখন নিয়মিত তিনি ভারতে আসেন। প্রত্যেক বছর তিনি যখন ভারতে আসেন তখন তাঁর সময়কে মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর আর আজকাল দিল্লির মধ্যে ভাগ করে থাকেন।

যদিও ইউ জী বলেন যে তিনি কারোর সঙ্গে কোনওরকম ব্যক্তিগত আলোচনা করেন না, কিন্তু ঘটনা হল, সারা পৃথিবীতে শ’য়ে শ’য়ে লোকের জীবন তাঁর সংস্পর্শে এসে পুরোপুরি বদলে গেছে। আমি আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি যে, জানি না কি কারণে, মানসিক রোগগ্রস্ত লোকেরা ইউ জী–র বিশেষ নজর ও মনোযোগ পান।

'বাবা, শুধু তোমার কাছে কেন এত সব বিকৃত মস্তিষ্কের লোকজনরা আসেন?' আমার মেয়ে পূজা একদিন জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম, 'যাতে করে আমি তাঁদের পুরো পাগল করে ইউ জী–র হাতে সমপর্ণ করতে পারি।'

ইউ জী–র এক বন্ধু যিনি কর্মবাদে বিশ্বাস করেন, বলেন, ''ইউ জী যেহেতু তাঁর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন, যিনি পরবর্তীকালে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, সেহেতু তাঁকে সেই কর্মের ফল ভোগ হিসাবে পাগলদের দেখাশুনা করতে হবে।''

''আপনি কেন এ সমস্ত লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন? আপনি কি জানেন না যে এই বাড়ির চার দেওয়াল ছাড়া আপনার কথায় আর কারোরই কোনও উপকার হচ্ছে না।'' কল্যাণী তাঁদের আলোচনা থামিয়ে বললেন, যখন বাঙ্গালোরে কোনও এক সন্ধ্যায় ইউ জী একদল মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। 'আপনারা কি জানেন প্যারানয়েড আর স্কিজোফ্রেনিয়ার মধ্যে কি পার্থক্য?' কল্যাণী ডাক্তারদের প্রশ্ন করলেন। তারপর কাউকে কোনও উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করে দিলেন। ''এদের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত সামান্য। ধরুন একজন মহিলা রাতের শো–তে সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছে। যেহেতু সে একলা তাই তার মধ্যে সংশয় জেগেছে ও ভয় হচ্ছে অটোরিকশ ড্রাইভার হয়তো তাকে ধর্ষণ করবে। এটা হল স্কিজোফ্রেনিকের লক্ষণ। আর প্যারানয়েড মনে মনে ভাবছে যে তাকে অটোরিকশচালক ধর্ষণ করছে।''

আমি আজ পর্যন্ত বাঙ্গালোরে যত লোককে ইউ জী–র আশপাশে দেখেছি কল্যাণী হল সবচেয়ে বিস্ময়কর মহিলা। প্রথম যখন দেখা হয় তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি। সে ও প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। তাঁর উপস্থিতি ছিল রীতিমতো জাঁকজমকপূর্ণ; তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারানোর এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে, দিল্লির এক মানসিক হাসপাতালে তিনি কিছুদিন চিকিৎসার জন্য ভর্তি ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর স্বামী এবং মেয়ের জামাই দু'জনে ছিলেন বড়সড় আমলা। এক সময় তিনি হাইস্কুলে অঙ্ক পড়াতেন। কল্যাণীর এক অদ্ভুত রোগ ছিল। মন্দিরের পূজারীদের এবং সাধু–সন্ন্যাসীদের প্রচুর টাকাপয়সা এমনকী গয়নাগাঁটিও দান করে দিতেন। এই রোগের চিকিৎসা করানোর জন্যই তাঁকে দিল্লিতে মানসিক হাসপাতালে থাকতে হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার

হল, যে সমস্ত পূজারীদের তিনি সবকিছু দান করেছেন, তাঁদেরই স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে তাঁকে মানসিক হাসপাতালে যেতে হয়।

কল্যাণী বাঙ্গালোরে রাস্তায় রাস্তায় তখন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন, যখন ইজ জী-র সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। তারপর থেকে শেষদিন পর্যন্ত ইউ জী ছিলেন তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ইউ জী প্রতিমাসে তাঁকে টাকাপয়সা দিতেন এবং থাকবার জন্য একটা বাসস্থান জোগাড় করে দিয়েছিলেন। ‘উন্মাদ নারীর সঙ্গে ঋষি মানবের সেই সমস্ত দিনের উল্লসিত বাক্যালাপ হয়তো আমার পক্ষে কোনওদিনই ভুলে যাওয়া সম্ভবপর হবে না।’

‘ইউ জী-র সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর ঘরের সঙ্গে রাস্তার সমস্ত বিচ্ছেদ আমার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়।’ কল্যাণী মন্তব্য করতেন। একবার এক ভদ্রমহিলার দীর্ঘস্থায়ী ঘাড়ের ব্যথা কল্যাণীর স্পর্শে পুরোপুরি ভালো হয়ে যায়। যখন সেই বান্ধবী কল্যাণীকে ধন্যবাদ জানায়, কল্যাণী বলে ওঠেন, ‘আপনার ইউ জী-কে ধন্যবাদ জানানো দরকার, আমি সামান্য এক মাধ্যম মাত্র।’ তাঁর গান, নাচ আর পয়সা ভিক্ষা চাওয়া সবাইকে মাতিয়ে রাখত। ইউ জী তাঁকে কিছু না কিছু দিতেন, যখনই তিনি দেখা করতে আসতেন। যদিও ইউ জী ভালোভাবেই জানতেন যে, সেই টাকা কল্যাণী অন্য কাউকে দান করে দেবেন বা ডাকবাক্সে ফেলে দেবেন।

কল্যাণী যখন স্তনের ক্যানসারে মৃত্যুমুখে পতিত, তখনও ডাক্তারের সবরকমের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁকে যখন শেষবারের মতো দেখি মনে হয়েছিল তিনি যেন উন্মুক্ত ক্ষত। ক্যানসারের প্রকোপ বুকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। ইউ জী যখন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, তখন সেই অবস্থা সত্ত্বেও কল্যাণী রাস্তায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, আর করুণকণ্ঠে মিনতি জানান, ‘ইউ জী, আমাকে মরে যেতে সাহায্য করুন, আপনিই কেবল এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারেন।’ ইউ জী কল্যাণীর হাত ধরে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কয়েকমাস পরে কল্যাণী মারা যান। তিনি তাঁর সমস্ত কিছু ইউ জী-র নামে রেখে যান। তার মধ্যে ছিল কিছু ছেঁড়া শাড়ি ও পোশাক আর সাত হাজার টাকা। ইউ জী সেই টাকা যথারীতি সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাউকে দিয়ে দেন।

পরভীন ববির মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই-এর সময়ে ইউ জী-র ভূমিকার কাহিনি কখনই বলা হয়নি। হয়তো সেকথা বলার সময় আজ এসেছে।

‘‘আমি সুস্থ। আমি একটানা কাজ করার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি।’’ – পরভীন ববি … গল্পগুজবের এক নম্বর পত্রিকা ‘স্টার ডাস্ট’ চিৎকার করে এই খবর জানাল। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও জানা গেল যে, পরভীন ববি পাকাপাকিভাবে ইউরোপ, ইউ জী এবং অসুস্থতা থেকে ফিরে এসেছেন। ফিল্মি জগতে প্রত্যাবর্তনের জন্য তৈরি, সেই দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার শুধু অপেক্ষায় …।

> ‘‘… কিন্তু আমি তো চিরকালের জন্য ইউ জী–র সঙ্গে থাকতে পারব না। আমাকে আমার জীবন নিয়ে নিজেকেই বাঁচতে হবে। ইউ জী যেমন আমার জীবনের মতো করে বাঁচতে পারবেন না, ঠিক সেরকম আমিও তাঁর জীবনের মতো বাঁচতে পারি না। আর এখন যখন ফিরে এসেছি আমি সত্যি তাঁর অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। কিন্তু তাঁকে ছাড়া আমি হারিয়ে যাব না।’’
>
> – পারভীন ববি
>
> স্টার ডাস্ট পত্রিকা জানাল, ১৯৮০ সালে মুম্বইতে
> পরভীন ববির প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রথমবার যখন পরভীন ববি ভেঙে পড়েছিলেন, তখন ইউ জী–র সঙ্গে বালিতে যান। সে সময় তিনি মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাচ্ছিলেন। তাঁরা যখন বালিতে, তখন ‘ইন্ডিয়া টুডে’–তে একটা খবর ছাপা হল যে, পরভীন ববি এবং ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি বিবাহ বন্ধনে যুক্ত হয়ে সুরম্য বালি দ্বীপে তাঁদের মধুচন্দ্রিমা যাপন করছেন। এই খবর চারিদিকে তুমুল সোরগোল বাধিয়ে দিল। যখন ইউ জী মুম্বইতে ফিরে এলেন, তখন খবরের মাধ্যম তাঁকে ঘিরে ধরল। ইউ জী ধীরভাবে উত্তর দিলেন, ‘‘আমি মনেপ্রাণে চাই যে খবরটা সত্যি হোক। আমার মতন একজন বৃদ্ধ লোক এর থেকে আর বেশি কি আশা করতে পারে? পরভীন ববি একজন নামী অভিনেত্রী; ধনী, যুবতী এবং সুন্দরী, এর থেকে আর বেশি কিছু চাওয়া কি সম্ভব?’’ সাংবাদিকরা সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ইউ জী–র উত্তর শুনে। পরে ইউ জী–র বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন যে ‘ইন্ডিয়া টুডে’–র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে। ইউ জী হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ‘‘এটা যদি সত্যি হয়, আমার আঘাত পাওয়া উচিত নয়। আর যদি মিথ্যাও হয়, তাহলেও আমার আঘাত পাওয়া উচিত নয়, আসলে কোনওভাবেই আমার আঘাত পাওয়া উচিত নয়।’’

পরভীন ববি পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছেন। এই খবরের পশ্চাতে তাঁর আবার মানসিক ভারসাম্য হারানোর বিভীষিকা আমাদের পেছনে ছায়ার মতন অনুসরণ করছিল। ইউ জী চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে এই বম্বে সিনেমা জগত থেকে, যেখানে কুকুরের মাংস কুকুরে খায়, এরকম ধরনের শিল্প থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি সেই আশা ছেড়ে দেন। তিনি জানতেন যে, পরভীন ববি আবার অসুস্থ হবেন। শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

তিনি যখন ইউ জী ও ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে সুইজারল্যান্ডে কিছুদিন ছিলেন তখন বলেছিলেন, ''আমি যদি এখানে থাকি তাহলে পাগল হয়ে যাব। আমি যদি বম্বেতে যাই তাহলেও পাগল হয়ে যাব। জানি না এখন আমি কি করি?'' ইউ জী উত্তরে বললেন, 'বম্বেতে যাওয়াটাই ভালো এবং সেখানে গিয়ে পাগল হোন ...।' ইউ জী ভেবেছিলেন, ববির পাগল হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষার একটাই পথ আছে, তা হল তিনি যদি নানদের (Nun) মতন এক সংযত জীবন যাপন করতে পারেন।

পরে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে পরভীন আবার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

১৯৮৪ সালের ২৯ জানুয়ারি 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া'র একটা খবরের অংশ নিচে তুলে ধরলাম।

> ''এবার ইউ জী-র মনোভাব আগের মতন সংরক্ষণমূলক এবং উৎসাহপ্রদ ছিল না। তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি আগের বারের মতন আমাকে কোনওরকম উপদেশ দিতে পারবেন না ... আমি কি করব না করব সে ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করার মতন সুস্থতা আমার আছে। কিন্তু আমি মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে এসে গিয়েছিলাম যে যদি আমি সিনেমা শিল্পে থেকে যাই তাহলে আমার মাথা পুরোপুরি খারাপ হয়ে যাবে। আমি এর বাইরে থাকব বলে স্থির করেছি। আমি দুঃখিত, কিন্তু আমার পক্ষে একে গ্রহণ করা আর সম্ভব হচ্ছে না।
>
> প্রথমবারের মতো মনে হল, যেন ফিল্মি ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে। আমি শেষ হয়ে গেছি। সব কিছু শেষ – আমার খ্যাতি,

> আমার সাফল্য, আমার শিল্পী হিসাবে বৈশিষ্ট্য এবং আমার পুরানো জীবন। আমি এখন ইউ জী–র কাছে এসেছি তার কারণ হল, তিনি একমাত্র লোক যিনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন; আমার পুরানো জীবনের সঙ্গে আমার ভাগ্য আমায় যেখানে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারেন। আমি বর্তমানে ইউ জী ও ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে আমেরিকায় বিশ্রাম করছি; এবং সাধারণ কাজ যেমন রান্নাবান্না, ঘর পরিষ্কার করছি; গাছে জল দেওয়া এসব করে সময় কাটাচ্ছি। আমি জীবনে কোনওদিন এমন সুরক্ষিতভাবে সুখ ও শান্তি অনুভব করিনি।"

এক বছর পর ১৯৮৪ সালের ৪ এপ্রিল তাঁর জন্মদিনে পরভীন ইউ জী–র লন্ডনের বাসস্থান থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইউ জী আমাকে তাঁর হঠাৎ এভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার সংবাদ জানাতে টেলিফোন করলেন, 'পরভীন হয়তো ভারতে ফিরে যাচ্ছেন।' আমাকে বললেন মুম্বই এয়ারপোর্টে কড়া নজর রাখতে। আমি পরভীনের ভূতপূর্ব সেক্রেটারিকে খবর জানিয়ে দিলাম। দু'দিন ধরে পরভীনের কোনওরকম খবর নেই। ৪ এপ্রিল ১৯৮৪ লন্ডন থেকে এক চিঠিতে ইউ জী জানালেন সেই সময়ের ঘটনা, কেন পরভীন হঠাৎ করে কিছু না বলে ঘর থেকে চলে গেলেন।

> আগেও আমি আপনাকে বলেছি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরে আসার পর অবধি পরভীনের অবস্থা আমার ধৈর্য্য ও শক্তির উপর বিশেষ চাপের সৃষ্টি করেছে। আমি গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে স্ফটিকের মতে স্বচ্ছ করে বোঝাতে চাইছিলাম যে, তাঁর এখানে জমিয়ে বসে পড়া ও আমার সঙ্গে চিরস্থায়ী থাকার ধারণা ভ্রান্ত। তাঁর একটা নিজস্ব জীবন আছে এবং তা নিয়ে বেঁচে থাকার পরিকল্পনা করতে হবে, আর সেটা করার সময় এখন এসে গেছে। পরভীন ভ্যালেন্টাইনকে এত যত্ন করেছেন যে ভ্যালেন্টাইন এরই মধ্যে তাঁর অনুপস্থিতি বেশ ভালো করে বুঝতে পারছেন। এই ঘটনাটা কি চিরন্তন লজ্জাকর হয়ে থাকবে না যে পরভীনের মতো একজন তাঁর নিজের জীবনকে ও প্রতিভাকে কোনও কাজে

> লাগাতে পারছেন না? তাঁর সামনে যে কি পড়ে আছে তা হয়তো কারোর পক্ষেই বলা সম্ভব নয়।
>
> ববির এই আচমকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঠিক আগের বারের মতনই চমকপ্রদ। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর ইউ জী-কে বললেন, ‘‘আমি আর আপনার উপর বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। আমি এই মুহূর্তে ভারতে ফিরে যেতে চাই।’’ তিনি সব কিছু এখানে রেখেই ঘর থেকে চলে গেলেন। যদিও আমি তাঁকে প্লেনের টিকিট কাটার জন্য টাকা দিয়েছি, কিন্তু কে জানে তিনি হয়তো এখনও লন্ডনেরই কোথাও আছেন বা ভারতে পৌঁছে গিয়ে থাকবেন।

নিউইয়র্ক, ৭ এপ্রিল ১৯৮৪, বিক্ষুব্ধ এবং উন্মাদগ্রস্ত পরভীন ববি নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আবতরণ করলেন। এয়ারপোর্টে কর্তব্যরত অফিসার তাঁকে পরিচয় নির্দেশক কাগজপত্র দেখাতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু এটা পরভীনের মধ্যে তীব্র অস্বস্তির উদ্রেক করল। শোনা যায় তিনি এমন কঠিন ব্যবহার করেন যে অফিসাররা তাঁকে হাতকড়ি পরাতে বাধ্য হন। সেই অবস্থায় তাঁর বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী মনোভাব এমন প্রতিরোধের সৃষ্টি করেছিল যে অফিসাররা তাঁকে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। সৌভাগ্যক্রমে একজন ভারতীয় চিকিৎসক পরভীন ববিকে চিনতে পেরে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। সেই ভদ্রলোক পরভীনের কাছ থেকে ইউ জী-র ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার নিয়ে ফোন করে পরভীনের বর্তমান অবস্থার খবর জানালেন।

ইউ জী বিস্তারিতভাবে আমাকে নিউইয়র্কের দুঃখজনক ঘটনা জানালেন। আমরা ফোনে বিস্তারিত আলোচনা করলাম, কীভাবে তাঁকে, এই যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিজেকে নিয়ে হাজির করেছেন তা থেকে বার করে আনা যায়। অবশেষে আমি ইউ জী-কে রাজি করালাম নিউইয়র্কে গিয়ে পরভীন ববিকে ফিরিয়ে আনতে।

ইউ জী যখন নিউইয়র্কে গেলেন, দেখলেন পরভীনকে আরও ত্রিশজন রোগীর সঙ্গে মানসিক হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। ভারতীয় কনস্যুল জেনারেলকে এই ঘটনা জানানো হয়েছিল এবং তিনি পরভীন ববিকে নিজে দেখতে আসেন হাসপাতালে। ইউ জী-ও তখন দেখতে এসেছিলেন হাসপাতালে। আর

ইউ জী–র উপস্থিতিতে ববি কনস্যুল জেনারেলের সঙ্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও হাসিখুশিভাবে কথাবার্তা বলেন, যেন কিছুই হয়নি। ১৯৮৪ সালের ১২ এপ্রিল ইউ জী–র লেখা এক পত্রে তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করেন কি অবস্থার মধ্য দিয়ে পরভীন ববির সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন।

২৫ এপ্রিল, ১৯৮৪ (পরভীন ববির দুশ্চিন্তাজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই ইউ জী–র লেখা শেষ চিঠি) তিনি নিউইয়র্কের সেলবার্ন মারে হোটেল থেকে আমায় আর একটি চিঠি লিখলেন।

> ‘‘আমি দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার উপযোগিতা হয়তো শেষ হয়ে এসেছে। এর আগে যতবারই তিনি সাহায্যের জন্য এসেছেন, আমার পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানসিক হাসপাতালে যাতে না থাকতে হয় সে ব্যাপারে আমার দৃঢ়তা হয়তো কার্যকরী হয়েছে। কারণ তাঁকে সেভাবে থাকতে দিতে আমি কিছুতেই পারছিলাম না। কিন্তু আবার তিনি বড়সড় এক সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছেন। তিনি নিজেকে সেই স্বভাবসিদ্ধ ভয়ানক হতাশাজনক অবস্থার মধ্যে ডুবিয়ে ফেলতে চলেছেন। তিনি যা যা করছেন, আমি কোনওদিন ভাবতেই পারিনি যে তিনি এসব করবেন। আমার মনে হচ্ছে, তিনি এমন এক অবস্থার মধ্যে চলে যাচ্ছেন যেখান থেকে চিকিৎসা ছাড়া তাঁর পক্ষে কোনওদিন সুস্থ হয়ে ফিরে আসা হয়তো সম্ভব হবে না।’’

আজ আমি ক্যালিফোর্নিয়াতে বসে পরভীন ববির সম্পর্কে এসব ঘটনা একত্র করে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আর এই মুহূর্তে পরভীন বম্বেতে ফিরে গিয়ে নির্জনে বসবাস করছেন। কিছুদিন আগে তিনি ইউ জী সম্পর্কে মতামত লিখে বাঙ্গালোরে কে. চন্দ্রশেখরবাবুর কাছে পাঠান। সেখান থেকে একটা অংশ নিচে উদ্ধৃত হল ঃ

> ‘‘আমি আজ পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি ইউ জী হলেন সবচেয়ে নিখুঁত মানুষ। তাঁর সঙ্গে কিছুদিন থাকলে বোঝা যায় কেমন নিখুঁত মানুষ তিনি। আমি তাঁর সঙ্গে থেকেছি এবং

অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। তাঁর সঙ্গে অনেক দিন থাকার পর আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি যে, ইউ জী সমস্ত মানুষকে মানুষের মতনই মর্যাদা দেন – সম্মান দেন, সহানুভূতি জানান, বোঝার চেষ্টা করেন এবং অসম্ভব দয়াপ্রবণ। আমি আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে, তিনি মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন তাঁরা তাঁর সমকক্ষ – তা সেই ব্যক্তি যাই হোন না কেন যুবা, দরিদ্র, ধনী বা বৃদ্ধ। আমরা সাধারণত মানুষের সঙ্গে এই মনোভাব নিয়ে আচরণ করি যেন তাঁরা হয় আমাদের থেকে উপরে বা নিচে। আমরা সাধারণত আমাদের সমকক্ষ বলে লোকের সঙ্গে আচরণ করি না। ইউ জী-র এই ব্যবহার তাঁর কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি কখনওই কোনওরকম প্রচেষ্টালব্ধ আচরণের দ্বারা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না বা কখনওই এটা ভাবেন না যে তিনি একজন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বা একজন বিশেষ লোক বা লোকের উপকারের জন্য তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন।

আর একটা অত্যন্ত বিশেষ গুণ যা আমি ইউ জী-র মধ্যে দেখেছি তা হল, তিনি কোনওসময় কাউকে তাঁর ব্যক্তিগত কাজ হাসিল করার জন্য ব্যবহার করেন না। সাধারণত তিনি কারোর কাছ থেকে যা নেন, তার থেকে অনেক বেশি তিনি দিয়ে দেন। আর তাঁর দেওয়ার মধ্যে এমন একটা পবিত্রতা আছে যা আমি অন্য কোথাও দেখিনি। তিনি যখন কিছু দেন, তখন কোনওরকম প্রতিদানের কথা ভাবেন না। বেশিরভাগ সময়ে তিনি এমন নিঃশব্দে এবং নিঃস্বার্থভাবে দেন যে যাঁরা দান গ্রহণ করেন, তাঁরা এই দানের ব্যাপারটা জানতেই পারেন না। যদি তিনি মনে করেন যে অপ্রিয় সত্য কথা জানিয়ে কারোর ভালো হবে, তা হলে সে যতই তিক্ত হোক না কেন, তিনি সেটা বলতে কোনওরকম দ্বিধাবোধ করেন না। এমনকী যদি সেই সত্যে কোনও ব্যক্তির বন্ধুত্বকেও হারাতে হয়, তাহলেও তিনি পেছপা হবেন না, যদি

ভালোর জন্য সেকথা বলার প্রয়োজন হয়।

আজ পর্যন্ত আমি কোনওদিন ইউ জী–কে কোনও লোকের কাছ থেকে কোনওরকম সুযোগ গ্রহণ করতে দেখিনি, কোনও লোককে প্রতারিত করতে দেখিনি, কোনও লোককে ভ্রান্ত ধারণার পেছনে যাওয়ার উপদেশ দিতে দেখিনি, কোনও লোকের বা সময়ের সুযোগ নিয়ে কোনও কাজ হাসিল করতে দেখিনি, তা সে যত ছোট কাজ হোক না কেন। ইউ জী ছাড়া একথা আমি এই পৃথিবীর আর কোনও লোকের সম্বন্ধে বলতে পারব না, যাঁদের সংস্পর্শে আজ পর্যন্ত আমি এসেছি।”

ঃঃ – ঃঃ

কখনই শেষ না হওয়া গল্প

"যেটুকু এখনও পড়ে আছে তা হল জীবনের স্পন্দন, অনুরণন ও ছন্দ।"

– ইউ জী

ইউ জী–র কাছে দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। বেড়ালের মতো ক্ষণিকের জন্য মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে নেন। সব মিলিয়ে হয়তো চার–পাঁচ ঘণ্টা ঘুমান।

দিনে তিনবার পাখির মতো একমুঠো সামান্য কিছু হল তাঁর আহার। নিরামিষাশী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনওরকম শাকসবজি বা ফলমূল আহার করেন না। আর রোজ রোজ প্রায় একই খাবার তিনি খান। সকালের খাবার হল ওটমিল সেদ্ধ, ডাবল বা ট্রিপল ক্রিম দুধ তার সঙ্গে একটু আনারসের রস বা কমলালেবুর রস, ব্যস। তিনি যখন একা থাকেন তখন সেই একই ওটমিল সেদ্ধ দুপুরে এবং রাত্রে খান। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুপুরে খুসখুস আর হিমেল ব্রকোলি (সবুজ রং–এর ফুলকপি বলা যেতে পারে) অথবা 'এঞ্জেল হেয়ার' (খুব সরু সরু সেমাই তাই 'পরীর চুল' বলে) টিনে ভরা টম্যাটোতে ফেলে (উনি কখনও টাটকা টম্যাটো খেতে চান না) পাঁচ মিনিটে রান্না করে নেন। রাতেও সেই এক জিনিস শুধু একটু পনির থাকে। কখনওই এক পদের বেশি কিছু খান না। ভগবান জানেন কীভাবে তিনি এই সামান্য আহার করে বেঁচে আছেন। তাঁর কথানুযায়ী শরীরকে চালু রাখার জন্য দিনে তিনবার কিছু কিছু খাবার তিনি শরীরের মধ্যে ছুঁড়ে দেন। "আপনারা খাওয়াটাকে এক উপভোগের বস্তুতে পরিণত করেছেন। আমার মতামত অনুযায়ী বিভিন্ন স্বাদের খাবার অনুসন্ধান করা আর বিভিন্ন মহিলার পেছনে যাওয়ার মধ্যে কোনওরকম পার্থক্য নেই।"

তাঁর একমাত্র ব্যায়াম হল শোবার ঘর থেকে বসার ঘর, রান্না ঘর আর বাথরুমে যাতায়াত করা। তিনি বলেন যে, একমাত্র গাড়িতে চড়া হল তাঁর শরীরের ধাতের কর্মের সহায়ক, কারণ এটা করা দারুণ ব্যায়াম করার মতন, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ ভীষণভাবে আন্দোলিত হয়, বিশেষ করে যখন গাড়ি ষাট মাইল বা অধিক বেগে চলতে থাকে। আর তাতেও যদি যথেষ্ট ব্যায়াম করা না হয় তাহলে বিভিন্ন মলে বাজার করার জন্য ঘুরে বেড়ান।

যখনই লোকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তখন যে সমস্ত আলোচনা হয় তার একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বই–এর প্রকাশ ঘটে। এই সমস্ত বই–এর একাধিক সংকলন বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ফরাসি, রুশ, ইতালি, জার্মানি, চীনা, জাপানি ও পোলিশ ভাষায়।

প্রথম যে পুস্তকটি প্রকাশিত হয় 'মিস্টিক অফ এনলাইটেনমেন্ট' তা দু'জন প্রাক্তন রজনীশ সন্ন্যাসীর মাথা থেকে বেরোয়। তাঁদের জীবনে ইউ জী–র ভূমিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁরা ইউ জী–র থেকে যা শিখেছেন তা লোককে জানাবার উদ্দেশ্যে বইটি লেখেন। আর এই বইটি অন্যান্য বই–এর সঙ্গে সঙ্গে কোনওরকম বিজ্ঞাপনের হইহল্লা ছাড়াই বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ''আমি যা বলি তার মধ্যে যদি সত্যিকারের কোনও বস্তু থাকে, তাহলে তা নিজে থেকেই দাঁড়াবে আর তা না হলে নিজে থেকেই পড়ে যাবে,'' বলেন ইউ জী।

যদিও তিনি সবসময় বলেন যে বলার মতন তাঁর কিছুই নেই এবং তিনি কাউকেই কোনওরকম সাহায্য করতে পারেন না, তাও দলে দলে লোক তাঁকে দেখতে আসেন; কেউ কেউ আসেন পুরোপুরি অনুসন্ধিৎসার বশে, আবার অনেকেই আসেন মনে মনে আশা নিয়ে যে সাক্ষাৎকারে তারা বিশেষ উপকৃত হবেন। ''ইউ জী কোনও গুরু বা শিক্ষক নন। কিন্তু তিনি তখন আপনার বন্ধু যখন আপনার গুরু বা শিক্ষক আপনার শত্রু হয়ে গেছে'' – বলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক বিজয় আনন্দ, যিনি ইউ জী–র সঙ্গে পরিচয়ের আগে রজনীশের আশ্রমের আভ্যন্তরীণ সদস্য হিসাবে দীর্ঘ আটবছর কর্মরত ছিলেন।

> ইউ জী বলেন যে, আপনার দুঃখ এবং দুর্দশা নিয়েই আপনার থাকা উচিত, এর জন্য কোনও গুরুর প্রয়োজন নেই। কিন্তু আপনি জানেন না এটা কীভাবে সম্ভব। এসব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক,

> আপনার পক্ষে এই কষ্ট সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আপনি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ব্যাকুল। আর সেই সময় ইউ জী এসে পড়েন এবং বলেন, 'আমি কোনওরকম ভাবে সাহায্য করতে পারব না। এটা আপনার দুর্দশা। আপনি ইচ্ছে করলে নরকে যেতে পারেন।'' এটা বোঝা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, এসব বলা অনেক সোজা, কিন্তু করা অনেক কঠিন।

বিজয় আনন্দ এই সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন; ধ্যান জগৎ এবং আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে তাঁর সবিশেষ জ্ঞান আছে; যে সমস্ত লোক এই ব্যাপারে উৎসাহী এবং সাধনায় প্রবৃত্ত তাঁদের বিপজ্জনক অবস্থার কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন ঃ

> আমাদের জীবনে এমন সময় মাঝে মাঝে আসে যখন আমরা সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে কাল যাপন করি, কোনওরকম বুদ্ধি বিচারজনিত সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা নয়, আবেগজনিত এবং মানসিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা। যখন আমাদের পক্ষে সেই কষ্টকর সময় কাটানো অসহ্য হয়ে পড়ে, কোনওরকম সাহায্য যখন আর পাওয়া যায় না এবং আপনি যখন নিজে আর নিজেকে সাহায্য করে উঠতে পারছেন না, তখন আপনি ধার্মিক গ্রন্থের দিকে ঝুঁকে পড়েন, যেমন কোরাণ, গীতা বা বাইবেল এবং এসবের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পান। হঠাৎ আপনার মনে হয় যে এর মধ্যে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু এই জিনিস আপনাকে বেশিদিন প্রবোধ দিতে পারে না। তখন আবার আপনি বই পড়া শুরু করেন, কয়েক ঘণ্টার জন্য উল্লসিত বোধ করেন, কিন্তু সেই ভাব আবার মিলিয়ে যায়। এইভাবে কিছুদিন কাটতে থাকে, তারপর একদিন মনে হয় এই সমস্ত লেখার মধ্যে কোনও প্রাণ নেই। সেজন্য বই আর সাহায্য করতে পারছে না। আর যখন এইসব বই সাহায্য করতে পারে না, তখন আপনি গুরু বা শিক্ষকের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। যখন আপনার কাজে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা আসে তখন আপনি পারদর্শী লোকের পরামর্শ গ্রহণ করেন। যখন আপনার শরীরে গোলোযোগ দেখা

> দেয়, তখন আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন এবং যখন আপনার মানসিক ও আবেগজনিত সঙ্কট দেখা দেয়, তখন আপনি রজনীশ, ডা-ফ্রি-জন বা জে কৃষ্ণমূর্তির মতন লোকের শরণাপন্ন হন। প্রথমে প্রথমে তাঁদের সংস্পর্শে আমাদের যন্ত্রণার অনেক উপশম ঘটে, এই সমস্ত লোক আপনাকে এক বিশেষভাবে জীবনযাপন করার পরামর্শ দেন; কোনও এক ধরনের ধ্যান করতে বলেন এবং বিশেষ এক দর্শন আপনি অনুসরণ করতে থাকেন। সত্যি সত্যি এসব জিনিস আপনাকে ভরিয়ে রাখে, আপনার মনে হয় যেন অবশেষে আপনি সত্যিই উত্তর খুঁজে পেয়েছেন। যতদিন আপনি ধ্যান করতে থাকবেন, ততদিন আপনার মনে হবে যেন সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু যেই আপনি ধ্যান করা বন্ধ করে দেবেন, আপনি নিজে নিজের সম্মুখবর্তী হবেন, আপনি দেখতে পাবেন যে সত্যি আপনি কোনও সমাধান পাননি। আর তখন আপনার গুরু বা শিক্ষক বলবেন যে, আপনি যা করেছেন তা যথেষ্ট নয়। আপনি ফিরে গিয়ে আপনার প্রচেষ্টাকে দু'গুণ বাড়িয়ে দেবেন। এই সবকিছু আসলে আপনাকে সাময়িকভাবে ডুবিয়ে রাখে, ঠিক মদ্যপানের মতন। আপনি যদি আপনার নিজের কাছে সৎভাবে প্রশ্ন করেন তাহলে দেখবেন যে সত্যি আপনি একটুও অগ্রসর হননি। আপনি কোথায় যেন আটকে গেছেন। আর এই রকম এক সময়ে আপনার দরকার ইউ জী-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ...

কোনও কোনও সময় এই সমস্ত সাধারণ আলোচনা বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। লোকজন রীতিমতো ঝগড়া করতে উদ্বুদ্ধ হয়, সবাই যে যাঁর নিজের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে ঝগড়া চালায় আর ইউ জী প্রত্যেকের বিশ্বাস ও অভিমতকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন। তাঁরা হয়তো তাঁদের নিজস্ব অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কায় সচেতন হয়ে ওঠেন। তথাপি তাঁরা বারবার ফিরে আসেন ইউ জী-র সঙ্গে দেখা করতে, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যেন তাঁরা নিপীড়নের আনন্দই উপভোগ করেন। সত্যিই এ এক ধ্বংসকামী আকর্ষণ। এ যেন সেই একই জিনিস – মথ যেমন আগুনকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

“আমি এসব জানি না, ইউ জী ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে যা বলেন তা আমি একটা ফুটো পয়সা দিয়েও কিনতে রাজি নই আর তাঁর শিক্ষার কথা তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে, যা আমাকে আকর্ষণ করে তাঁর কাছে নিয়ে আসে।” বিলাপের স্বরে বলেন ব্রহ্মচারী শিবরাম শর্মা, প্রাক্তন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং অধ্যাপক এবং আই এ এস অফিসার, যিনি কুণ্ডলীমঠের আচার্য হওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু মঠের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণে আচার্য হতে পারেননি।

> ধর্ম-কর্ম নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত আছেন, ইউ জী তাঁদের এড়িয়ে চলেন, সমাজ সংস্কারকদের ব্যঙ্গ করেন, সন্ন্যাসীদের নিন্দা করেন, আধ্যাত্মিকতার প্রেরণায় যাঁরা সাধনা করেন, তাঁদের সম্পর্কে নিদারুণ বিরক্তিজনক মন্তব্য করেন, বেদের স্তুতি বা উপনিষদের বাণীকে অপছন্দ করেন এবং শংকরাচার্য বা বুদ্ধদেব সম্পর্কে কেউ আলোচনা করলে রেগে যান। রজীনশ বা সাঁইবাবার নাম শুনলেই তাঁর ক্রোধ ভয়ংকর হয়ে ওঠে, আর তাঁর ক্রোধের বহ্নিশিখা দেখা যায় তখনই, যখন জে কৃষ্ণমূর্তির গুণমুগ্ধ ভক্তেরা তাঁর কাছে আলোচনা করতে আসেন।
>
> কেউ কোনও সমস্যার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি কোনওরকম সমাধান দেন না এবং নির্বাণ সম্পর্কে আলোচনা সবসময় এড়িয়ে যেতে চান। যখনই তিনি কোনওরকম মতবিরোধজনক আলোচনায় জড়িয়ে পড়েন, তখন বলেন, ‘আমি যা বলছি সেটা ঠিক এরকম। বিশ্বাস করুন আর না করুন সেটা আপনার উপর।’ আর যদি কথোপকথনে ঝগড়া শুরু হয়ে যায় তাহলে রীতিমতো রেগে গিয়ে বলেন, “আপনাকে কে আসতে বলেছে? আপনি ইচ্ছা করলে এখুনি চলে যেতে পারেন। তাতে আমি একটুও অখুশি হব না ...।”
>
> তিনি নৈতিকতার বিরুদ্ধে, কিন্তু কখনও কাউকে দুর্নীতিপরায়ণ হতে বলেন না। যদি কেউ সততা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন, তিনি বেশ রেগে যান। অথচ তিনি কিন্তু অসৎ নন। তিনি একগাদা

> পরস্পরবিরোধী চরিত্রের আধার। তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত বিধ্বংসকারী এবং তাঁর মতবাদ নিদারুণ মর্মঘাতী, তাঁর অভিব্যক্তি আপনাকে হতভম্ব করে দেবে। তাঁর শব্দপ্রয়োগ আপনার মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে দেবে।
>
> তথাপি এরকম একজন লোকের প্রতি আমি দারুণ আকৃষ্ট! এটা কি আমার দুর্বলতা? আমার তা মনে হয় না বা এটা কি আমার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অক্ষমতা, উদাসীনতা বা ভীতি? আমি জানি না! মাঝে মাঝে আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলি যে তাঁর সম্পর্কে আর কখনও কিছু চিন্তা করব না, তাঁর সঙ্গে আর দেখাও করব না; কিন্তু যখনই তিনি বাঙ্গালোরের আশপাশে আসেন, আমার স্নায়ুতন্ত্র ঝংকারিত হয়ে ওঠে; আমি অসম্ভব রকম চঞ্চল হয়ে উঠি, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে দেখতে না যাই, ততক্ষণ পর্যন্ত অশান্তির ঝড় বয়ে চলে আমার মধ্যে। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

ইউ জী এবং ব্রহ্মচারীর মধ্যে গত কুড়ি বছর ধরে এক অদ্ভুত অদৃশ্য সম্পর্ক চলছে। শোনা যায় ব্রহ্মচারীর হাতের মুঠোয় ছিল এক বিশাল ভবিষ্যৎ যখন ইউ জী প্রথম তাঁর জীবনে আসেন, এবং ইউ জী নিজে বাধা দেন সেসব পেতে। কাহিনি হল এরকম যে, কুণ্ডলীমঠের অধ্যক্ষ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি ব্রহ্মচারীকে নির্বাচিত করেন ভবিষ্যৎ অধ্যক্ষ হিসাবে। এর অর্থ হল, ব্রহ্মচারী এমন এক সংস্থার উত্তরাধিকারী হতে চলেছেন, যাঁর সম্পত্তি হল কোটি কোটি টাকা। সারি সারি গাড়ি আর বাঙ্গালোরের বুকে প্রাসাদতুল্য বাসস্থান। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল তখন, যখন আর একজন তাঁর উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে সরাসরি আইনের আশ্রয় প্রার্থী হন সমস্যা সমাধান করার জন্য। সিংহাসনের এই অধিকার যুদ্ধ অনেকদিন ধরে চলতে লাগল; কারণ সিংহাসনের পেছনে ছিল অতুল ঐশ্বর্য। ব্রহ্মচারী ধারণাই করতে পারেননি যে এই ব্যাপারে তাঁর জীবনে মৃত্যুর আশঙ্কা এনে দিয়েছিল। এই অবস্থায় যদি ইউ জী-র হস্তক্ষেপ না ঘটত, যিনি তিনমাস ধরে ব্রহ্মচারীকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, যতদিন পর্যন্ত বিরোধী ব্যক্তি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না হন, তাহলে ব্রহ্মচারীর জীবন হয়তো দুঃখজনকভাবে অকালে নির্বাপিত হয়ে যেত। প্রত্যেকদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ইউ জী ব্রহ্মচারীকে নিজের আশ্রয়ে

সুরক্ষিত রাখতেন। বাইরে কোথাও যেতে দিতেন না, আর মঠের অধ্যক্ষ হওয়ার চিন্তা মাথা থেকে দূর করার পরামর্শ দিতেন। ব্রহ্মচারীকে রাতে বাড়ি ফিরতে দিতেন তখনই, যখন মনে করতেন যে ফিরে যাওয়াটা মোটামুটি নিরাপদ। যেদিন নতুন মঠাধ্যক্ষের অভিষেক হল, যখন ব্রহ্মচারীর রাজদণ্ড, সিংহাসন ও মুকুটের স্বপ্ন ভেঙে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথায় মুকুট উঠল, সেদিন সেই সময় ব্রহ্মচারী ইউ জী-র সঙ্গে ছিলেন। পরের দিন ব্রহ্মচারী ইউ জী-কে এক টুকরো জমি দেখাতে নিয়ে গেলেন, যেটা কর্ণাটক সরকার তাঁকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা ইউ জী ব্রহ্মচারীকে তাঁর বাসস্থানে পৌঁছে দিলেন। বাসস্থান মানে ছোট একটা গ্যারাজ। ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে দু'টো টাকা ব্রহ্মচারীর হাতে দিয়ে বললেন, 'এই টাকা দিয়ে আপনি আপনার নিজের আশ্রম গড়ে তুলুন ...।'

কয়েক মাস পরে, কর্ণাটক সরকারের সাহায্যে ব্রহ্মচারী বাঙ্গালোরের উপকণ্ঠে এক বিশাল আশ্রম গড়ে তোলেন। যেখানে তিনি একটি বিশাল স্কুল, একটি মন্দির, একটি অতিথিশালা এবং বয়স্ক লোকেদের থাকার জন্য একটা ভবন নির্মাণ করেন।

ইউ জী-র সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা সবসময় খুব দরকারি বিষয়ের উপরই সীমাবদ্ধ থাকে না। একবার একজন ভদ্রলোক ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরো থেকে কনকর্ড বিমানে করে ইউ জী-র সঙ্গে আলোচনা করতে আসেন। কিন্তু দারুণ হতবাক ও হতাশ হয়ে যান, যখন দেখেন যে ইউ জী টাকাপয়সা, ডলারের দাম, স্টক মার্কেট নিয়ে আলোচনা করছেন। এতদূর থেকে এসেছি কি টাকাপয়সা, রাজনীতি ও যৌনতা সম্পর্কে আলোচনা শুনতে, ভেবেছিলাম এখানে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক-ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার আলোচনা চলবে বা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত লোকের গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা চলবে ...। ইউ জী তাঁর কথা শুনে শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, ''আমি তো আপনাকে এখানে আসতে বলিনি। আমার মনে হয় যথাশীঘ্র পরবর্তী ফ্লাইট ধরে ব্রাজিলে ফিরে যাওয়াতেই আপনার মঙ্গল।'' কিন্তু ভদ্রলোক পরের দিন আবার ফিরে আসেন এবং এভাবে একমাস ধরে প্রত্যেকদিন ইউ জী-কে দেখতে আসেন।

ইউ জী যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর বন্ধুরা ঠিক জড়ো হয়ে যাবেন। তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে আপাতভাবে তিরস্কার করেন, নানা ধরনের রসিকতা চলে এবং সবসময় মনে হয় যেন পার্টি চলছে। 'তাঁর শারীরিক উপস্থিতিতে এমন একটা

স্বাচ্ছন্দ্য আছে যা বলে বোঝানো মুশকিল।’ কথাগুলো বলেন পাওলো মারুসিক, একজন ইতালিয়ান চিত্রনির্মাতা ও পরিচালক। ‘‘আশপাশে সব সময় যে আবহাওয়া বজায় থাকে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সরল, যেন ঝরনার জল। আমরা আমাদের হাসিখুশি বজায় রাখি নানা ধরনের খেলাধুলোর মাধ্যমে, যেমন জ্যোতিষ গণনা, হাত দেখা বা টাকাপয়সার হিসেব–নিকেশ।’’ এমনকী ভারতেও ইউ জী–কে ঘিরে থাকে জ্যোতিষ ও হস্তরেখা বিশারদরা। ইউ জী–র জন্মকুণ্ডলী বিশ্লেষণ করে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। আর ইউ জী–র ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ভালো করেই জানেন যে এসব হল তাঁর হালকাভাবে সময় কাটানোর সরঞ্জাম মাত্র।

আমরা যখন জ্যোতিষ ও হস্তরেখা নিয়ে আলোচনা করছি – দেখা যাক ১৯৮৮ সালে এক নাদি জ্যোতিষী ইউ জী সম্পর্কে কি বললেন, এই সমস্ত বিষয়ে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁদের হয়তো কৌতূহল জাগবে। নাদি হল এক বিশেষ ধরনের জ্যোতিষ বিদ্যা – ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়, বিশেষ করে দক্ষিণে। এর এক বিশেষ ধারায় যাকে কৌমার নাদি বলা হয়, জ্যোতিষী বিশাল একগুচ্ছ তালপাতায় লেখা ভবিষ্যৎ ফলাফল নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হবে। এসব লেখা বংশানুক্রমে জ্যোতিষীর কাছে আছে, অর্থাৎ এটা হল বহু জন্ম ধরে পারিবারিক পেশা। তালপাতার উপর বহুশত বৎসর পূর্বে এক অজ্ঞাত ভাষায় লেখা আছে, যে সমস্ত লোক জ্যোতিষীর কাছে আসবে তাঁদের ছক ও ভাগ্যের বিস্তারিত ফলাফল বর্ণিত আছে (এই বর্ণনায় তাঁদের নাম, পশ্চাৎপট, অতীত ও ভবিষ্যৎ ফল নিয়ে বিস্তারিত লিখিত আছে)।

এই কৌমার নাদির দু’গোছা তালপাতা থাকে। একটা বড় গোছা, যাতে সবকিছু লেখা এবং দেখলেই মনে হবে যেন বহুযুগ আগের জিনিস, আর একটা ছোট গোছা যা সূচিপত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এসব তালপাতায় দুর্বোধ্য তামিল ও তেলেগু ভাষায় যে জ্যোতিষবাণী লেখা আছে তা শুধু সেই জ্যোতিষী বোঝেন। নাদি জ্যোতিষীর কাজ হল, ঠিক ঠিক পাতা খুঁজে বার করা, যাতে প্রশ্নকর্তার ভবিষ্যৎ উল্লিখিত আছে এবং সেই লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করা।

নাদি জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত নাগরাজ তাঁর কাজ শুরু করলেন একগোছা সুগন্ধী ধূপকাঠি জ্বালিয়ে, তারপর ভক্তিভরে সেই ধূপের ধোঁয়া তাল পত্রলিপির চতুর্দিকে বারবার ঘোরাতে লাগলেন। এই পূজার কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি ইউ জী–র

হাতে একটা লম্বা সুতোর একপ্রান্ত ধরিয়ে দিলেন, সুতোর অপরপ্রান্ত তালপাতার সঙ্গে জড়ানো। ইউ জী-কে বললেন, এই সুতোর সাহায্যে তালপাতার গোছাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কয়েকভাবে ভাগ করতে। যেখানে ইউ জী তালপাতার গোছাকে দু'ভাগ করলেন। জ্যোতিষী সেখান থেকে একটা পাতা নিয়ে ইউ জী সম্পর্কে পড়া শুরু করলেন। এই তালপাতায় কোনও এক অজানা জ্যোতিষীর বহু বছর আগে লেখা ভবিষ্যৎবাণী উপস্থিত সবাইকে বিস্ময়ে হতভম্ব করে দিল। সেই প্রাচীন লেখকের সঠিকতা এবং যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ইউ জী-র সম্পর্কে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা সবার কাছে শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনি বলে মনে হল।

ইউ জী নাদি জ্যোতিষীর কাছে সম্পূর্ণ অচেনা লোক। সেই তালপত্রে লেখা ইউ জী-র সম্পর্কে গুণগান ও প্রশংসাবাক্য পড়তে পড়তে জ্যোতিষী নিজেই অসম্ভব রকমের অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন।

> এই ব্যক্তি সম্পর্কে বলার আর কি-ই বা থাকতে পারে, যিনি সমস্ত কিছুর উপর অনাসক্ত হয়ে জীবনযাপন করেন। তিনি যেন পদ্মপত্রে একবিন্দু নীর। রামায়ণের ভরত চরিত্রের মতন সমস্ত রাজসিক সুখসমৃদ্ধির মধ্যে থাকা সত্ত্বেও এসবের উপর জাতকের কোনও আগ্রহ নেই। বুধ ও শনির বিশেষ যোগ তাঁকে জীবনের সারমর্ম গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। তিনি বহু পড়াশুনা করেছেন এবং তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা আছে।

শ্রীযুক্ত নাগরাজ এবার পড়া বন্ধ করে দিলেন। সন্দেহের দৃষ্টিতে ইউ জী-র দিকে তাকালেন, তাহলে কি ভুল করে অন্য লোকের তালপাতা পড়তে শুরু করেছেন? ইউ জী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, সব আপাতত ঠিক আছে, আপনি পড়ে যান। তিনি আবার তালপাতার লেখা পড়তে শুরু করলেন।

> এই ব্যক্তি তাঁর রবিদশায় উজ্জ্বল সূর্যের মতন অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। জাতক আদি বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে কোনও এক জায়গায় তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন না। তিনি কোনওরকম দীক্ষা গ্রহণ করেননি; তিনি দীক্ষা নিয়েই জন্মেছেন। তাঁর শিক্ষা কোনও সাধু-সন্ন্যাসী বা বনবাসী

> মুনি–ঋষিদের মতন নয়; তবু তাঁর শিক্ষার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু যাঁরা তাঁর কাছে বিশেষ কোনও প্রত্যাশা নিয়ে আসেন, তাঁদের তিনি হতাশ করে ফিরিয়ে দেন। এই ব্যক্তিকে 'আত্মা' বলে অভিহিত করা উচিত, কোনও 'ব্যক্তি' বলে নয় (এর মধ্যে দিয়ে লেখক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তাঁর মধ্যে কোনও বিশেষ ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই)।

এরপর যেন সেই প্রাচীন অতীন্দ্রিয়বাদী পুরুষের একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, তাই লিখেছিলেন, 'এক ঘটিকা (২৪ মিনিট) পরে আবার তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করব।' নাগরাজ মহাশয় তাই পড়া থামিয়ে তালপাতার বইটি বন্ধ করে রাখলেন। ইউ জী এবং তাঁর বন্ধুরা দারুণ উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন আরও কিছু শোনার জন্য। তখন ইউ জী বন্ধুদের বললেন যে, কীভাবে তাঁর জীবনে বারবার জ্যোতিষী গণনা অনুযায়ী সব ঘটনা ঘটেছে। তিনি তখন বলতে লাগলেনঃ

> আমি জ্যোতিষশাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর সঠিকতা সম্পর্কে জোর দিয়ে কোনও বক্তব্য রাখতে না পারলেও এটা বলতে পারি যে, যদি কেউ গভীরভাবে কোনও বিশেষ ব্যক্তির জন্মতালিকা নিয়ে অধ্যয়ন করতে চান, তাহলে আমার ছক একটা ভালো উদাহরণ। আমার জীবনে যা যা ঘটেছে, তা পুরোপুরি আমার ছকের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঘটেছে। বিশ্বাস আপনারা করুন আর নাই করুন, সেটা আপনাদের উপর নির্ভর করে।

ইতিমধ্যে যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন নাদিতে ইউ জী সম্পর্কে আরও কি লেখা আছে তা জানবার জন্য। আমরা শ্রীযুক্ত নাগরাজ মহাশয়কে একটু তাড়া দিলাম বাদবাকিটুকু পড়ে শোনাতে। তিনি একটু ইতস্তত করে বই খুললেন। তালপাতার বই যখন আবার খোলা হল – সবার তখন পুনরায় বিস্মিত হবার পালা – অবাক কাণ্ড – যে তালপাতা সবাইকে অভিনন্দন জানাল – তা শূন্য – কোনও কিছু লেখা নেই। যেন প্রাচীন ঋষি আমাদের তাড়াহুড়োর কথা সেই যুগেই দেখতে পেয়েছিলেন। 'শূন্য পত্র মানে আমার ভবিষ্যৎ শূন্য।' ইউ জী–র তাৎক্ষণিক উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল।

বইটি পুনরায় বন্ধ করা হল এবং আধ মিনিট পরে খোলা হল। যে পত্রটি এবার

সামনে হাজির হল, তাতে লেখা ছিল ঃ

> যখন থেকে আমরা পড়া বন্ধ করেছিলাম তখন থেকে চব্বিশ মিনিট পূর্ণ হতে আরও দেড় মিনিট বাকি আছে। এরকম একজন লোকের জন্য এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও উপযোগিতা নেই। তৎসত্ত্বেও শুধু আমোদ ও আনন্দ দেবার জন্য এই লেখা বজায় রাখা হল। আপনারা এই লেখককে শ্রদ্ধা না জানালেও কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যিনি এখন আপনার সামনে আছেন তাঁর প্রতি প্রণাম জানালে অশেষ মঙ্গল হবে।

শ্রীযুক্ত নাগরাজ মহাশয় একবার ইউ জী-র দিকে তাকালেন, তারপর আবার পড়তে শুরু করলেন ঃ

> এখন থেকে আগামী এগারো বছর পর্যন্ত তিনি যেখানেই যান না কেন, এক সৌভাগ্য আত্মা তাঁকে তাড়া করে বেড়াবে। কিছুতেই সেই সৌভাগ্য তাঁর পিছু ছাড়বে না। ... এই ব্যক্তি যখন যে কাজ করুন না কেন, যেমন খাওয়া, হাঁটা, পান করা বা ঘুমানো ... তিনি এক সহজ সমাধির মধ্যে থাকেন। ('স্বাভাবিক যোগাবস্থা' যাকে মুক্তির অবস্থা বলা হয়) ... চন্দ্র দশার শেষ অবস্থায় তাঁর সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় লোককে আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষিত করে দেবে ... এই রকম একজনের কাছে এই লেখার কি কোন মূল্য আছে?

এই সুন্দর বাক্যালঙ্কারের সহযোগে নাদি লেখার পরিসমাপ্তি ঘটল। কে চন্দ্রশেখর, যিনি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি উপরোক্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন।

কখনও কখনও হঠাৎ কোনও কিছুর উপস্থিতি ছাড়াই এক আকস্মিক ঝড় সবাইকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় যারাই ইউ জী-র আশপাশে থাকেন। তাঁর প্রতিটি শব্দ তখন যেন তেজদৃপ্ত কোনও এক উৎস থেকে নির্গত হচ্ছে বলে মনে হয়। চারিদিকে আবহাওয়াতে দেখা যায় এক অদ্ভুত বৈদ্যুতিক প্রভা। দুর্ভাগ্যবশত ঠিক এই মুহূর্তগুলোকে কিছুতেই পাকাপাকিভাবে ধরে রাখা যায় না। জানি না কি কারণে, যদি কেউ এই রকম আশা নিয়ে রেকর্ড করার জন্য তৈরি হয়ে আসেন, তাহলে সে মুহূর্ত কখনও আসে না। যাঁরা যাঁরা এরকম সময়ে উপস্থিত থাকেন তাঁরা হতবুদ্ধি

হয়ে বাড়ি ফেরেন। তাঁদের এমনকী মনে করতেও রীতিমতো কষ্ট হয় যে কি ঘটনা ঘটেছিল। এমন ধরনের ঘটনা অবশ্য যে কোনও সময় ঘটতে পারে, ইউ জী–র সঙ্গে হাঁটতে বেড়াতে গেলে, যখন ইউ জী রান্না করছেন বা ইউ জী–র সঙ্গে গাড়ি চালানোর সময়ও এটা হতে পারে।

কখনও কখনও লোকজন এসে ইউ জী–র আশপাশে চুপচাপ বসে থাকেন; তাঁরা কোনওরকম আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না। যে সাধারণ অনুভূতি সবাই লক্ষ্য করেন, তা হল প্রশান্তি, সুরক্ষিত ভাবনা, সহজ ও স্বস্তিদায়ক অন্তরঙ্গতা এবং অদৃশ্য যোগাযোগ স্থাপন। আমার বান্ধবী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী স্বর্গীয়া স্মিতা পাতিল আমাকে অনেকবার ইউ জী–র উপস্থিতিতে এই অদ্ভুত স্বস্তিদায়ক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আপনি কখনও নিজেকে পুরোপুরি রক্ষা করে তাঁর সামনে থাকতে পারছেন না, কারণ আপনার সত্তার উপর তাঁর উপস্থিতি গভীর প্রশ্ন চিহ্ন রাখবে।

এমনকী অচেনা লোকেরাও তাঁর প্রতি আকর্ষিত হন। এইরকম একটা ঘটনার কথা বললে হয়তো ব্যাপারটা বোঝা যাবে ঃ

রবার্ট কার (বব) নিজেই ছিলেন এক ছোট–মোট গুরু। প্রায় পঁচিশ বছর আগে তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্যও ছিল, যখন তিনি প্রথম ইউ জী–র সঙ্গে দেখা করেন। ইউ জী–র সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিনি তাঁর গুরুগিরির দোকান বন্ধ করে দেন এবং সানফ্রান্সিসকোতে একটা ছোট রেস্টুরেন্ট খোলেন। একদিন এই রেস্টুরেন্টে ইউ জী–র থেকে কয়েক টেবল দূরে বসে এক দম্পতি সারা সন্ধ্যাবেলা তাঁকে লক্ষ্য করার পর রবার্টকে এক কৌতূহলজনক মন্তব্য করেন। সেদিন যে কথাবার্তা হয়েছিল, তা ছিল এইরকমঃ ‘কে এই ভদ্রলোক? তিনি কি কোনও গুরু?’ দম্পতি প্রশ্ন করেন। ‘না–না তিনি গুরুবিরোধী লোক, বস্তুত একজন সাধারণ ব্যক্তি।’ রবার্ট উত্তর দেন। রবার্টের এই উত্তর তাঁরা মেনে নিতে পারলেন না। তাঁদের একজন তখন বললেন, ‘আমার মনে হয়, তিনি এমন কিছু জানেন যা আমরা অন্য কেউ জানি না। কিন্তু তিনি আমাদের সেটা বলবেন না ...।’ রবার্ট নীরবে কিছুক্ষণ হাসলেন।

আমি তখন একটা ব্ল্যাক প্যান্থারের খোঁজ করছিলাম। আমার এক সিনেমার শ্যুটিং–এর জন্য। সেই ছবির প্রধান চিন্তাধারা ছিল অতি প্রাকৃত ঘটনা। খোঁজ করতে

করতে রোমে এসে হাজির হলাম। সৌভাগ্যবশত ইউ জী তখন রোমে ছিলেন। মনে আছে, এই সমাপতনে আমার দারুণ আনন্দ হয়েছিল। আমার সেই সময়কার ইউ জী-র সঙ্গে ভোরবেলা বেড়াতে যাওয়ার স্মৃতি তৎকালীন অনুভূতিগুলোকে আজও জীবিত করে তোলে। সেই চিত্রসদৃশ ভোরের দৃশ্য, চৌকো পাথরের সরু রাস্তা, পায়রার কোলাহল আর ভ্যাটিকান গির্জা থেকে ভেসে আসা ঘণ্টার ধ্বনি আজও আমার মধ্যে এক অসাধারণ অনুরণন জাগায়। ''বিশ্বাস এক বিশাল কারিগরী শিল্প। প্রতিটি গির্জা, প্রতিটি মন্দির, প্রতিটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে মানুষের প্রতারিত হবার প্রবণতার উপর ইটের পর ইট গেঁথে। যিশুর যদি এইরকম সুরক্ষিত বাহিনী থাকত, তাহলে কোনওদিন খ্রিস্টধর্মই প্রতিষ্ঠিত হত না।'' ভ্যাটিকান প্রহরীদের দেখিয়ে ইউ জী আমাকে বললেন।

রোমের প্রান্তদেশে এক ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানায় আমি অবশেষে ব্ল্যাক প্যান্থারের খোঁজ পেলাম। ড্যানিয়েল ভদ্রলোকের নাম। ইতালিয়ান এই পশুশিক্ষক চিড়িয়াখানার মালিক। রোমে আমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি, তাই ইউ জী-র সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম ড্যানিয়েলের কাছে যাওয়ার জন্য। সেখানে সেদিন যা ঘটেছিল তা আজও আমার কাছে বিস্ময় হয়ে রয়ে গেছে। পশুশিক্ষক ভদ্রলোক আমাদের ব্ল্যাক প্যান্থার দেখাতে চিড়িয়াখানার ভেতরে নিয়ে গেলেন। দেখে মনে হল, পশুটির কোনও ট্রেনিং হয়নি। এই পশুকে ফিল্ম শ্যুটিং-এর জন্য ব্যবহার করার কোনও সম্ভাবনাই দেখলাম না। ড্যানিয়েল আমাদের হাবভাব বুঝতে পেরে, আমাদের নজর অন্য একটা দারুণ সুন্দর ন-ফুট লম্বা বাঘের দিকে আকর্ষণ করিয়ে বললেন, 'এই জন্তুটি ইউরোপের সবচেয়ে শিক্ষিত বাঘ।' ইতিমধ্যে ব্ল্যাক প্যান্থার উত্তেজিত হয়ে মৃদু মৃদু গর্জন করে উঠে দাঁড়াল, ইউ জী সেই কালো বাঘের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং ইঙ্গিত করে বললেন, 'চুপ করে বসো।' ব্ল্যাক প্যান্থার যেন তাঁর কথা মেনে নিয়ে চুপ করে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। ড্যানিয়েল এবং তাঁর স্ত্রী প্রথমে দারুণ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। পরে যখন বারবার ইউ জী সেই ব্ল্যাক প্যান্থারকে শান্ত করে দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা এমনই আশ্চর্য হয়েছিলেন যে শেষপর্যন্ত হতবাক ড্যানিয়েল আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার বন্ধু কি কোনও বিশেষ পশুশিক্ষক?'

রবিবার সকালবেলা প্যারিসের রুঁ বোনাপার্ট ও বুলেভার্ড সেইন্ট জারমেইনের

মোড়ে এক গির্জার বাইরে প্রাতঃভ্রমণ করছিলেন ইউ জী। একজন ফোটোগ্রাফার ইউ জী–কে না জানিয়ে পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা ইউ জী–র একটা ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার এই ছবিটি কি আপনি চান?' ইউ জী সরাসরি বললেন, 'না'। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে তাঁরা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, 'আমি নিতে রাজি আছি' – বলে উঠলেন এক সুন্দরী সুসজ্জিতা যুবতী। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ইউ জী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ২০০ ফ্রাঙ্ক খরচা করে আমার ছবি কিনতে যাবেন কেন?' 'আমার এই মুখটা খুব ভালো লাগছে তাই' – ফোটোগ্রাফারকে পয়সা দিতে দিতে মেয়েটি শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন। দু' সপ্তাহ পরে ঠিক একই জায়গায় ইউ জী–র সঙ্গে সেই তরুণীর দেখা হল। ইউ জী–কে তাঁর বাড়িতে আসার জন্য নিমন্ত্রণের সুরে বললেন, 'আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই, আসুন।' তিনি একটা বাড়ির সাততলায় থাকেন, আর সেখানে কোনও লিফট নেই। ইউ জী এবং সেই তরুণী যখন সরু ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন, তখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, প্রতিবেশীরা তাঁকে বেশ অবাক হয়ে দেখছেন। তরুণীটি ছিল বারবনিতা। ঘরের ভেতর যখন ইউ জী প্রবেশ করলেন, দেখলেন যে তরুণীর বিছানার উলটোদিকে দেওয়ালে ইউ জী–র বড়সড় একটা ছবি।

পরে তিনি ইউ জী–কে সবিস্তারে জানালেন কেন এই ধরনের পথে নেমেছেন। ঘটনাটা ছিল এই রকম ঃ বাবা–মার সঙ্গে ঝগড়া করে ঘর ছেড়ে প্যারিসে এসেছেন, সরবন–এ পড়াশুনা করবেন বলে। কিন্তু পড়াশোনা চালানোর খরচা জোগাড় করতে বারবণিতা হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ইউ জী গভীর মনোযোগ দিয়ে সব ঘটনা শুনলেন, কিন্তু কোনওরকম কিছু বললেন না। ইউ জী যখন ফিরে আসার জন্য উঠলেন, তখন মেয়েটি বললেন, ''আশ্চর্যের কথা কি জানেন, আপনি হলেন এই প্রথম একজন মানুষ যিনি আমার কাহিনি শুনে জীবনের সেই ধারাকে পরিবর্তন করার কোনওরকম উপদেশ দিলেন না। এমনকী যেসব গ্রাহক যাদের আমি রবিবার সকালে গির্জা থেকে বেরিয়ে আসার সময় পাকড়াও করি, তারাও আমায় জ্ঞানবাক্য না শুনিয়ে ছাড়ে না ... এবার বলুন আপনি কে?'' ইউ জী মৃদু হেসে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন।

ইউ জী কোনও জায়গায় পৌঁছানোর আগেই মনে হয় সে জায়গা ছেড়ে চলে

যাচ্ছেন। বম্বেতে পৌঁছেই প্রথম দু' তিন ঘণ্টা কাটে পরবর্তী কোথায় যাবেন তার পরিকল্পনা করতে করতে। আমার এক বন্ধু একদিন এসব দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ জী, আপনি কেন এতো ঘুরে বেড়ান?' ইউ জী উত্তরে বললেন, ''আমার ভ্রমণ সবসময় নির্ভর করে জলবায়ুর উপর। আমি সেই গোল্ডেন প্লোভারের মতন এক পাখি। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমিও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাই। গোল্ডেন প্লোভার সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে চলে যায়, আবার সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে ফিরে আসে। একমাত্র এইভাবেই আমার ও সেই পাখির পক্ষে স্বস্তিতে থাকা সম্ভব। সেই পাখি কখনও বাসা তৈরি করে না, আর আমারও কোনও ঘরবাড়ি নেই।''

চোদ্দো বছর বয়স থেকে এভাবেই চলছে ইউ জী-র জীবন। তিনি চীন দেশ ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত দেশে গিয়েছেন (অনুবাদক তাঁর চীনদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে সংবাদ পেয়েছেন। মহেশবাবু এই বই লেখার কিছুদিন পরে ইউ জী চীন দেশে গিয়েছিলেন) আপাতত তিনি তাঁর সময় ভারত, ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াতে কাটান।

যে কোনও সময়ে ইউ জী-র জীবনে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ওজন কুড়ি কিলোগ্রামের উপরে ওঠে না। এখন সে ওজন কমতে কমতে পাঁচ কেজিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং ইউ জী মনে করেন যে আরও কমানো উচিত। শুধু একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। প্রত্যেক বছরের শেষের দিনে অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর তিনি সমস্ত টাকাপয়সা যা খরচ হয়নি, তা অন্য কাউকে দিয়ে দেন। তাঁর ভ্রমণের ধারা ও রূপ যে কি হবে আগে থেকে কারো পক্ষেই বলা সম্ভব হয় না। ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় টেরি নিউল্যান্ডের মৃত্যু ঘটে (ইউ জী যখন ক্যালিফোর্নিয়ার মিল ভ্যালিতে যেতেন, তখন তিনি টেরির স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন), এর ফলে তাঁর ভ্রমণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটবে বলে বন্ধুরা মনে করেন।

১৯৯১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, কারমেলে শরৎকাল এসে গেছে। শরতের নিস্তব্ধ চাঁদনি রাতে আমি মার্কিন মুলুকের এই ড্রয়িংরুমে বসে আমার পাণ্ডুলিপি নিরীক্ষণ করছি। নিজেকে যতখানি সম্ভব নিংড়ে দিয়েছি এই পাতাগুলো ভরানোর চেষ্টায়। এই বই লিখতে লিখতে আমি অনেকদূর এসেছি। আমার টেবিলের উপর বেশ

কয়েকটা সূত্রপাতের নমুনা আছে। এক ভদ্রলোক একবার বলেছিলেন, ‘ইউ জী–র সঙ্গে বসে একবার মধ্যাহ্ন ভোজন করলে একটা পুরো বই লিখে ফেলা যায়।’ একটা লাইব্রেরি ভরিয়ে দেওয়া যায়, শুধু এই ব্যক্তির সম্বন্ধে বই লিখে, যার নাম হল ইউ জী। যে কোনও বই শুরু হওয়ার পর তার একটা শেষ আছে। ঠিক যেমন সিনেমা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু ইউ জী–র জীবনের গল্পের যেন কোনও শেষপর্ব নেই। ইউ জী–র জীবনের উপর একটা শেষ পর্ব জুড়ে দেওয়া যেন কোনও সিনেমার সমাপ্তি দৃশ্যে আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা নির্গমণের স্থির ছবি দেখানোর মতন মনে হচ্ছে। তাহলে কীভাবে গল্প লেখক এমন একটা গল্পের সমাপ্তি টানবে যার শুরুও নেই বা শেষও নেই? সে কখনই তা পারে না ...।

আমি যখন এই বই লেখা শেষ করে সবকিছু একত্র করার আয়োজন করছিলাম, তখন আমার পিঠে মৃদু আঘাত দিয়ে আমার কাজের বাহবা জানিয়ে ইউ জী বললেন, ‘এটা শুধু এক রূপকথার কাহিনি!’ একটা ছোট্ট পোস্টারে লেখা ‘কারমেলে ইউ জী ও মহেশ স্বাগতম!’ যা বন্ধুরা আমাদের এই ঘরের দেওয়ালে লাগিয়েছিল – তা প্রায় উঠে এসেছে। ‘অর্থাৎ আমাদের এখান থেকে বিদায় নেবার সময় হয়েছে, আমাদের এখন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় যেতে হবে’ – দেওয়ালের সেই লেখাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইউ জী আমাকে জানান দিলেন।

যখনই আমি ইউ জী–র সঙ্গে কিছুদিন থাকার পর বিদায় জানাই, তখনই আমার মধ্যে এক মিশ্র অনুভূতি জাগে, একদিকে নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তিভাব আর অন্যদিকে গভীর বেদনা। মনে মনে ভাবলাম, আমি কোনওদিন ডানলিন পাখির মতন গোল্ডেন প্লোভারকে অনুসরণ করতে পারব না। ইউ জী–র সঙ্গে গাড়িতে করে সানফ্রান্সিসকো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দিকে যেতে যেতে কারমেলের সেই বাড়িটা যেখানে আমরা গত একমাস ধরে ছিলাম, আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ভাসতে লাগল। গাড়ি থেকে নেমে আসতে আসতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন ইউ জী?’ ‘এখানে সানফ্রান্সিসকো বে (উপসাগর) এলাকায় কিছুদিন থেকে, তারপর অস্ট্রেলিয়া যাব’ – তিনি উত্তরে জানালেন। ‘আমি নিউইয়র্ক বা লন্ডন থেকে আপনাকে ফোন করব’ আমি বললাম (এমন ভাব দেখিয়ে যেন কিছু হয়নি), এই বিদায়ের ব্যাপারটা অত্যন্ত স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা নিয়ে।

'যতক্ষণে আপনি জানতে পারবেন আমি কোথায় আছি, আমি হয়তো তার মধ্যে অন্য কোথাও চলে যাব।' গাড়িতে চলে যেতে যেতে ইউ জী জানিয়ে দিলেন। আমার অভিমান ও বাক্যের রেশ আমার মুখ থেকে বেরোবার আগেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ঃঃ – ঃঃ

দ্বিতীয় খণ্ড

কথোপকথন

এই কথোপকথন টেপ রেকর্ডে ধরা হয়েছিল,
যা ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে লেখক এবং অন্যান্য
অনেক লোকের গত বহু বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- *যেহেতু আমি একজন চিত্র নির্মাতা সেহেতু 'সৃজনশীলতা' নিয়েই আমি আলোচনা শুরু করতে চাই। এই প্রসঙ্গে বহু কিছুই আলোচিত হয়েছে। এই বিষয়ে আপনার কি বলার আছে?*

সৃজনশীলতা বলে কোনও কিছুই নেই। লোকে যা করে তা হল, যা ছিল বা আছে তাকে নকল করে। যখন আপনি কোনওরকম আদর্শের প্রয়োগ বা ব্যবহার করবেন না, তখন যা আপনার ভেতর থেকে সৃষ্টি হবে তাকে হয়তো সৃজনশীলতা বলা যেতে পারে, আর সে জিনিসকে পুনরায় আপনি অন্য কোনও কাজে আদর্শ হিসাবে উপযোগ করতে পারবেন না। সেখানেই তার শেষ। আপনি যদি কোনও মানুষের মুখের দিকে তাকান বা একই গাছের দু'টো পাতার দিকে ... দেখবেন কোনও দু'টো মুখ একরকম নয়, কোনও দু'টো পাতা একরকম নয়।

- *প্রকৃতির নানা পরিবর্তনের পেছনে যেন মনে হয় কোনওরকম উদ্দেশ্য আছে, একটা পরিকল্পনা আছে – আপনার কি সেইরকম কিছু মনে হয় না?*

আমি কোনও কিছুর মধ্যেই কোনওরকম পরিকল্পনা বা সংগঠন দেখতে পাই না। অবশ্যই একটা প্রক্রিয়া বর্তমান ... একে বিবর্তন বলতেও রাজি নই ... আর যখন এই প্রক্রিয়া ধীর হয়ে আসে তখন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি যেন আবার সব কিছুকে একত্র করে নতুন করে শুরু করতে চায়। শুধু সৃজন করার তাগিদে। শুধুমাত্র একেই প্রকৃত সৃজনশীলতা বলা যেতে পারে। প্রকৃতি কোনও কিছুকে আদর্শ হিসাবে ব্যবহার করে না। বা কোনওরকম অতীতের উদাহরণের উপযোগ করে না, সেই দৃষ্টিতে শিল্পকলার সঙ্গে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই।

- *আপনি কি তাহলে বলতে চান যে শিল্পী, কবি, সংগীতজ্ঞ বা ভাস্করদের মধ্যে সৃজনশীলতা বলতে কিছু নেই?*

আপনি কেন শিল্পকলাকে কারিগরী বিদ্যার থেকে উচ্চস্তরে স্থান দিতে চান? যদি শিল্পীর সৃষ্টির কোনও বাজার না থাকে, তাহলে তাঁর ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যাবে। এই বিশাল বাজারের জন্যই এইরকম শিল্প ও তার তথাকথিত সৃজনশীলতার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে জন্মেছে। একজন শিল্পী হল একজন কারিগর, ঠিক অন্য সমস্ত কারিগরদের মতন। তিনি তাঁর সেই বিদ্যার উপযোগ করেন নিজেকে প্রকাশ করার জন্য। মানুষের সৃষ্ট সমস্ত কিছুর জন্ম হয়েছে ভোগ–বাসনা চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে। আমি ভোগ–বাসনার বিরুদ্ধে কোনও কিছুই বলতে চাই না। সমস্ত কলা

ভোগ-বিলাসের আন্দোলন মাত্র। আর সেইসব আনন্দ অনুভূতিও আপনাকে আপনার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। আর যদি সেটা আপনি না করতে পারেন, তাহলে সে শিল্পীর শিল্পকলা বোঝার কোনও ক্ষমতা আপনার থাকবে না, তাঁরা যে সৌন্দর্যকে এমন মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছেন তার কোনও কিছুই আপনার বোধগম্য হবে না। আর আপনি যখন তাঁদের সৃজনশীলতার উপর প্রশ্ন করেন, তখন তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করে আপনাকে উপহাস করবে, বলবে আপনার মধ্যে এই সূক্ষ্ম অনুভূতি জন্মায়নি। অবশেষে আপনাকে বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে তাঁদের শিল্পের মর্ম উপলব্ধি করানোর শিক্ষা দেবে। আপনি যদি কোনও স্বনামধন্য কবির কবিতা পড়ে বাহবা দিতে না পারেন, তাহলে আপনাকে শিক্ষা নিতে হবে কবিতাকে প্রশংসা কীভাবে করতে হয়। কি করে চিত্রকলা বুঝতে, কীভাবে সংগীতকে বুঝতে হয়, কীভাবে সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হয়, এসবও আপনাকে শিখতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এইসব কিছুরই তো শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং তাঁরা এভাবেই আপনার মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবিকা অর্জন করেন। শিল্পীরা মনে মনে এটা ভেবে খুবই স্বস্তি বোধ করেন যে, তাঁরা সৃজনশীল কর্মে লিপ্ত; 'সৃজনশীল শিল্প', 'সৃজনশীল ভাবনা', 'সৃজনশীল রাজনীতি' – এসব অর্থহীন ব্যাপার। সত্যি বলতে কি এসবের মধ্যে সৃজনশীলতা বলে কিছুই নেই। আমি এই অর্থে একথা বলতে চাই যে মৌলিক, নতুন বা অতীতের সমস্ত কিছুর থেকে মুক্ত বলে কিছুই নেই। শিল্পীরা এখান থেকে কিছু, সেখান থেকে কিছু জোগাড় করে, সবকিছু একত্র করে আপনার সামনে তুলে ধরেন, আর মনে করেন অসাধারণ কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা সবসময় কিছু না কিছু নকল করেছেন। যার অস্তিত্ব আমাদের মধ্যে বর্তমান। 'নকল' করা আর 'ঘরানা' এই হল আমাদের সৃজনশীলতা। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা ঘরানা আছে, এসব নির্ভর করে আমরা কোন স্কুলে শিক্ষিত হয়েছি, কোন ভাষায় শিক্ষা লাভ করেছি, কোন বই পড়েছি এবং কোন কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, তার উপর। আবার সেই কোনও এক বিশেষ কাঠামোর মধ্যেও বিশেষ বিশেষ নিজস্বতার নমুনা আছে (সেই কাঠামোর ও নমুনার বিশুদ্ধতম প্রয়োগই হল তাঁদের কাজ)। তাঁরা যা করেন তা হল, সেই কাঠামোর মধ্যে থেকে কোনও একটা স্টাইলকে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর করে তোলেন। আপনি অবাক হয়ে যাবেন এটা শুনে যে, কম্প্যুটার একদিন এমন ছবি আঁকবে আর এমন সংগীত

রচনা করবে যা হবে অতীতের সমস্ত শিল্পী ও সমস্ত কম্পোজারদের থেকে আরও উচ্চস্তরের। এটা হয়তো আমাদের জীবৎকালে নাও ঘটতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে একদিন সম্ভবপর হবেই। আসল কথা হল, আপনি কম্প্যুটারের থেকে কোনওভাবেই আলাদা নন। আমরা একথা মানতে রাজি নই, কারণ আমাদের বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, আমরা কোনও যন্ত্র নই – আমাদের মধ্যে এই যান্ত্রিক সত্তার থেকে অনেক উঁচুস্তরের মহান কিছু আছে। ভবিষ্যতে একদিন এটা মানতে হবে যে আমরা একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নই। মানুষ শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন পদ্ধতির উপযোগে যে বুদ্ধি অর্জন করে, তা প্রকৃতির দেওয়া বুদ্ধির তুলনায় অতি নগণ্য। আমাদের বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব বেড়ে ওঠে এই কারণে যে একে চিহ্নিত করা হয় আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ হিসাবে, আমাদের বুদ্ধি ও শিল্পের প্রকাশ হিসাবে। নিজেকে প্রকাশ করার যে তীব্র বাসনা, তার জন্ম হয়েছে স্নায়বিক পীড়া থেকে, যাকে পশ্চিমে বলে 'নিউরোসিস'। এই কথা মানবজাতির সমস্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সরাসরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা বলে কোনও জিনিস নেই। সমস্ত রকমের কলা বস্তুতপক্ষে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অভিব্যক্তি মাত্র।

- *আত্ম-অভিব্যক্তির মধ্যে কি কোনও বিশেষ জিনিস আছে, ইউ জী? যে কোনও গভীর মহান অভিজ্ঞতা লাভের পর আপনি সেটা অন্যকে বলার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন বা নিজেকে পুনরায় বলার চেষ্টা করেন। নিজেকে ব্যক্ত করার যে অসাধারণ প্রেরণা, এর পেছনে মহান কিছু আছে কি?*

আমার অভিজ্ঞতা বা আপনার অভিজ্ঞতা বলে কিছু নেই। যখন আপনি কোনও অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং যে মুহূর্তে নিজেকে বলেন যে, এ এক মহান অভিজ্ঞতা, সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে বলার এবং অন্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিনিময় করার প্রয়োজনীয়তা জন্ম লাভ করে। যখন আপনি ও আমি কোথাও বাইরে হাঁটতে যাই, তখন আচমকা আপনি এমন কিছু দেখেন যা আপনি আগে কখনও দেখেননি, সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে সেটা অসাধারণ কিছু বলে মনে হয়। এবং যখনই আপনি নিজেকে বলেন যে, এই অভিজ্ঞতা অতি অসাধারণ, কারণ এর আগে এই জিনিস কখনও লক্ষ্য করেননি, সঙ্গে সঙ্গে আপনার মধ্যে একটা চাহিদা জেগে ওঠে ... যেটা আপনার আত্মসন্তুষ্টির বা পরিপূর্ণতার একটা অংশ ..., অন্যের সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করার। আপনি যে কোনও অভিজ্ঞতা লাভ করুন না

কেন, এর আগে কেউ না কেউ সেই অভিজ্ঞতা অবশ্যই লাভ করেছে, আপনি যখন আপনাকে বলেন, ‘আঃ! আমি পরমানন্দের অবস্থায় আছি’, তার অর্থ হল, আপনার আগে কেউ এই অবস্থা উপলব্ধি করেছেন এবং আপনাকে হস্তান্তরিত করে গেছেন। হস্তান্তরিত করতে সে যে মাধ্যমেরই উপযোগ করে থাকুন না কেন, অভিজ্ঞতা সবসময় পরোক্ষ, তৃতীয় হস্তান্তরিত বা বহু হস্তান্তরিত জিনিস। এটা আপনার নয়, আপনার নিজের অভিজ্ঞতা বলে কোনও জিনিস নেই। আর এই সমস্ত অভিজ্ঞতা তা সে যতই মহান বা অসাধারণ হোক না কেন, এর কোনও মূল্য নেই।

- *সত্য কি তা আমরা জানতে চাই। আমরা জানতে চাই নির্বাণ বা জ্ঞানালোক কি জিনিস।*

আপনারা নিশ্চয়ই এসব জানেন। একথা বললে আমি বিশ্বাস করব না যে, আপনারা এসবের অর্থ জানেন না। সত্য বলে কোনও কিছু নেই।

- *তাহলে এসব কিছুর (ইউ জী–র সন্ধান এবং ‘ক্যালামিটি’ বা ‘দুর্যোগ’) অর্থ কি এই দাঁড়াল যে, আগে থেকেই এসব পরিকল্পিত ছিল?*

যদি তাই সত্যি হয়, তাহলে আপনাকে পরিবর্তনের এবং মূলগত রূপান্তরের সমস্ত ধারণাকে বর্জন করতে হবে। আমি এই সমস্ত ধারণাকে উড়িয়ে দিয়েছিলাম এই কারণে যে, পরিবর্তন সাধন করার মতন কোনও কিছুই আমি কোনওদিন লক্ষ্য করিনি। মনের রূপান্তরের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না, সে আপনি মৌলিক বা আর যা–ই বলুন না কেন। ওসব পাগলের প্রলাপ। কিন্তু আপনার পক্ষে এসব জিনিস আপনার ভেতর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ব্যাপার। হয়তো আপনি মনে মনে এসব মেনে নিয়েই সবকিছু দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু এই ভাবনা ‘হয়তো এসবের পেছনে কিছু আছে’ – এটা যেতে বহুদিন লাগে। আর যখন একবার আপনি হঠাৎ করে এমন একটা অবস্থার সংস্পর্শে এসে যান, যাকে বলে ‘সাহস’, তখন আপনি আপনার সমস্ত অতীতকে আপনার ভেতর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবেন। আমার পক্ষে বলা মুশকিল কি করে এটা সম্ভবপর হল। কিন্তু যা ঘটেছে তাকে সাহস ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে। কারণ, সমস্ত কিছু, যা শুধু আপনি এই শিক্ষক বা অন্য কোনও শিক্ষকের কাছ থেকে শিখবেন তাই নয়, সমস্ত মানুষ যা ভেবেছে, অনুভব করেছে এবং উপলব্ধি করেছে তা পুরোপুরি আমার ভেতর থেকে নির্গত হয়ে গেছে। যেটুকু নিয়ে পড়ে আছি, তা হল অত্যন্ত সাধারণ

জিনিস – এই শরীরটা তার অসাধারণ নিজস্ব বুদ্ধির উপযোগে বেঁচে আছে।

আমি যখন স্কুল–কলেজে পড়তাম, তখন আমাকে সবকিছু পড়তে হয়েছে, এমনকী অদ্বৈত বেদান্তও। যখন দর্শনে এম এ করছিলাম, আমার স্পেশাল সাবজেক্ট ছিল বেদান্ত। পড়াশুনার প্রায় শুরুতেই আমি মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, মন বলতে কোনও জিনিস নেই।

তখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ববিদ্যার একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক ছিলেন ডঃ বোস। ফাইনাল পরীক্ষার প্রায় একমাস আগে আমি তাঁর কাছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, ‘‘আমরা ছয়টি বিভিন্ন স্কুল অফ সাইকোলজি পড়েছি এবং যথাসম্ভব গভীরভাবে আলোচনা করেছি, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ‘মন’–এর কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাচ্ছি না।’’ (আমার মনে আছে আমি তখন ব্যঙ্গ করে বলতাম, ‘ফ্রয়েড ইজ দ্যা স্টুপেন্ডাস ফ্রড অফ দ্য টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি’ – ফ্রয়েড হলেন বিংশ শতাব্দীর এক বিশাল ধোঁকাবাজ, যেহেতু তাঁর মনস্তত্ত্ব একশো বছর টিকে আছে, তার মানে এই নয় যে, সেই তত্ত্বের মধ্যে কোনও সার পদার্থ আছে)। আর আমার সমস্যা ছিল এটাই যে, মন বলে আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি অধ্যাপককে তখন জিজ্ঞাসা করলাম, ‘মন বলে কি কিছু আছে?’ আশ্চর্যের কথা হল, আজ পর্যন্ত যত লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের মধ্যে শুধু একজন সৎ লোক খুঁজে পেয়েছিলাম এবং কোনও সাধু সন্ন্যাসী বা তথাকথিত গুরু নন, তিনি হলেন সেই অধ্যাপক। তিনি উত্তরে বলেন, যদি আমি এম এ ডিগ্রি চাই তাহলে এই ধরনের অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা চলবে না। তিনি আরও বলেন, ‘‘আপনি নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হবেন। আপনার স্নাতকোত্তর ডিগ্রির যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে যা যা মুখস্থ করেছেন তা পরীক্ষার খাতায় হুবহু লিখতে হবে। আর যদি ডিগ্রির প্রয়োজন না থাকে, তাহলে অবশ্য নিজে এই বিষয়ের উপর চিন্তাভাবনা করতে পারেন।’’ তখন আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলাম। ফাইনাল পরীক্ষাও দিইনি। আমি অবশ্য খুবই ভাগ্যবান লোক। সেই সময়ে আমার প্রচুর টাকাপয়সা ছিল। আমি অধ্যাপককে বলেছিলাম, আপনি সাইকোলজির অধ্যাপনা করে যা রোজগার করেন, তার চারগুণ আমার আয়, অতএব আমার পক্ষে জীবিকার কোনও সমস্যা নেই। পড়াশুনার সব পাট সেদিন চিরকালের জন্য শেষ হয়ে গেল।

মন সম্পর্কে আমার সন্দেহ অবশ্য তার পরেও বহুদিন টিকে ছিল। সত্যি বলতে

কি, এই সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কখনও কখনও আপনার মনে হবে, 'হয়তো তিনি সত্যিই জানেন, (যিনি আপনার সঙ্গে মন সম্পর্কে আলোচনা করছেন) যা তিনি বলছেন হয়তো তার মধ্যে বিশেষ কিছু আছে।' যখন অতীতের দিকে তাকাই, তখন বুঝি যে, সেসব ছিল অসাধারণ ধোঁকাবাজি। আমি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তিকে বলেছিলাম, ফ্রয়েডের মতন আপনিও বিংশ শতাব্দীর এক অসাধারণ ধোঁকাবাজ। আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'আপনি আপনাকে মানবজাতির ত্রাণকর্তার ও মহান শিক্ষকের ধারণা থেকে মুক্ত করতে পারেননি। এমন কি থিওসফিক্যাল চিন্তাধারা থেকেও আপনি মুক্ত নন।' তিনি এই সমস্ত জঞ্জাল থেকে নিজেকে কখনওই মুক্ত করে আনতে পারেননি।

আপনি যদি মনে করেন যে, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তাঁকে অনুসরণ করতে পারেন। কিন্তু যে মূলগত বা মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবছেন তা কখনই আপনার মধ্যে ঘটবে না। তার কারণ এই নয় যে আমি আপনার ভবিষ্যৎ জানি, কিন্তু পরিবর্তিত হওয়ার আসলে কিছুই নেই, একদম কিছুই নেই। আর আপনি যদি এখনও ভাবেন যে, তেমন কিছু ঘটবে, আর আপনার বাড়ানো হাতে গাছ থেকে ফল এসে পড়বে, তাহলে আমি শুধু এটুকুই বলব, আপনার একান্ত সৌভাগ্য কামনা করি। আপনাকে এই সমস্ত কথা বলে অবশ্য কোনও লাভ নেই। জ্ঞানালোক বা নির্বাণ বলে কোনও কিছু নেই। তাই আচার্য রজনীশের বোধিসত্ত্ব লাভ হয়েছে বা অন্য কারোর জ্ঞানালোক প্রাপ্তি ঘটেছে এসব আমার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন। আসলে আপনি ধরে নেন যে কেউ না কেউ মোক্ষ লাভ করেছে। কোনও কোনও লোক আমাকে এসেও বলে যে, আমার নাকি 'নির্বাণ' লাভ হয়েছে। এসবকে আমি ঠাট্টাতামাশা ছাড়া আর কিছুই ভাবি না। আজকাল এও শুনছি যে মার্কিন মুলুকে এক ধরনের কোর্স চালু হয়েছে; আপনি যদি চব্বিশ ঘণ্টায় নির্বাণ লাভ করতে চান, তাহলে এক হাজার ডলার দিতে হবে, আর এক সপ্তাহে নির্বাণ লাভ করতে পাঁচশো ডলার ফি লাগবে।

- *সুতরাং আপনি বলছেন যে মনের কোনও অস্তিত্ব নেই। তাহলে কীসের অস্তিত্ব আছে?*

(ইউ জী নিজেকে দেখিয়ে বললেন) এটা শুধু একটা কম্প্যুটার।

- *আপনি একে মন বলুন আর কম্প্যুটার বলুন, এতে কি কিছু আসে যায়?*

আপনি যে নামে ইচ্ছা একে অভিহিত করুন, আমি তাতেই খুশি। মন হল (আমি অবশ্য কোনও নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছি না) মানুষের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও অনুভূতির একত্রীকরণ। আমার মন, আপনার মন বলে কিছু নেই। আপনি মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সামগ্রিক সমন্বয়কে অবশ্য 'মন' বলে অভিহিত করলে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এসব কীভাবে বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে চলে আসছে সেটাই হল প্রশ্ন। এই জিনিস কি শুধু জ্ঞানের মাধ্যমেই প্রেরিত হয়, না অন্য কোনও পথ আছে। যেমন ধরুন, মানুষের জীনের মাধ্যমে? আমাদের কাছে এর সঠিক উত্তর এখনও আসেনি। তারপর যেটা দরকারি প্রশ্ন তা হল, মানুষের 'স্মৃতি'। মানুষ কি? মানুষ হল স্মৃতিসম্ভার। কিন্তু 'স্মৃতি' জিনিসটা কি? এটা কি শুধু কোনও বিশেষ বিষয়কে কোনও বিশেষ সময়ে স্মরণ করা, না অতিরিক্ত আরও কিছু আছে? এসব কিছু জানবার জন্য আমাদের আরও কিছু উত্তরের প্রয়োজন। আমাদের মস্তিষ্কে 'নিউরন' কীভাবে কাজ করে? এসব কি মস্তিষ্কের এক জায়গায় অবস্থিত না বিভিন্ন জায়গায়?

আর একদিন আমি একজন নিউরো-সার্জেনের সঙ্গে কথা বলছিলাম, কম বয়সি কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি বললেন, 'স্মৃতি' বা নিউরন যা স্মৃতির আধার, কোনও এক বিশেষ জায়গায় অবস্থিত নয়। চোখ, কান, নাক এবং শরীরের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন রকমের স্মৃতিসম্ভার এবং এদের অবস্থানও বিভিন্ন জায়গায়। অবশ্য এটা পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমাদের আরও কিছু উত্তরের প্রয়োজন। আমার মনে হয়, সমস্ত কিছু জেনেটিক্যালি নিয়ন্ত্রিত এবং তার অর্থ হল, আপনার কোনওরকমের স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আমরা ভারতের যে সামাজিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি, সেখানে এই ধরনের কিছু শেখায় না, তাঁদের দর্শন হল অদৃষ্টবাদ। আপনি যখন বলেন যে কোনও কিছু করার স্বাধীনতা আপনার নেই, তখন তাঁরা এটাই বোঝাতে চান যে আপনার জ্ঞান যা আপনাকে শেখানো হয়েছে তার উপযোগ ছাড়া আপনার পক্ষে কোনও কিছু করা সম্ভবপর নয়। সেই দৃষ্টিতে আমি বলি যে চিন্তা ছাড়া কোনওরকম কাজ করা সম্ভব নয়। চিন্তার মধ্য দিয়ে যে প্রক্রিয়া নির্গত হয়, যা মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে, তা হল রক্ষণমূলক কার্যসাধনের বন্দোবস্ত। এ হল চিন্তার নিজেকে রক্ষা করার বন্দোবস্ত। আত্ম-স্থায়ীকরণের বন্দোবস্ত। আর আপনি একে নিরন্তর ব্যবহার করে চলেছেন।

যে কোনও সময়ে আপনার জ্ঞানের উপযোগে আপনি যখন কোনও অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তখন সেই জ্ঞান আরও সুদৃঢ় হয় এবং স্থায়িত্ব লাভ করে। সুতরাং যখনই আপনি লোভকে অনুভব করেন আর বলেন যে লোভ খারাপ, তখন লোভ আপনার মধ্যে আরও জোর করে বসে যায়। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি সরাসরি লোভ, রাগ বা বাসনার সঙ্গে কখনই বোঝাপড়া করেননি। আপনি শুধু এদের ব্যবহার করতে চান। যেমন ধরুন কামনাহীন অবস্থা। আপনি কামনার হাত থেকে মুক্তি পেতে চান। কিন্তু আপনি কামনার সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতে পারছেন না, যা করছেন তা হল এই ধারণা যে, 'কেমন করে কামনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।' যার অস্তিত্ব আছে আপনি তা নিয়ে কিছু করছেন না। যা আপনার মধ্যে কাজ করছে, তা কখনও মিথ্যা হতে পারে না। আপনার হয়তো এটা ভালো লাগে না, কারণ আপনি যে সামাজিক রীতিনীতির মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন, সেখানে একে খারাপ জিনিস বলে অভিহিত করা হয়। কামনা-বাসনার বশীভূত হয়ে বিশেষ ধরনের কার্যকলাপ হয়তো আপনার সমাজে স্বীকৃত নয়, আবার কোনও অন্য ধরনের কার্যকলাপ স্বীকৃত। আর আপনার উদ্বেগ হল, সেই কার্যকলাপের মূল্যায়ন করার মধ্যে। যে কার্যকলাপ আপনার সমাজে বর্জিত তাকে দমন করার জন্য আপনার যত মাথাব্যথা। এই সমস্ত উদ্বেগের জন্ম হয় সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। যে বিধান আপনাকে দেওয়া হয়েছে তা মিথ্যা, আর এই প্রক্রিয়া আপনাকে মিথ্যাবাদী হতে বাধ্য করে ...।

- *ধরুন দু'টো শহরের মধ্য দিয়ে একটা নদী চলে গেছে। আর এই দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য একটা সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।*

আপনার কাছে সেতু নির্মাণের যান্ত্রিক জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।

- *না, আমাদের কাছে ধরুন তা নেই।*

হয়ত অন্য কেউ আপনাকে সেই জ্ঞান সরবরাহ করবে।

- *ধরুন কেউ সে জ্ঞান সরবরাহ করছে না?*

তাহলে আর আপনার এই ব্যাপারে কোনও উদ্বেগ থাকবে না। আমি কোনও রকম অনুমানভিত্তিক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করতে চাই না, কে ছিল প্রথম মানুষ, কেন প্রথম এই ধরনের চিন্তা পেল – এই সমস্ত প্রয়াস পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক শিক্ষার

ফল কিনা, আমরা এসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাই না। আমাদের মধ্যে যে প্রবণতা আছে তা হল, নদীর ওপারে যাওয়া, কারণ নদীর ওপারের জমি উর্বর, তা হল আমাদের মধ্যেকার উদ্বর্তনের (টিকে থাকার প্রবল প্রয়াস) ফল। সেই প্রবণতা বেঁচে থাকার তাগিদের যে প্রবণতা, তারই অংশ মাত্র, এটা প্রকৃতিতে বর্তমান। কুকুর, বেড়াল, শূকর বা জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারকে আপনার শেখাবার কোনও দরকার নেই যে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয়। আমাদের সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা আমাদের বুদ্ধি ক্রমশ ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। এই শস্ত্রের প্রয়োগে আমরা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছি – আমাদের প্রগতির সমস্ত সামগ্রীর জন্য আমরা এত গর্বিত। আপনি হয়তো পুরোপুরি এই টেপরেকর্ডারটা খুলে ফেলে আবার জুড়ে ফেলতে পারবেন। এই ধরনের জ্ঞান হয়তো একজনের থেকে অন্যজনের কাছে যেতে পারে। কিন্তু যে সমস্যা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি – রোজকার সমস্যা, অন্য একজনের সঙ্গে থাকার সমস্যা, এ জগতের বেঁচে থাকার সমস্যা – এইসব হল জীবন্ত সমস্যা। এই সমস্যা প্রতি পদক্ষেপে ভিন্ন ধরনের। কিন্তু আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে চাই সেই একই জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে যা আমরা প্রয়োগ করি যান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে, কিন্তু সেই জ্ঞান এ ধরনের সমসা সমাধান করতে অক্ষম। আপনি ধরুন নিজেকে বলেন, 'এই ধরনের অভিজ্ঞতা যদি দশ বছর আগে হত, তাহলে আমার জীবন হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করত।' কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, দশ বছর পর আপনি ঠিক একই কথা বলবেন। 'যদি দশ বছর আগে আমার এই অভিজ্ঞতা হত ...।' সত্যি কথা বলতে কি অতীতের কোনও অভিজ্ঞতা বর্তমান সমস্যার সমাধান করতে পারে না। যান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জ্ঞান শুধু সেই যন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যার কাজে লাগতে পারে, এর বেশি আর কিছুই না। কিন্তু জীবন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা কিছুই শিখি না। আমরা আমাদের যান্ত্রিক জ্ঞান আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের উপর জোর করে চাপিয়ে দিয়ে তাঁদের জীবনের সমস্যা তাঁদের নিজেদের সমাধান করার সমস্ত রকমের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিই।

কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হয়, সম্ভবত কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা। সোজাসুজি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখানে এসেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের যুব সমাজ এবং আসন্ন প্রজন্মকে সাহায্য করা দরকার। কারণ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাঁদের উপর।' আমি তখন তাঁকে বলি, ''আপনি কি বকবক

করছেন? আপনি যুবসমাজের ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান করার জন্য তাদের কেন প্রস্তুত করতে চান? আমরা পৃথিবীকে এক জঞ্জালে রূপান্তরিত করেছি, আবার কেন সেই জঞ্জাল হস্তান্তরিত করতে চাই পরবর্তী প্রজন্মকে? তাদের নিজেদের মতন থাকতে দিন। তারা যদি তালগোল পাকায় তাহলে তাদেরই মূল্য দিতে হবে। এই নিয়ে বর্তমানে আপনার এত মাথাব্যথা কেন? তারা আমাদের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।'' এ কথা আমরা মেনে নিতে রাজি নই। তাই আমরা আমাদের জগতকে জোর করে তাদের উপর চাপিয়ে দিতে চাই। কিন্তু এতে তাদের কোনও উপকার হয় না। জীবন্ত প্রাণী ও চিন্তা দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। চিন্তা সময়ের গণ্ডীর বাইরে কোনও কিছুর অস্তিত্বকে ধারণা করতে পারে না। আমি অবশ্য সময়কে অধিবিদ্যার বিচারে আলোচনা করতে চাই না। সময় বলতে আমি শুধু বোঝাই গতকাল, আগামীকাল, পরশু ইত্যাদি ধারণাগুলো। যে যন্ত্র এই ক্ষেত্রে অসাধারণ ফলপ্রসূতা দেখিয়েছে, সেই যন্ত্র জীবনের সমস্যা সমাধানে অক্ষম রয়ে গেছে। আমরা এই ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করি বস্তুগত ফল পাওয়ার জন্য। আবার একই যন্ত্রের উপযোগ করি তথাকথিত আধ্যাত্মিক ফল পাবার জন্য। বস্তুজগতে যে যন্ত্র কাজ করে সেই জিনিস অন্য জগতে কাজ করে না। তা সে বস্তুগত লক্ষ্যই হোক আর আধ্যাত্মিক লক্ষ্যই হোক, যে যন্ত্র আমরা ব্যবহার করি তা পুরোপুরি বস্তুগত। সেই কারণে, তথাকথিত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য পুরোপুরি বস্তুতান্ত্রিক ফল। আমি এই দু'য়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পাই না। আমি কোনওরকম আত্মার সন্ধান পাইনি। তাই সেই তথাকথিত 'আত্মা' ও 'আধ্যাত্মিকতা'-কে ভিত্তি করে যে কাঠামো গড়ে উঠেছে, তা আমার ক্ষেত্রে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।

মন কি? আপনি হয়তো এর একশো বিভিন্ন সংজ্ঞা দিতে পারেন, কিন্তু এ এক সাধারণ যন্ত্রের মতো কাজ করে। শরীরের বাইরের উদ্দীপনাতে প্রতিক্রিয়া দেখায়। পুরো শরীরটা এই উদ্দীপনা প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটা যন্ত্র। এছাড়া এই শরীর আর কিছুই জানে না। কিন্তু উদ্দীপনাকে আমাদের মানবিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অনুবাদ করতে করতে আমরা এই জীবন্ত সত্তার সংবেদনশীলতা ধ্বংস করে ফেলছি। আপনি হয়তো মনের সংবেদনশীলতার কথা বলবেন, আপনার অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতির সংবেদনশীলতার কথা বলবেন – কিন্তু এসবের কোনও অর্থ নেই।

- *উদ্দীপনা ছাড়াও নিশ্চয়ই কোনও অনুভূতি আছে।*

আমি যা বলতে চাইছি তা হল, আমাদের স্নায়বিক অনুভূতির সংবেদনশীলতা। কিন্তু আপনি যা নিয়ে চিন্তিত তা হল কামনা। এ দু'টো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। জীবন্ত প্রাণীর স্নায়বিক প্রক্রিয়ার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। আমাদের সংস্কৃতি এর উপর অন্য কিছু জোর করে চাপিয়ে দিয়ে এক নতুন জিনিস তৈরি করেছে, যার নাম কামনা। যে কোনও ধরনের অনুভূতির অভিজ্ঞতা হোক না কেন, তা সে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হোক বা অন্য কোনও অভিজ্ঞতা হোক, এর ক্ষেত্র হল সুখভোগ। এবং সত্যিকারের সমস্যা হল, আমাদের চিরস্থায়িত্বের দাবিদাওয়ার মধ্যে। যখনই কোনও অনুভূতিকে সুখানুভূতি বলে অনুবাদ করা হয়, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোনও অনুভূতিকে সুখানুভূতি বলে অনুবাদ করা সম্ভব শুধুমাত্র জ্ঞানের উপযোগ করে। শরীর কিন্তু কষ্টকর অনুভূতি এবং সুখকর অনুভূতি উভয়কেই পরিত্যাগ করতে চায়, তার কারণ হল, যে কোনও অনুভূতিকে তার স্বাভাবিক সময়কালের থেকে বেশিক্ষণ টিকিয়ে রাখা শরীরের স্নায়বিক প্রণালীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু স্নায়বিক প্রক্রিয়ার শুধুমাত্র কামনার বিষয় নিয়েই আমরা চিন্তিত।

- *কিন্তু আমাদের তো এসব কিছু বোঝা দরকার, তাই না?*

বোঝার মতো কি–ই বা আছে? কোনও জিনিস বুঝতে হলে আমাদের যে যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় তা সেই একই যন্ত্র যা ওই যান্ত্রিক কম্প্যুটারকে বুঝতে হলে ব্যবহার করতে হবে। এই কম্প্যুটারের কার্যপ্রণালী বোঝা যায় বারবার শেখার ও ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে। আপনি অনেকবার চেষ্টা করার পর শিখে যাবেন। আর আপনার যন্ত্র যদি কাজ না করে, তাহলে আপনি কোনও একজন পারদর্শী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি শিখিয়ে দেবেন কীভাবে যন্ত্রের উপযোগ করতে হয়, কীভাবে সব খুলে আবার জোড়া লাগাতে হয়। বারবার ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে আপনি নিজেই শিখে যাবেন এবং উৎকর্ষতা লাভ করতে পারবেন। বোঝার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করি, অর্থাৎ চিন্তা, তা আমাদের জীবনের কোনও কিছুকে সাহায্য করে না। যখনই আমরা চিন্তার উপযোগ করি, তখন যা হয়, তা হল, চিন্তা আরও ক্ষুরধার হয়। কোনও একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ''দর্শন কি? আমাদের প্রত্যেক দিনের অস্তিত্বকে বোঝার ক্ষেত্রে, কি করে এই জিনিস আমাকে সাহায্য করতে পারে?'' আমি বলেছিলাম, বুদ্ধিকে ক্ষুরধার করা ছাড়া আর এর কোনও

উপযোগ নেই। জীবনকে বোঝার জন্য ও জিনিস আপনাকে কখনও সাহায্য করতে পারবে না। আর চিন্তা যদি সেই যন্ত্র না হয় এবং অন্য কোনও যন্ত্র যদি না থাকে জীবনকে বোঝার জন্য, তাহলে বোঝার কি কিছু থাকে? 'স্বজ্ঞাত অনুভূতি' বা 'স্বজ্ঞাত উপলব্ধি' সেই চিন্তা নামক যন্ত্রটির সৃষ্ট বস্তু। বোঝার মতো কিছুই নেই বা পাওয়ার মতন কিছুই নেই, এটুকুই আমি বুঝেছিলাম। আমি সত্যি সত্যি বুঝতে চেয়েছিলাম, তা না হলে জীবনের ঊনপঞ্চাশটি বছর আমি নষ্ট করতাম না। আর যেই মুহূর্তে আমার মধ্যে এই জ্ঞানের বোধোদয় হল যে, বোঝার মতন কিছুই নেই, তখন বোঝার যে আগ্রহ আমাকে সারাজীবন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, সেই আগ্রহ আমার ভেতর থেকে চিরতরে উবে গেল, এমনকী শারীরিক চাহিদাও। কিন্তু কীভাবে এটা আমার মধ্যে ঘটল, তা আমি নিজেই জানি না। অতএব এই জিনিস আমি আপনাদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করতে পারব না, কারণ এই জিনিস অভিজ্ঞতা-কাঠামোর বহির্ভূত।

- *আপনি সেই সমস্ত লোককে কোন পর্যায়ে ফেলবেন, যাদের জীবনকে বুঝতে চাওয়ার আগ্রহের কোনও বোঝা বহন করতে হয় না –যারা শুধুই তাদের অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে?*

আপনি হয়তো মোক্ষ, নির্বাণ, মৌলিক পরিবর্তনের ব্যাপারে ভীষণ আগ্রহী; অথবা আপনি চান সবসময়ের জন্য সুখী হতে, যাতে কখনও দুঃখ আপনাকে ছুঁতে না পারে বা চান সবসময় আনন্দিত থাকতে, যাতে বেদনা বলে কোনও কিছু না থাকে, কিন্তু এসব কিছুই আসলে একই জিনিস। আপনি ভারতের কোনও লোকের কথাই বলুন, বা রাশিয়ার কোনও লোক বা মার্কিন মুলুকের কোনও লোকের কথাই ধরুন। আসলে লোকে যা চায়, তা হল সেই সুখ, এক মুহূর্তের দুঃখ ছাড়া একটানা সুখ। কিন্তু দুঃখ ছাড়া সুখ লাভ অসম্ভব। এই যে সব সময়ে সুখের পেছনে ছুটে বেড়ানোর চাহিদা, এটা জীবন্ত প্রাণীর বিবর্তনের এবং টিকে থাকার ক্ষেত্রে কোনও কাজে লাগে না। এই প্রাণী অসাধারণভাবে সজাগ ও সতর্ক। এই শরীর সমস্ত রকমের অনুভূতিকে সবসময় বাতিল করার চেষ্টা করে চলেছে। যে কোনও অনুভূতির একটা ক্ষুদ্র সময়কাল আছে, তার বেশিক্ষণ শরীর সেই অনুভূতিকে সহ্য করতে পারে না। শরীর সবসময় তার অনুভূতিগুলোকে হয় বাতিল করে দেয়, অথবা নিজের মধ্যে শোষণ করে নেয়। তা না হলে এ জিনিস শরীরকে ধ্বংস করে ফেলবে। চোখ দু'টো

শুধু বিভিন্ন জিনিস দেখার আগ্রহী, সুন্দর বলে নয়। কান শুধু সমানে শুনে যায়, সংগীত বলে নয়। শরীর কোনও গোলমালের শব্দকে বাতিল করে তার কারণ এই নয় যে সেটা কুকুরের ডাক বা গাধার ডাক। এ শুধু শব্দতে সাড়া দেয়। আপনি যদি বলেন যে, শব্দের গুণের উপর নির্ভর করে এই সাড়া, তাহলে আমরা মুশকিলে পড়ে যাব। আপনি সত্যিই জানেন যে এটা কোন শব্দ। যদি কোনও শব্দ সত্যিই অসহ্য হয়ে পড়ে, যদি সেই শব্দ স্নায়বিক প্রণালীর সুবেদীতাকে নষ্ট করতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকে, তাহলে শ্রবণ তা আপনা-আপনি বাতিল করে দেয়; ঠিক থার্মোস্ট্যাটের মতো। শরীরের একটা নিজস্ব ক্ষমতা আছে ঠান্ডা ও গরম থেকে নিজেকে রক্ষা করার, বা যে কোনও জিনিস থেকে যা শরীরের শত্রু। শরীর নিজেই নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য সংরক্ষণ করে রাখে। তারপর চিন্তা, যা পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে শরীরকে ঢেকে দেবে, নয়তো বিপজ্জনক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সাহায্য করবে। যেখানে সিমেন্ট মেশানোর বিশাল যন্ত্রটা ভয়ানক শব্দ করছে, আপনি স্বাভাবিকভাবে সেখান থেকে দূরে চলে যাবেন, কারণ সেই শব্দ আপনার শ্রবণশক্তির সংবেদনশীলতাকে পঙ্গু করে দিতে সক্ষম। এই ভয়ে যে সেই শব্দ আপনাকে ধ্বংস করতে সক্ষম বা আপনি বধির হয়ে যাবেন, এটাই প্যারানয়া (Paranoia) ভীতি।

- *যেহেতু কোনও প্রশ্ন নেই, সেহেতু উত্তরের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে এতো প্রশ্ন আসে কোথা থেকে?*

সমস্ত প্রশ্নের উৎসের কারণ হল, তার উত্তর আছে বলে। কিন্তু সত্যি কথা কি, কেউ উত্তর চায় না। কারণ প্রশ্ন শেষ হয়ে গেলে প্রশ্নকর্তাও শেষ হয়ে যাবে। তাই আমরা সবসময় উত্তর নিয়ে মেতে আছি – প্রশ্নের উপর কোনও খেয়াল নেই।

প্রকৃতপক্ষে কোনওরকম সমস্যাই আমাদের নেই, যা আছে তা হল একগাদা সমাধান। কিন্তু আমাদের একথা বলার মতো সাহস বা হিম্মত নেই যে সেসব সমাধান কোনও কাজে লাগে না। যদিও আপনি আবিষ্কার করেছেন যে এসব জিনিস কাজ করে না, কিন্তু আপনার আবেগ আপনাকে সেকথা বলতে দেয় না। এই ভাবনা, 'যার উপর আমার এত বিশ্বাস, এত আস্থা, সেই লোকটা কিছুতেই নিজেকে এবং আমাদের সবাইকে ঠকাতে পারে না।' আমাদের সামনে এসে পড়ে অভিমান এবং আমাদেরকে সবকিছু ছুঁড়ে ফেলতে দেয় না। সমাধানই হল আমাদের

সমস্যা। সত্যিকারের সমস্যা বলতে তো কিছুই নেই। যে সমস্যা আমাদের সামনে আছে, তা হল আমাদের শুধু আবিষ্কার করা দরকার – যে সমস্ত সমাধান আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা ভুল। তা ভুল এই কারণে যে, সেইসব সমাধান কোনও কাজে লাগেনি। আপনি যে সমস্ত প্রশ্ন করছেন তার উৎস হল কিছু কিছু জিনিসকে আপনি সত্যি বলে ধারণা করেছেন এবং মেনে নিয়েছেন তা সত্যি বলে। আর আপনি প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রশ্নের কোনও উত্তর চান না, কারণ সত্যিকারের উত্তর আপনার অন্য সমস্ত উত্তরকে শেষ করে ফেলবে। আর, এর উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব উত্তরও চলে যাবে। আপনাকে আর অন্য দশ রকমের উত্তর নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কোনও একটা প্রশ্ন নিয়ে যখন আপনি কাজ করবেন, তখন সেটা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শেষ করে দেবে। তার মানে এই নয় যে আপনি দারুণ একটা উত্তর খুঁজে পাবেন। আপনার আর কোনও উত্তরের প্রয়োজন থাকবে না। তথাপি আপনাকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য একজন সাধারণ মানুষের মতো আচার ব্যবহার করে কাজ চালাতে হবে।

- *আমি এক বিশেষ জায়গায় গিয়েছিলাম, যেখানে মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকদের রাখা হয় ...*

মানসিক রোগগ্রস্ত লোক না ভিন্ন মানসিক অবস্থার লোক ...

- *আমি তাদের ভিন্ন মানসিক অবস্থার লোক বলেই অভিহিত করতে চাই, কারণ তাদের হয়তো মনে হয় যে আমরা ভিন্ন মানসিক অবস্থার লোক ...*

তা অবশ্য ঠিক।

- *এই দুই ভিন্ন মানসিক অবস্থার মধ্যেকার পার্থক্যরেখা অত্যন্ত ক্ষীণ। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা জানি না কার অবস্থা ভিন্ন। দুই ভিন্ন প্রকৃতির লোকের শরীর কিন্তু জীববিদ্যার নিয়মানুযায়ীই চলছে ...*

ঠিক একভাবে এক নিয়মানুসারে চলছে।

- *তাহলে তাদের মানসিক বিকারগ্রস্ত বলার কারণ কী?*

কারণ আমরা সুস্থ অবস্থা বলে একটা সংজ্ঞা তৈরি করেছি, তাই।

- *আমারও তাই মনে হয়।*

বাঙ্গালোরের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ থেকে কিছু লোক একবার এখানে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন

বিখ্যাত নিউরো সার্জেন। আমি তাঁকে এই একই প্রশ্ন করেছিলাম, 'কে স্বাভাবিক, কে পাগল, আর কে সুস্থ?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'স্ট্যাটিস্টিক্যালি বললে, আমরা সুস্থ।' তাঁর উত্তর আমার কাছে আশ্বাসজনক মনে হয়েছিল। এরপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনারা ওই সমস্ত লোকদের কেন সেখানে রেখেছেন এবং চিকিৎসা করছেন? কতটুকু সাহায্য তারা সত্যি সত্যি পায়?' তিনি তখন বলেন, 'শতকরা দু'জন লোকও সাহায্য পায় না। আমরা নিয়মিত তাদের যার যার বাড়িতে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তারা বারবার ফিরে আসে।' 'তাহলে আপনারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠান চালান কিসের জন্য?' আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি তখন কি বললেন জানেন, 'সরকার এইসব পয়সা খরচ করেন, আর সংসারের লোক এই ধরনের লোককে ঘরে রাখতে চায় না, তাই প্রতিষ্ঠান চালাতে হয়।'

সুতরাং তখন আবার মূল প্রশ্নে ফিরে গেলাম, 'কে সুস্থ, আর কে পাগল?' কখনও কখনও এইসব লোকও আমায় দেখতে আসে। এমনকী পুরোপুরি বদ্ধ পাগলও আমায় দেখতে আসে। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার যে পার্থক্য তা অত্যন্ত সামান্য। তাদের সঙ্গে আমার যে পার্থক্য তা হল, তারা পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিয়েছে, আর আমার সঙ্গে সমাজের কোনও দ্বন্দ্ব নেই। আমি সবকিছু গ্রহণ করি। এইটুকুই শুধু পার্থক্য। এমন কোনও জিনিস নেই যা আমাকে সমাজের এই কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সমাজের সঙ্গে, সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে আমার কোনও রকম সংঘাত নেই। একবার যখন আপনি এই ভাল-মন্দের, সঠিক-বেঠিকের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত, আমার অবশ্য এই 'মুক্ত' বা 'ফাঁদে না পড়ে' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা পছন্দ হয় না, তখন আপনি কোনও খারাপ কাজ করতে পারবেন না। যতদিন পর্যন্ত আপনি ভালো কাজ করার স্পৃহাতে আটকে আছেন, ততদিন শুধু খারাপ কাজই করে যাবেন। কারণ আপনি সবসময় ভবিষ্যতে 'ভালো' হওয়ার চিন্তায় ব্যস্ত। ভবিষ্যতে আপনি একজন ভালো মানুষ হবেন, আর ততদিন পর্যন্ত খারাপ মানুষ হয়ে থাকবেন। সুতরাং, এই তথাকথিত পাগল লোক, যাঁরা পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমরা তাঁদের উপর অত্যন্ত অবিচার করছি এবং তাঁদের ক্ষতিসাধন করছি। আমাদের এই সামাজিক কাঠামো এক পচাগলা সমাজ ব্যবস্থা। আমি শুধু কথার কথাই বলছি না। প্রকৃতপক্ষেই এ এক পচাগলা সমাজ ব্যবস্থা।

সমাজের সঙ্গে আমার কোনও রকম সংঘাত নেই। এর কোনওরকম পরিবর্তন সাধন করার কোনও ইচ্ছাই আমার নেই। এই সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন করার চাহিদা আমার মধ্যে নেই। তার অর্থ এই নয় যে, নিপীড়িত জনসাধারণের দুঃখকষ্টে আমার কিছু যায় আসে না। কষ্টে জর্জরিত মানুষের সঙ্গে আমি যন্ত্রণা ভোগ করি আর সুখী লোকের সঙ্গে আমি আনন্দ লাভ করি। অন্য লোকের দুঃখে–কষ্টে মানুষ আনন্দ উপভোগ করে, অথচ যখন কোনও ধনী লোক তার পয়সার জোর জাহির করে বেড়ায়, তখন লোক খুশি হয় না। কিন্তু এ দু'টো একই জিনিস, একটাকে আপনি সুখভোগ, আর অন্যটাকে হিংসা বলেন। আমি এই দু'য়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখি না। আমি শুধু দেখি কষ্ট ভোগ। ব্যক্তিগতভাবে, আমার পক্ষে করার মতো কিছুই নেই। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এদের এই দুঃখ–কষ্টকে আমার আত্ম–সন্তুষ্টির এবং আত্ম–প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে চাই না। সমস্যা তো নিশ্চয় আছে এবং আমরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য দায়ী, অথচ আমরা কেউ স্বীকার করতে চাই না যে, আমরা নিজেরা এই সমস্যা তৈরি করেছি। এই সমস্যা প্রকৃতি সৃষ্টি করেনি, এই সমস্যা আমরা নিজেরা সৃষ্টি করেছি। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার রসদ প্রচুর পরিমাণে আছে, অসাধারণ খাদ্য সম্ভার; কিন্তু আমরা জোর করে সব নিয়ে নিই যা সত্যি সত্যি সবার জন্য আছে; তারপর বলি আমাদের সবার দান করা উচিত। এটাই হল অবাস্তব ব্যাপার।

ধার্মিক লোকেরা এই যে দানের ব্যাপারটা শুরু করেছিল তার জন্যই হয়তো সত্যিকারের সমস্যার মোকাবিলা কোনওদিন করা হয়নি। আমি হয়তো কোনও গরীব লোক কষ্ট পাচ্ছে বলে তাকে কিছু দান করতে পারি। কিন্তু যদি আমার কাছে সেই গরীব লোকের থেকে বেশি কিছু না থাকে তাহলে আমি কীভাবে তাকে সাহায্য করতে পারি? যদি আমার পক্ষে তাঁকে সাহায্য করার মতো সামর্থ্য না থাকে, তাহলে কি করব? যেখানে আমি পুরোপুরি অসহায় সেখানে আমার কি করণীয়? সেই অসহায়তা আমায় গরীব লোকের সঙ্গে বসে কাঁদতে বাধ্য করে।

- *ইউ জী আপনি সব সময় বলেন যে, প্রকৃতির নিখুঁত ব্যক্তিত্ব বানানোর কোনও তাগিদ নেই, যেটা প্রকৃতি করে তা হল, নিখুঁত জীব তৈরি করার প্রয়াস। এটা বলতে আপনি কি বোঝান?*

শত শত বছর ধরে আমাদের বোঝান হচ্ছে যে, মানুষের বিবর্তনের অন্তিম অবস্থা

হল, যদি সত্যি সেরকম কিছু থেকে থাকে, মহান আধ্যাত্মিক শিক্ষকদের মতো নিখুঁত ব্যক্তিত্বের অবস্থা এবং তাঁদের মতো আচার ব্যবহার।

- *মহান আধ্যাত্মিক শিক্ষক বলতে আপনি বুদ্ধ বা যিশুর মতন ব্যক্তিত্বকে বোঝাচ্ছেন কি?*

হ্যাঁ, সমস্ত শিক্ষককে। সমস্ত শিক্ষক, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের। এটাই হল মূল সমস্যা, আজ আমরা যার মুখোমুখি হয়েছি। প্রকৃতির নিয়মের উপর আমার নিজের কোনও বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু সত্যিই যদি মানুষের বিবর্তনের অন্তিম অবস্থা বলে কিছু থেকে থাকে (আমি অবশ্য একথাও জানি না যে বিবর্তন বলে সত্যি কিছু আছে কিনা) তাহলে এটুকু বলতে পারি যে, প্রকৃতি কোনও নিখুঁত ব্যক্তিত্ব তৈরি করার চেষ্টা করে না।

- *কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিবর্তন ব্যাপারটা সত্যি।*

এমনকী আজও এরকম কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে ডারউইনের 'ওরিজিন অফ স্পিসিজ' পড়া ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ডারউইনের কিছু কিছু মন্তব্য প্রায় ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে, যেমন স্ব-লব্ধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয় না। কিন্তু যখনই বৈজ্ঞানিকরা নতুন কিছু আবিষ্কার করেন তখন তাঁরা তাঁদের তত্ত্ব পালটে দেন।

প্রকৃতি কখনও কোনও কিছুকে মডেল হিসাবে ব্যবহার করে না। তাঁর একটাই উদ্দেশ্য, আর তা হল প্রত্যেকটি প্রজাতিকে নিখুঁত করে গড়ে তোলা। প্রকৃতি শুধু প্রজাতিকে নিখুঁত করতে ব্যস্ত, এর মানুষের সত্তাকে নিখুঁত করার কোনও তাগিদ নেই। আমরা এই সত্যকে মানতে রাজি নই। প্রকৃতি মানুষের এই প্রজাতির মাধ্যমে এক অসাধারণ জিনিসের সৃষ্টি করেছে। এ এক অতুলনীয় সৃষ্টি। কিন্তু সংস্কৃতি মানুষের ব্যবহার ও কার্যাবলীকে এক সীমিত এবং প্রথাগত কার্যাবলীতে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য করে, কারণ সংস্কৃতি নিজের মূল্যবোধকে সবসময় বজায় রাখতে চায়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বমূলক অবস্থা। এই মানুষ (নিজেকে উল্লেখ করে) এমন এক জিনিস, যাকে কোনওরকম সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে মানানো সম্ভবপর নয়।

- *আমি প্রকৃতির সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করেছিলাম এই কারণে যে,*

আপনার বিবৃতির মধ্যে আমি প্রকৃতির উপর এক প্রগাঢ় অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাই। এক প্রগাঢ় অনুভূতি যা জীবনের নিজস্ব একক বা পরম সত্তার অনুভূতি, যা আমার মনে হয় এক অসাধারণ সৃজনশীল প্রকাশ, যে শক্তি শুধু জীবের মঙ্গলের জন্য।

যে মৌলিক ভুল মানবজাতি করেছে বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা হল, এই জীব সমগ্রের মধ্য থেকে এক পৃথক সত্তা হিসাবে অনুভূতি লাভ করা। সেই সময় মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় আত্ম–সচেতনতা, যা সমগ্র জীবজগৎ থেকে মানুষকে পৃথক করে দেয়। এই একাকীত্বের মধ্যে জন্ম নেয় গভীর ভীতি – সঙ্গে সঙ্গে এক নিদারুণ চাহিদা সৃষ্টি হয়, অস্তিত্বের সঙ্গে একক হওয়ার চাহিদা, পরম সত্তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চাহিদা। এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মানুষ আবিষ্কার করে আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বর ও পরম সত্যের এবং মানুষ ভাবতে থাকে যে এর মাধ্যমে হয়তো একদিন একাত্মকরণ সম্ভবপর হবে। কিন্তু এই প্রচেষ্টা – এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে অখণ্ডভাবে বিরাজমান হবার প্রচেষ্টা মানুষকে বিভক্ত রাখতে বাধ্য করে। বিভক্ত হয়ে বেঁচে থাকা প্রকৃতির কাজ নয়। এই বিচ্ছিন্নতা আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তা খোঁজার আগ্রহের সৃষ্টি করেছে যাতে আমরা আবার প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে থাকতে পারি। কিন্তু চিন্তার প্রকৃতি হল সমস্যার সৃষ্টি করা এবং এ কোনওদিন আমাদের সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে না।

আমরা এই ব্যাপারটা কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারি না যে, চিন্তাই আশপাশের সমস্ত কিছু থেকে আমাদের পৃথক করে রেখেছে। চিন্তা হয়তো একদিন আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে এক সুরে অবস্থান করতে সাহায্য করবে, এই বিশ্বাস কোনওদিন কাজ করে না। যেহেতু চিন্তা স্বাভাবিকভাবে সাহায্য করে না, সেহেতু অত্যন্ত জটিল ও চাতুর্যে ভরা তথ্য নিয়ে আমাদের কাছে আসে, যার নামকরণ করা হয় অন্তর্দৃষ্টি, পরাজ্ঞান এবং এই জাতীয় আরও নানা শব্দ।

- *এই অবস্থা থেকে আমরা কোথায় তাহলে যাই? আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই না যে জীবনের তাৎপর্য কি, কারণ আপনি এতক্ষণ ধরে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, এটা কোনও কার্যকরী প্রশ্ন নয়।*

না, এটা ঠিক। এই প্রশ্নের কিন্তু জন্ম হয়েছে এই ধারণার মধ্য দিয়ে যে, আমরা জানি জীবন কি। পৃথিবীর কেউ কিছুই জানে না যে জীবন কি। আমাদের কাছে যা

আছে তা হল, বিভিন্ন তত্ত্ব, ধারণা ও জীবন সংক্রান্ত সূত্রাবলি। এমনকী বৈজ্ঞানিকরাও চেষ্টা করছেন নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে জীবনকে বুঝতে এবং জীবনের উৎস কি তা জানতে। শেষ পর্যন্ত তাঁরা যা পাচ্ছেন তা হল নতুন নতুন তথ্য ও জীবনের নানারকম সংজ্ঞা। আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু সব চিন্তা মৃত। মৃত ধারণার মধ্য দিয়ে চিন্তার আবির্ভাব, তাই সব চিন্তা মৃত। এই চিন্তার প্রক্রিয়া চেষ্টা করছে জীবনকে ছোঁয়ার, উপলব্ধি করার, কিন্তু এই কাজ অসম্ভব। আমরা যেটা নিয়ে ব্যস্ত তা হল, বেঁচে থাকার প্রশ্ন। বেঁচে থাকার অর্থ হল, আমাদের সঙ্গে আশপাশের সমস্ত মানুষের কি সম্পর্ক, আমাদের সঙ্গে অন্যান্য জীব সমগ্রের কি সম্পর্ক তার মধ্যে। যুক্তিসম্মতভাবে আমরা যা চাইতে পারি আমাদের কাছে যখন সে সব থাকে, সবরকম বস্তুগত সুখ ও বিলাসিতা যা পাশ্চাত্যের বহু পরিবারে আছে, তখন আমাদের সামনে এই প্রশ্ন জেগে ওঠেঃ ‘এই কি সব?’ আর সেই মুহূর্তে আমরা আমাদের এই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাই, আমরা নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি করি। এই যদি সব কিছু হয়, তাহলে আমাদের পরবর্তী কি করণীয় আছে? আমরা নিজেরা যখন জীবনের অর্থ কি এর কোনও সদুত্তর খুঁজে পাই না, তখন সেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই অন্য কোনও একজনের দিকে, যাঁদের উপর আমাদের ভরসা আছে এবং আমরা মনে করি যাঁদের কাছে এর উত্তর আছে।

জীবনের অর্থ কি? জীবনের উদ্দেশ্য কি? এর হয়তো নিজস্ব কোনও অর্থ আছে। নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্য আছে। এই অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে কোনওভাবে পরিবর্তিত করতে পারব না বা আমাদের ব্যবহার কোনওভাবে বদলাবে না। কিন্তু আমাদের মধে এই আশা কখনও যায় না, যে হয়তো জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝার মধ্য দিয়্যে জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাবে। হয়তো জীবনের কোনও অর্থ নেই। যদি এর কোনও অর্থ থাকে, তাহলে সে জিনিস সমানে কাজ করে চলেছে। একে বোঝার চেষ্টা আমার মনে হয় এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। হয়তো সে জন্যই আমরা ক্রমাগত এই প্রশ্ন করে চলেছি।

একবার পঁচানব্বই বছর বয়সের এক বৃদ্ধ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তিনি আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসাবে স্বনামধন্য। বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ ও আধ্যাত্মিক সূত্রাবলি তিনি ছাত্রদের পড়াতেন। তিনি আমাকে দু’টো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ‘‘জীবনের অর্থ কি? আমি বহু বই লিখেছি, লোককে কত বক্তৃতা দিয়েছি জীবনের অর্থ ও

উদ্দেশ্য বুঝিয়ে, কত শত বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ থেকে বারবার উপমা দিয়েছি, কত সূত্রের ব্যাখ্যা করেছি, কিন্তু আমি নিজেই জীবনের অর্থ বুঝতে পারিনি! আপনি হয়তো এমন একজন লোক যিনি এর উত্তর দিতে সক্ষম।'' আমি তখন তাঁকে বলি, ''দেখুন, আপনি জীবনের পঁচানব্বই বছর অতিক্রম করে এসেছেন, অথচ জীবনের অর্থ কি বুঝে উঠতে পারেননি। আর কবে বুঝবেন? হয়তো জীবনের কোনও অর্থ নেই।'' পরবর্তী যে প্রশ্নটা তিনি আমায় করেন, তা ছিল এইরকম, ''আমি পঁচানব্বই বছর পার করে এসেছি। আর হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। আমি জানতে চাই মৃত্যুর পর কি হয়।'' আমি বললাম, ''আপনি হয়তো মৃত্যুকে জানার দিন পর্যন্ত বেঁচে নাও থাকতে পারেন। আপনাকে এখনই মরতে হবে। আপনি কি মৃত্যুর জন্য তৈরি? যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার মধ্যে এই প্রশ্ন আছে, 'মৃত্যু কি?' 'মরে যাওয়ার পরে আমার কি হবে?' ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মৃত। এই সমস্ত মৃত প্রশ্ন। একজন সত্যিকারের জীবিত মানুষ কোনওদিন এইসব প্রশ্ন করবে না।''

- *আমি আর একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই, যা কোনও জ্ঞানদীপ্ত নয়। আমাদের কি করণীয় আছে ?*

(হাসি) শত শত বছর ধরে আমাদের বলা হচ্ছে কি করা উচিত। অথচ আমরা আবার সেই প্রশ্ন করছি, ''আমাদের কি করা উচিত?'' কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন যে কি করা দরকার? আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, তা হল এই যে, আমাদের মধ্যে নিজেদের পরিবর্তন করার দাবি–দাওয়া ও চাহিদাই হল আমাদের দুঃখকষ্টের প্রধান হেতু। আমি নিজে হয়তো একথা বলতে পারি যে পরিবর্তিত হওয়ার মতো আমাদের কিছুই নেই। কিন্তু বৈপ্লবিক কোনও মহান শিক্ষক এসে আমাদের বলেন যে, আমাদের ভেতরে এক মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। আমরা তখন ধারণা করতে শুরু করি যে, আত্মা, অন্তরাত্মা, অহম জাতীয় জিনিস আমাদের মধ্যে আছে। আমি যা বলছি তা হল এই যে, আমি 'অন্তরাত্মা' বা 'আত্মা' বলে কিছুই খুঁজে পাইনি।

এই প্রশ্ন আমাকে সারা জীবন প্রেতাত্মার মতো তাড়িয়ে বেড়িয়েছে, কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা উত্তর আমাকে সজোরে আঘাত করল, '''আত্মা' বলে উপলব্ধি করার মতো কিছুই নেই। সারা জীবন ধরে এ আমি কি করছিলাম?'' আর এই আঘাত বজ্রাঘাতের মতো। একবার যেই আঘাত লাগল, শরীরের সমস্ত প্রক্রিয়া যা

এতদিন চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হত, প্রবলভাবে ভেঙে পড়তে শুরু করল। এরপর যা পড়ে রইল তা হল জীবনের সত্তা, নিজের অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার সত্তা। যা নিয়ে এখন পড়ে আছি তা হল জীবনের স্পন্দন, ছন্দ ও শক্তি।

''হয়তো আরও কিছু আছে, আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে আরও কিছু করা দরকার।'' এই সমস্ত চাহিদা আমাদের মধ্যে সবসময় জেগে ওঠার কারণ হল, আমরা এটা ধারণা করে নিয়েছি যে, অন্য সমস্ত প্রাণীর তুলনায় আমাদের সৃষ্টি হয়েছে কোনও এক মহান উদ্দেশ্য সফল করার জন্য। এটাই হল আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল। আমাদের সংস্কৃতি এই ধারণার জন্য দায়ী। এ থেকে আমাদের এই বিশ্বাস জাগে যে, প্রকৃতির সব কিছু মানবজাতির লাভের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। শুধুই আমাদের জন্য। প্রকৃতির সবকিছু ব্যবহার করার চাহিদা আজ বিশ্বে এক বিশাল পরিবেশগত ভারসাম্যের ক্ষেত্রে (ইকোলজিক্যাল) সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই সমস্যার সঙ্গে বোঝাপড়া করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এজন্যই আপনারা হয়তো আমাকে বলবেন আমি একজন নৈরাশ্যবাদী ব্যক্তি।

আসলে ব্যাপারটা হল আমরা এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি, সেখান থেকে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তাহলে মানুষের ভাগ্যে কি আছে, আর এই রকম অবস্থায় করার মতনই বা কি আছে? চিন্তালব্ধ সমস্ত কিছুর জন্ম হয় ধ্বংস করার তাগাদায়। এই কারণে আমার সঙ্গে যখন কোনও আনুষ্ঠানিক কথোপকথন হয়, তখন আমি বলি যে চিন্তা জন্ম সূত্রে, প্রকৃতিগত ভাবে, সমস্ত রূপায়ণ এবং সমস্ত ব্যবহারে ফ্যাসিবাদী। চিন্তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, নিজেকে রক্ষা করা, আর সেই কারণে ক্রমাগত সীমারেখা গড়ে তুলছে যার মধ্যে সে বসবাস করতে পারে। অবিশ্রান্তভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই সীমান্তরেখাকে বাঁচিয়ে রাখতে। এই কারণে আমরা আমাদের চতুর্দিকে সীমানা তৈরি করতে ব্যস্ত; আমাদের পরিবার, আমাদের দেশ এবং অবশেষে আমাদের গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবী জুড়ে।

- *আপনি তাহলে কথা বলেন কেন? আমি আপনাকে এই প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি।*

আমি কেন কথা বলি (উচ্চহাস্য)? আমি কি সত্যি কিছু বলি? আপনার হয়তো শুনতে খুবই আশ্চর্য লাগবে এবং মজার কথা বলে মনে হবে। আমার বলার মতো কিছুই নেই, আর আমি যা বলছি তা আমার চিন্তালব্ধ কথা নয়। আপনি হয়তো

একথা স্বীকার করবেন না। কিন্তু এটা কোনও যুক্তিবাদী মতামত নয়, যা আপনাকে ছুঁড়ে দিচ্ছি। সত্যি বলছি আপনার কাছে এই কথাগুলো বিচিত্র বলে মনে হবে, কারণ আপনি আমাকে এক বিপজ্জনক অবস্থায় এনে দিয়েছেন – বিশেষ করে এই প্রশ্নটার মধ্য দিয়ে যে আমি কেন কথা বলি। আমি কি সত্যিই কথা বলি? প্রকৃতপক্ষে আমি কোনও কথাই বলি না, এখানে কথা বলার মতো কেউ নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি সবসময় পুতুলকে দিয়ে কথা বলায় (ভেন্ট্রিলোকুইস্ট) এমন লোকের উদাহরণ দিই। প্রকৃতপক্ষে একজনই দু'পক্ষের কথোপকথন চালিয়ে যায়। কিন্তু আমরা ভাবি যে তিনি পুতুলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। ঠিক একই ভাবে আপনার সমস্ত প্রশ্নের উৎস হল আমাদের কাছে মজুদ থাকা উত্তরের মধ্যে। যদি সত্যি আপনি কারোও উত্তর গ্রহণ করে থাকতেন, তাহলে আপনার মধ্যে কোনও রকম প্রশ্ন থাকত না। কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি। অথচ একথা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে রাজি হই না যে সমস্ত প্রশ্নের উৎস হল আমাদের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা উত্তরের মধ্যে। যদি কোনওভাবে প্রশ্ন চলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই সুরক্ষিত উত্তরও চলে যাবে। আমরা কিন্তু উত্তরগুলোকে ফেলে দিতে প্রস্তুত নই, কারণ এই ব্যাপারে আমাদের অভিমান সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে হাজির হয়। যে অসাধারণ মানসিক পুঁজি আমরা বিনিয়োগ করেছি, আর যে গভীর বিশ্বাস আমরা ধার্মিক শিক্ষকদের উপর রেখেছি, সেইসব কিছু ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সেই কারণে আমরা আমাদের উত্তরগুলোকে ছুঁড়ে ফেলতে দ্বিধাগ্রস্ত।

প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর চাই না। আমাদের একটা ধারণা আছে যে প্রশ্ন ও প্রশ্নকর্তা দুটো ভিন্ন জিনিস, কিন্তু এটা ভুল। যখন প্রশ্ন ও উত্তর শেষ হয়ে যায়, তখন প্রশ্নকর্তাও শেষ হয়ে যায়। কারণ, প্রশ্নকর্তাই হল উত্তর, এবং সমস্যাটা সেখানেই। আমরা এই সাধারণ উত্তরটা মেনে নিতে রাজি নই, কারণ এর সঙ্গে সঙ্গে যুগ যুগ ধরে যেটা সত্য ও প্রকৃত উত্তর বলে মেনে নিয়েছি, সেটা আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

- *আমরা সব সময় শুনে আসছি যে মানবজাতির সৃষ্টির পশ্চাতে কোনও বিশেষ কারণ আছে। কিন্তু যখন থেকে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে, তখন থেকে আমি ভাবতে শুরু করেছি যে এটা আদৌ সত্যি কিনা?*

এই প্রশ্নের উত্তর শুধু আপনিই দিতে পারবেন। এই ব্যাপারে অন্য সবাই কে কি

বলল, তা আমি একদম পাত্তা দিতে চাই না, যদিও এই অভিব্যক্তি অত্যন্ত রুক্ষ বলে মনে হচ্ছে। অন্যসবাই যা বলেছে তা সত্যি হোক আর মিথ্যা হোক, তাতে আপনার কি আসে যায়? এসব আপনাকে নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে। আমি বলতে পারি যে সৃষ্টির কোনও তাৎপর্য নেই, আর যদিও বা কোনও উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তা জানার কোনও উপায় নেই। আমরা সমানে আমাদের যা শেখানো হয়েছে তা তোতাপাখির মতো আউড়ে যাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে যে, মানবজাতির সৃষ্টির কোনও বিশেষ তাৎপর্য আছে এবং এই বিশ্বাস হল মানবজাতির শোক ও দুঃখের প্রধান কারণ। আমাদের আরও বোঝানো হয়েছে যে, আমাদের সৃষ্টির এক বিশাল ও মহান উদ্দেশ্য আছে। এই গ্রহের অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় আমাদের মহত্তর করে সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমাদের আরও বোঝানো হয়েছে যে, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর অন্য সমস্ত কিছুর সৃষ্টি। এর ফল হল, ইকোলজিক্যাল সমসা, যা আজ সমাধানের অতীত, আর বায়ুদূষণও হল এই ভাবনার ফল। আমরা এখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যেখানে নিজেদের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে। এই গ্রহ কোনওভাবেই বিপদগ্রস্ত নয়। আমরা বিপদগ্রস্ত। আমরা সবাই মিলে এই গ্রহকে দূষণের মারফত বাসের অযোগ্য করে তুলতে পারি – এই গ্রহ সমস্ত কিছু সহ্য করে নেবে। সমস্ত মানুষের দেহ শুষে নিতে পারবে। আমরা যদি অবলুপ্ত হই, প্রকৃতি জানে আমাদের দেহগুলোর কি ব্যবস্থা করতে হবে। নাইট্রোজেন চক্রের মতো সব কিছু কাজে লাগিয়ে দেবে, যাতে করে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি সাম্য অবস্থায় থাকে। শক্তির সমবণ্টন হল গ্রহের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর কোনও উদ্দেশ্য এর নেই। সুতরাং এই গ্রহে মানবজাতির অবস্থান অন্য কোনও প্রাণীর অবস্থানের তুলনায় মহত্তর বা বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং ওই পিঁপড়ে বা মশা-মাছির সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এমনকী এই মশাগুলো যা আমাদের রক্ত শুষে নিচ্ছে, তাদেরও সৃষ্টির মধে একই বৈশিষ্ট্য। আমি এইসব জোর দিয়ে বলতে পারি, কিন্তু আপনার বলার মতন কি আছে? আপনার কিছু বলতে পারার গুরুত্ব, আমি যা বলছি তার থেকে অনেক বেশি। সত্যি সত্যি আমরা কিছুই জানি না। কোনও কিছু জানবার কোনও রাস্তা আমাদের নেই। এমনকী বৈজ্ঞানিকরাও তাঁদের যা ইচ্ছে তাই বলতে পারেন। কিন্তু আমাদের এইসবে কেন

আগ্রহ থাকবে? সত্যি বলতে কি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, তা জেনে আমাদের কি আসে যায়? এই ব্রহ্মাণ্ড ভগবান সৃষ্টি করেছিল, না মহাজাগতিক ধূলা বা হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল – বৈজ্ঞানিকরা ইচ্ছে করলে এইসব নিয়ে সারাদিন আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন, সে তাঁরা চালিয়ে যান, মাঝে মাঝেই তাঁরা নতুন নতুন তথ্য আমাদের সামনে খাড়া করেন। তাঁদের তখন বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়, নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। কিন্তু এইসব তত্ত্ব আমাদের কোনও কিছুকে বুঝতে সাহায্য করে না। অতএব আমি সত্যিই জানি না যে আমাদের সৃষ্টির কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কিনা। আমার মনে হয় না এর পেছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে। জীবনের কোনও অর্থ নেই, উদ্দেশ্যও নেই। এক জীবন্ত প্রাণের এইসব প্রশ্ন করার কোনও আগ্রহ থাকতে পারে না, ''জীবনের তাৎপর্য কি? জীবনের অর্থ কী?''

- *আপনি যদি নিজে নিজের উদ্দেশ্য সৃষ্টি করেন তাহলে কি কিছু আসে যায়?*

আমরা আমাদের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক পরিশ্রমে সন্তুষ্ট নই। রোজ রোজ এক ধরাবাঁধা কাজ। আমাদের এই একঘেয়েমি অসহনীয় বলে মনে হয়। আর এই অসহ্য মানসিক অবস্থা আমাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগায়, ''জীবনের উদ্দেশ্য কি?'' মানুষ ভাবে এই যদি সবকিছু হয়, তাহলে এর বেশি করার কি–ই বা আছে?

- *আপনি বলেন, আমরা যখন একঘেয়ে বোধ করি, তখন নতুন কিছু আবিষ্কার করি।*

আমরা সমস্ত রকমের জিনিস তৈরি করি।

- *মানুষ কেন বিরক্ত বোধ করে?*

মানুষ সবসময় ভাবে তারা যে কাজ করছে তার থেকে আরও বেশি উৎসাহকারী, আরও বেশি অর্থপূর্ণ, আরও মহান উদ্দেশ্য সফল করার মতো নিশ্চয়ই কোনও কাজ আছে। যখন মানুষ তার মৌলিক চাহিদার থেকে বেশি কিছু পেতে চায়, তখনই তার মধ্যে বিরক্তির ভাব জন্মায়। আপনি ভাবতে শুরু করেন, ''এই কি সব?''

জীবের প্রকৃতি শুধু দু'টো জিনিসে আগ্রহী, বেঁচে থাকা, আর প্রজন্মের সৃষ্টি করা। এই দুই কাজের উপর যখনই অন্য কোনও ভাবনা চাপিয়ে দেন, যে কোনও রকমের সংস্কৃতি মেশানোর চেষ্টা করেন তখনই একঘেয়েমি ও বিরক্তিকর ভাবনার জন্ম হয়। যদিও আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের ধার্মিক উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা

আছে, তবুও যখনই আপনার নিজের ধর্মের, শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার উপর একঘেয়েমি বোধ করেন, তখন ভারত থেকে এশিয়া থেকে বা চীন দেশ থেকে নতুন ধার্মিক অভিজ্ঞতার আমদানি করেন। এইসব জিনিস খুবই আকর্ষণীয় বলে মনে হয়, কারণ নতুন অভিজ্ঞতা – তাই। আপনি নতুন ভাষা শেখেন ও সেই ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন এবং মনে মনে নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ লোক ভাবতে শুরু করেন। কিন্তু আসলে এইসব একই জিনিস।

- *খ্রিস্টধর্ম আমাদের নিজেদের প্রতিভাকে বিকশিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু প্রজন্ম রক্ষা করতে কোনওরকম প্রতিভার কোনও প্রয়োজন নেই।*

প্রজন্ম রক্ষা করতে কোনও প্রতিভার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি আমাদের এই অসাধারণ দেহ সৃষ্টি করার মধ্যে দিয়ে এক অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছে। এই দেহ কোনও রকম সংস্কৃতি থেকে কিছুই শিখতে চায় না। আমরা একে সবসময় বলতে চাই এ কীভাবে কাজ করবে। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিক বা অন্য যে কোনও অভিজ্ঞতা হল আমাদের দুঃখকষ্টের প্রধান কারণ। এই শরীরের আপনাদের পরমানন্দ অথবা স্বর্গীয় ভাবাবেশের কোনওরকম আগ্রহ নেই। আপনাদের সুখের উপরও কোনও আগ্রহ নেই। প্রকৃতপক্ষে এই দেহের সে সমস্ত কোনওকিছুতে কোনও আগ্রহ নেই, যাতে আপনারা সবাই এত উৎকণ্ঠিত। আর এই সংগ্রাম সমানে চলছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু এর থেকে মুক্তির কোনও রাস্তা নেই।

- *আমরা আমাদের মূলগত অবস্থার সঙ্গে কীভাবে যেন সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছি ... ।*

সমাজ ও সংস্কৃতি আমাদের সামনে এক আদর্শ সত্তা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে বলে এমন ঘটেছে। প্রকৃতি কোনও কিছুর অনুকরণ করে না। কোনও কিছুকে পরম আদর্শ হিসাবে ব্যবহার করে না।

- *এসব আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে?*

এসব আপনাকে যেখানে আপাতত দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে নিয়ে এসেছে এবং সেই কারণে আপনি সমানে প্রশ্ন করে চলেছেন ... (হাসি)।

- *এই সমস্ত প্রশ্ন করা কি খারাপ?*

দয়া করে এই প্রশ্নটা করবেন না যেন। আপনার আর কোনও প্রশ্ন নেই, আর আমার

মধ্যেও কোনওরকম প্রশ্ন জাগে না। সত্যি বলতে কি সাধারণ কয়েকটা প্রশ্ন ছাড়া আমার কোনও সময় কোনও প্রশ্ন জাগে না। আমি আপাতত এখানে আছি, তাই এই জায়গাটা কেমন তা জানতে চাই, ফলে আপনাদের সঙ্গে একটু ঘুরে বেড়াই। লোককে হয়তো জিজ্ঞাসা করি, 'অমুক স্টেশনটা কোথায়?' বা লন্ডনে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এলে জিজ্ঞাসা করি, 'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কার্যালয়ে কীভাবে যেতে হয়?' এই পৃথিবীতে সুস্থ ও বুদ্ধিমান লোকদের মতন বেঁচে থাকতে হলে এসব প্রশ্ন আপনাকে করতেই হবে। আমাদের এই সত্য মানতেই হবে যা সমাজ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সেটা না করলে আপনাদের পাগল হয়ে যেতে হবে। আপনি যদি কোনও কিছুর মূল প্রকৃতির উপর প্রশ্ন করেন যা আপনার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আপনি গভীর সমস্যার মধ্যে পড়বেন, কারণ সত্য বলতে কিছুই নেই। আর পরম সত্যের তো কোনও কথাই ওঠে না। কোনও জিনিসের সত্যতা উপলব্ধি করার মতো কোনও উপায় আমাদের নেই।

- *আমরা সত্যকে উদ্ভাবন করছি ...*

... আমরা সত্য উদ্ভাবন করছি। তা না হলে আপনার পক্ষে কোনওভাবে কোনও কিছুকে অভিজ্ঞতার আওতায় আনা সম্ভবপর হত না। যেমন ধরুন ওই যে লোকটা বসে আছে এই সত্যটুকুও উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয় – এমনকী আপনার নিজের শরীরকে পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারবেন না। আপনার মধ্যে যে সমস্ত জ্ঞান আছে তার উপযোগ ছাড়া আপনি কোনও কিছুকে আপনার অভিজ্ঞতার কাঠামোয় আনতে পারবেন না। তাই বলছি সত্য বলতে হয়তো কিছুই নেই, আর পরম সত্য তো আরও অলীক ব্যাপার। এটা অবশ্য আমাকে মানতেই হবে যে আপনি একজন পুরুষ এবং তিনি একজন মহিলা, শুধু এটুকুই। এখানেই এর শেষ। কিন্তু আপনি কোন সত্যের কথা বলতে চাইছেন?

- *আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আমার বাবা-মা ও অন্যান্য সবাই আমাকে সংস্কৃতি সম্পর্কে সমস্ত রকম শিক্ষা দিয়েছিল এবং এ শিক্ষাও দিয়েছিল যে, কোন কোন প্রশ্ন আমার করা উচিত নয়।*

তাঁরা চান না যে আপনি প্রশ্ন করুন। তাঁরা যা বিশ্বাস করেন তা সবসময় আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এমনকী যা বিশ্বাস করেননি তাও আমাদের উপর চাপিয়ে দিতেন; যে সত্য তাঁদের নিজেদের জীবনেও কাজ করেনি এমনকী

তাও। এখন তাঁদের দোষারোপ করে কোনও লাভ নেই। আমাদের বয়স হয়েছে, সুতরাং তাঁদের দোষারোপ করা আমাদের আর উচিত নয়। ফ্রয়েডের তত্ত্ব, যা আপনার জীবনে ঘটেছে তার জন্য আপনার মা দায়ী, নয়তো আপনার বাবা দায়ী এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্তিকর। আমাদের মতো বয়স্ক লোকেদের বাবা-মা'র উপর আমাদের কুকীর্তির দোষ চাপিয়ে কি লাভ। এটা কোনও একমুখী রাস্তা নয়। আমাদের বাচ্চারাও চায় যাতে আমরা তাদের মতামত গ্রহণ করি, তাদের অস্তিত্বকে আমরা যেন স্বীকার করে নিই। আমরা জোর করে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধকে তাদের উপর চাপিয়ে দিই, আর তারাও চায় যেন তাদের মেনে নিই। এটা দু-তরফা ব্যাপার।

- *তাহলে আমি যা দেখছি বলে ভাবছি তাকে সত্যিকারের দেখার মতো কোনও রাস্তা নেই ...*

আপনি কখনই কিছু দেখেন না। আমাদের চোখ দু'টো কখনও কিছু বলে না। আপনি কিছুতেই যা দেখছেন তা থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারবেন না। আমাদের যা আছে তা হল শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি। এই অনুভূতি কখনও কিছুর নামকরণ করে না – যেমন ওটা একটা ক্যামেরা। যেই মুহূর্তে আপনি চিনতে পারলেন যে এটা একটা ক্যামেরা, তার উপর আবার সোনি ক্যামেরা, সেই মুহূর্তে এটা আপনার থেকে আলাদা হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে আপনি যা করছেন তা হল আপনার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিকে ক্রমাগত আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে অনুবাদ করে চলেছেন। আমরা কখনও কোনও কিছুর দিকে তাকাতে পারি না। কোনও কিছু সত্যি সত্যি দেখা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ এই 'দেখা' চিন্তার ধারাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

আমরা সবসময় আমাদের জ্ঞানকে আমরা যা দেখি তার উপর প্রক্ষেপ করি। এমনকী যদি আপনি নামকরণ না করে শুধু বলেন যে এটা একটা বস্তু, যেমন ধরুন এই ক্যামেরাটাকে, ততক্ষণে আপনার জ্ঞান এই দেখার প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে ফেলেছে। দর্শনের ছাত্রদের পক্ষে এই ধরনের আলোচনা, শব্দ থেকে বস্তুকে পৃথক করা বা বস্তু থেকে শব্দকে পৃথক করা, দিনরাত চালিয়ে যাওয়া শোভা পায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেই আপনি বলেন এটা একটা বস্তু সেই মুহূর্তে আপনি বস্তু থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। আপনি যদি সেই বস্তুর নামকরণ না করেন, যদি না বলেন যে

এটা একটা ক্যামেরা বা সোনি ক্যামেরা বা ভিডিও ক্যামেরা তথাপি আপনি বস্তু থেকে পৃথক হয়ে গেছেন।

এই সমস্ত তথ্যাদি কম্প্যুটারে জমা আছে। আমাদের এই ব্যাপারটা উপলব্ধি হয় না যে সমস্ত জ্ঞান তথ্যাদি আমাদের মস্তিষ্কে, কম্প্যুটারে জমা হয়ে আছে। হঠাৎ হঠাৎ এসব তথ্য নির্গত হয়। আমরা ভাবি যে এসব মৌলিক তথ্য। আপনি ভাবেন যে জীবনে প্রথমবার আপনি কোনও কিছুকে দেখলেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। যদি আপনাকে কেউ বলে যে এটা একটা নতুন জিনিস তাহলে আপনি যা করেন তা হল আপনার পুরানো জ্ঞানের কাঠামোর সঙ্গে এই নতুনের একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস করেন।

- *সুতরাং কম্প্যুটারে অধিগত জ্ঞান তথ্যাদি ব্যতিরেকে কোনও কিছু দেখা সম্ভব নয়।*

কম্প্যুটারে যদি বিশেষ কোনও তথ্য না থাকে, তাহলে আপনার পক্ষে দেখার কোনও উপায় নেই। কোনও বস্তুর শুধু একটা প্রতিফলন আপনার চোখের রেটিনাতে পড়ে। এমনকী বৈজ্ঞানিকরা যাঁরা এই নিয়ে অনেক গবেষণা করেন, তাঁরাও একথাই বলবেন। আপনার পক্ষে এই সত্যকে উপলব্ধি করার কোনও উপায় নেই, কারণ উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়া হল একক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। যখনই আপনি নিজেকে আলাদা করে ফেলেন, তখনই এক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আপনি হয়তো প্রাণের একক সত্তার কথা বলবেন, সমস্ত কিছুর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা বলবেন, কিন্তু এসব অর্থহীন। কিন্তু এই একক আন্দোলন আপনার নিজের পক্ষে চেষ্টা করে তৈরি করা কোনওভাবে সম্ভবপর নয়। কোনও লোকের পক্ষে, যার এই সমস্ত ব্যাপারে জানার আগ্রহ আছে, তাঁর পক্ষে একে জানার একটাই উপায় আছে এবং তা হল নিরীক্ষণ করা যে কীভাবে পৃথকীকরণ ঘটছে। কীভাবে আপনি আপনাকে আপনার চতুর্দিকে এবং ভেতরে যা ঘটছে তা থেকে সমানে আলাদা করে ফেলছেন। প্রকৃতপক্ষে বাইরের আর ভেতরের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। চিন্তা হল সেই জিনিস যা সবসময় সীমারেখা তৈরি করে চলেছে এবং বলছে এর ওপারে সব কিছু বাইরের এবং এপারে সব কিছু ভেতরের। আপনি যদি নিজেকে বলেন যে, আপনি খুশি বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা বিরক্ত, তাহলে নিজেকে সেই যে বিশেষ অনুভূতি যা আপনার ভেতরে আছে, তা থেকে আলাদা করে ফেলছেন।

- *আমাদের দেহকোষে কি আমাদের চিন্তার কোনও বিক্রিয়া হয়?*

কোষসমূহ প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। সেই কারণে আমি বলি, মানবজাতি যে দুঃখময় অবস্থার মুখোমুখি হতে চলেছে তার কারণ এইডস বা ক্যানসার নয়, তা হল অ্যালজাইমার রোগ (স্মৃতি লোপকারী রোগ)। আমরা নিউরনের ক্রমাগত ব্যবহার করি (অর্থাৎ আমাদের স্মৃতিকোষ সমূহকে) আমাদের 'অহম'কে ধরে রাখার জন্য। আপনি জেগে থাকুন আর ঘুমিয়ে থাকুন বা স্বপ্ন দেখতে থাকুন, এই নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখার প্রক্রিয়া সমানে চলছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া আপনাকে ক্ষয় করে ফেলছে।

আপনি যা জানেন শুধু তারই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। আপনার জ্ঞানের উপযোগ ছাড়া আপনার পক্ষে কোনও কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করা অসম্ভব। নতুন অভিজ্ঞতা বলে কোনও কিছু নেই। আপনি যখন কোনও অভিজ্ঞতাকে নতুন অভিজ্ঞতা বলে অভিহিত করেন তখন আপনার সেই পুরানো কাঠামোর উপযোগেই বলতে পারেন যে এটা নতুন অভিজ্ঞতা। অন্যথায় আপনার পক্ষে কখনও বলা সম্ভব নয় যে কোনও নতুন অভিজ্ঞতা আপনার হয়েছে। পুরানোই আপনাকে বলে যে এটা নতুন। আর এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু পুরানো হয়ে যায়।

চিন্তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার একটা মাত্র উপায় আছে আর তা হল আমাদের মধ্যে জানার চাহিদাকে জীবিত করে রাখা। আপনি যে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছেন তা যদি আপনার কাছে অজানা হয়, তাহলে আপনি যাকে 'আপনি' বলে জানেন মনে করেন, সেই 'আপনি' যার সবসময় অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তার শেষ হয়ে যাবে। সেই ঘটনাকে বলে মৃত্যু, এটাই হল একমাত্র মৃত্যু, এছাড়া আর কোনও মৃত্যু নেই।

- *এ তো ভয়াবহ জিনিস।*

এটা অত্যন্ত ভয়ংকর – আপনি যা জানেন তাকে খুইয়ে ফেলার দারুণ ভয়। সুতরাং, আপনি প্রকৃতপক্ষে ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান না। আপনি চান না যে আপনার ভয় শেষ হয়ে যাক। আপনি সবসময় যা করছেন – এই যে সমস্ত রকমের মানসিক চিকিৎসা ও প্রণালী আপনি ব্যবহার করছেন ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য, সে যে কারণেই আপনি ভয়ের হাত থেকে রেহাই পেতে চান না কেন, সেটাই ভয়কে আপনার মধ্যে জীবিত করে ধারাবাহিকতা দিচ্ছে। সুতরাং আপনি কিছুতেই

চান না যে আপনার ভয় শেষ হয়ে যাক। কারণ তাতে আপনার শারীরিক মৃত্যু ঘটবে। চিকিৎসাশাস্ত্রের সংজ্ঞায় যাকে মৃত্যু বলে অভিহিত করে, সেই মৃত্যু ঘটবে।

- *আপনি বলেন যে আমরা আমাদের সমস্ত রকমের বিশ্বাস পরিত্যাগ করলে মারা যাব।*

আপনি সবসময় একটা বিশ্বাস পালটে সে জায়গায় অন্য একটা বিশ্বাস হাজির করেন। আপনি বিশ্বাস ছাড়া টিকে থাকতে পারবেন না। আপনি যাকে 'আপনি' বলে জানেন, তা হল ওই সমস্ত বিশ্বাসের সমন্বয়। যখন বিশ্বাস চলে যাবে, তার সঙ্গে সঙ্গে আপনিও চলে যাবেন। এই কারণেই যখন আপনি কোনও একটা বিশ্বাস কাঠামোতে সন্তুষ্ট নন, তখন তাকে পরিত্যাগ করে অন্য কাঠামোকে আমদানি করেন।

- *আপনি কি বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীতে কোনও কিছুই বেঠিক নেই?*

আমি এই পৃথিবীতে বেঠিক কিছু দেখি না, কারণ পৃথিবীর অন্য কোনওভাবে অবস্থান সম্ভবপর নয়। আমি লোককে একথা বলে জীবিকা অর্জন করতে আগ্রহী নই যে, পৃথিবীর যত শীঘ্র সম্ভব এক আমূল পরিবর্তন সাধন করা দরকার। আপনি যদি রাজনীতিবিদ হন বা কোনও দেশের প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে অবশ্য আলাদা ঘটনা। তা না হলে বর্তমানে যে অবস্থা এছাড়া আর কিই বা আশা করা যেতে পারে। আমরা সবাই যে যেরকম লোক তাতে পৃথিবীর পক্ষে এর থেকে ভালো হওয়া কি করে সম্ভব। আমি যা বলছি এ কোনও অবাস্তব জিনিস নয়। আমার ও আপনার মতো লোক একসঙ্গে বসবাস করেই তো এই পৃথিবী।

- *আপনি প্রায়শই বলেন, ''আপনি হলেন সেই মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারি।''*

হ্যাঁ। আপনি হলেন মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারি। এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আমার নিজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার কোনওরকম প্রেরণা নেই। আপনি হয়তো তাহলে জিজ্ঞাসা করবেন যে, ''কেন তা হলে আপনি এত কথা বলেন? আপনি কেন লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন?'' কিন্তু আপনিই তো এসব লোকজনকে ডেকে এনেছেন আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য। আপনারাই তো সমানে প্রশ্নবাণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই হল প্রধান কারণ যার জন্য আমি সবসময় লোকপ্রচার এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। আমি নিজেকে অন্যের

কাছে মহান বলে প্রতিপন্ন করতে চাই না বা অন্য লোক আমার কাছে নিজেকে মহান বলে প্রতিপন্ন করুক, তাও আমি চাই না।

- *প্রকৃতি কি?*

আমরা সবাই একরকম। আমি শুধু এটাই বলার চেষ্টা করছি।

- *আমাদের প্রকৃতি এড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে, সেটা কি?*

হ্যাঁ, সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছি। এই সমাজের জটিল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হল সবচেয়ে বড় ভুল। কিন্তু এর বাইরে কিছুই নেই। সমস্ত গুরু, দেবমানব ও চাটুকাররা আমাদের স্বর্গের ও নন্দনকাননের যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন যে এসব অন্যান্য অঙ্গীকারের মতই কুহেলিকা মাত্র। আমরা সব কিছু ছেড়ে দিই সেসব কল্পকথার আশ্বাসবাণীর উপর, যা আমাদের আশ্বস্ত রাখে। কিন্তু ঠিক এখন যে অবস্থায় আপনি আছেন সেটাই হল সত্য, এর কোনও অন্যথা নেই। আমি যা জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করছি তা হল এরকম, আপনি যদি আপনার শক্তিকে সেই সমস্ত কল্পকথার আশ্বাসবাণীর ও অলীক অবস্থার পেছনে ছুটে অপচয় না করেন, তাহলে জীবন অত্যন্ত সরলভাবে চলবে। কিন্তু আমরা সমানে আমাদেরকে অপচয় করে থাকি। ভুলপথে নিজেদের নিয়ে যাই এবং নিজেদের জীবনকে বৃথা হয়ে যেতে বাধ্য করি। যদি আমাদের শক্তির সঠিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তাহলে এই সংস্কৃতিলব্ধ জটিল সমাজে আমাদের টিকে থাকার জন্য এমন কী কাজ আছে যেটা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব? এটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এই জটিলতাকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাই হল সবচেয়ে বড় সমস্যা।

- *আপনি যেটা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করছেন, আমার মনে হচ্ছে সেটা অত্যন্ত বৈপ্লবিক ধারণা। বিশেষ করে যখন আপনি বলেন, ‘‘সমস্ত দেবমানুষও চাটুকার’’, এটা কি প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ নয়?*

তাঁরা আপনাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আর লোকজন সেটাই চায়। এই জনগণের মুখ্যভাগ আমি যা বলতে চাইছি তাতে কোনও আগ্রহ দেখায় না। তারা যেটা শুনতে পছন্দ করে সেটাই শুধু শোনে। আমি যা বলি তাতে লোকের আগ্রহ থাকার কথাও নয়। আপনি যদি বলেন যে, ঈশ্বর অপ্রয়োজনীয়, তার অর্থ এই নয় যে আপনি কোনও কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন। আপনি জানেন যে ধার্মিক

চিন্তাভাবনা সেকেলে হয়ে গেছে, আর চলে না। কিন্তু আমি আর এক ধাপ এগিয়ে বলছি যে, রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শ সেই একই ধার্মিক চিন্তারই আঁচিল জাতীয় বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তারা হয়তো একে বৈপ্লবিক কিছু বলে অভিহিত করবেন। কিন্তু রিভলিউশন অর্থাৎ বিপ্লব হল রিভ্যালুয়েশন অর্থাৎ নতুন করে মূল্যবোধের মূল্যায়ন করা। আপনি নতুন মূল্যবোধ যুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান, যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার থেকে একটু আলাদা, যাকে আপনি ভেঙে চুরমার করে দিতে চাইছেন। কিন্তু মূলগতভাবে এ দু'টো ব্যবস্থার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আর যখনই বিপ্লব শেষ হয়ে যায়, নেতাদের আবার বিপ্লব করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। এমনকী মাও–সে–তুং–এর ক্রমাগত বিপ্লব চালিয়ে যাওয়ার তথ্যও বিফল হয়ে গেছে। বিপ্লবের পর সমস্ত কিছু শান্ত ও স্তিমিত হতে হয়।

- *আপনি এর আগে উল্লেখ করেছিলেন সমস্ত অতীতকে, সমস্ত অভিজ্ঞতাকে, সমস্ত চিন্তাকে বাতিল করে দেওয়ার কথা – আমি সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই ...*

আপনার চেষ্টায়, ইচ্ছায় আপনি এ জিনিস ঘটাতে পারবেন না। এ এক দৈবাৎ ব্যাপার। আমার মধ্যে যা ঘটেছে তা আমি যা কিছু করেছি সবকিছুকে অবজ্ঞা করে ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে আমি যা করেছিলাম তা এ জিনিস ঘটার পথে বিঘ্ন স্বরূপ ছিল। আমার ভেতরে যা ছিল তাকে প্রস্ফুটিত হওয়ার থেকে, নিজেকে অভিব্যক্ত করার থেকে, আমি যা করেছিলাম তা প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছিল। তার অর্থ এই নয় যে, আমার বিশেষ কিছু লাভ হয়েছে, শুধু ভেতরে যা কিছু আছে তা নিজেকে বাধাহীনভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছে, সমাজের সমস্ত ভার মুক্ত হয়ে, সমস্ত রকমের প্রতিবন্ধকতা যা সমাজের ভারসাম্যকে ও ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার জন্য আমাদের উপর চাপিয়ে দেয় তাকে অস্বীকার করে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে।

- *আমাদের কি প্রথমে খোঁজার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই?*

খোঁজ করাটা অমোঘ এবং এ সমস্ত কিছুর অঙ্গ। এই কারণে এ জিনিস আমাদের স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত খেপাটে লোকে পরিণত করেছে। আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আপনি দেখুন, উচ্চাকাঙ্খা হল আমাদের প্রকৃতি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমাদের প্রকৃতি। আপনারা এই প্রকৃতির উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন

এক ধারণাকে, ‘আকাঙ্খাহীনতা।’ এইসব আমাদের মধ্যে পাগলামির জন্ম দিয়েছে। আমরা একই সঙ্গে দু’টো জিনিস চাই। একজন লোক তা তিনি এখানে থাকুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকুন, রাশিয়াতে থাকুন বা অন্য যে কোনও জায়গাতে থাকুন, তিনি কি চান? তিনি চান নিরবিচ্ছিন্ন সুখ, এক মুহূর্তের জন্য দুঃখ ছাড়া সুখ। তিনি চান চিরস্থায়ী খুশি থাকতে, যাতে কোনও বেদনার চিহ্ন না থাকে। মূল চাহিদা হল চিরস্থায়িা। এই সেই চাহিদা যা সৃষ্টি করেছে ধার্মিক চিন্তাধারা – ঈশ্বর, সত্য বা বাস্তবতা। যেহেতু জীবনের কোনও কিছু চিরস্থায়ী নয়, তাই আমাদের চাহিদা আমাদের বোঝায় যে কোনও কিছু একটা চিরস্থায়ী হতেই হবে। এই কারণেই ওই সব ধর্মশিক্ষকরা বাজার খুলে বসেছেন তাঁদের পণ্য বিক্রি করার জন্য। তাঁরা আপনাদের এই অস্বাস্থ্যজনক জিনিস অর্পণ করেন ‘চিরস্থায়ী সুখ’ বা ‘চিরস্থায়ী পরমানন্দের ভাবাবেশ’ প্রভৃতি নামে, তাঁরা কি একথা স্বীকার করবেন যে পরমানন্দ, সৌন্দর্যলহরী, অপরিসীমতা, প্রেম ও দয়া এসব কিছু নিছক ইন্দ্রিয়গত?

- *আপনি কি বলতে চান যে যিশু বা বুদ্ধ যা বলে গেছেন, তার মধ্যে কিছুই নেই?*

তাঁদের ব্যাপারটা না হয় ছেড়েই দিলাম। তা না হলে আমরা সবাই রীতিমতো মুশকিলে পড়ব।

- *আপনি কি বলেন, যে ব্যক্তিগত বলতে কিছুই নেই?*

কোথায় সেই ব্যক্তি?

- *আমার নিজেকে একজন ব্যক্তি বলে অনুভূত হচ্ছে।*

আপনি কোনও একক ব্যক্তি নন। আপনি যা করছেন অন্য সবাই ঠিক সেই একই জিনিস করছে।

- *আমি কি এই ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তির থেকে পৃথক নই?*

না, মোটেই না।

- *কীভাবে আমরা সবাই যুক্ত?*

আপনি যদি আমি যা বলছি তা স্বীকার করে নেন, তাহলে খুবই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবেন, আপনার স্ত্রী চলে যাবে, ভেবে দেখুন ...

- *কোনও সম্পর্ক থাকবে না...?*

দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কোনও সম্পর্কই থাকবে না।

- *তাহলে আমার এসব দরকার নেই।*

আপনি এসব চান না? আপনি কীভাবে এসব চাইবেন? সে কথাই তো আমি বলার চেষ্টা করছি। আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন আমাকে আপনার জ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে উপযুক্ত জায়গায় বসাতে একথা বলে যে আমি একজন জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত লোক। এই ভদ্রলোক (ইউ জী একজন অতিথিকে দেখিয়ে বলেন) সবাইকে বলছেন, 'যিশু এখানেই আছেন, আমার আর চার্চে গিয়ে কাজ কি?' এ বদ্ধ পাগল (সবার হাসি)। আপনি কি এটা দেখতে পাচ্ছেন না যে ধার্মিক লোকেরা আমাদের মধ্যে কি জঞ্জাল সৃষ্টি করে গেছে? তাঁরাই ধ্বংসের সমস্ত ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছেন।

- *আমি যা বুঝলাম তাতে মনে হচ্ছে যে আমাদের কোনও উত্তর খোঁজার প্রয়োজন নেই, কারণ সমস্ত উত্তর যা আমরা পাই তার উৎস আমাদের মধ্যে যে উত্তর আগে থেকেই ছিল তার মধ্যে নিহিত।*

এমন কী কোনও উপায় আছে যা দিয়ে আপনি এই প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি পেতে পারেন?

- *সেই অবস্থার কি এটাই একটা রূপ বা অভিব্যক্তি নয়?*

আমার পক্ষে এ ছাড়া আর কোনওভাবেই আপনাকে বোঝানো সম্ভব নয় যে আপনি যে খোঁজ করছেন আর যার খোঁজ করছেন তার ভয়ংকর পরিণতি কি। এটা হল সেই আনন্দ বা খুশির আন্দোলন যা আপনি দেখছেন। আনন্দ বা খুশি থাকার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিমত নেই। আমি আনন্দবাদের স্বপক্ষেও কিছু বলছি না বা অন্য 'বাদ' প্রচারের চেষ্টাও করছি না। আমি যা বলছি তা আপনাকে সবসময় হুমকি দিচ্ছে আপনার এই অস্তিত্বকে যাকে আপনি জানেন বলে ভাবছেন। আপনি আমাকে আপনার কাঠামোতে মিলিয়ে দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন (যিশু, বুদ্ধ এবং অন্যান্য শিক্ষকদের মত), আর যদি সফলতা লাভ না করতে পারেন, তাহলে বলতে বাধ্য হন, ''কি করে ইনি এসবের বাইরে থাকতে পারেন?'' আপনার পক্ষে এ অবস্থা থেকে ছাড়া পাবার উপায় হল, আমাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়া, বা আমাকে ঠগ বা প্রতারক বলে অভিহিত করা। আপনি কি জানেন যে আপনার এই ভাবনা, ''কি করে আগের সমস্ত লোক ভুল হতে পারে'' আমি যা বলছি তা শুনতে বাধার সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত আপনি একথা বলতে বাধ্য হবেন

যে যা ইউ জী-র জীবনে ঘটেছে তা একই জিনিস, কিন্তু তাঁর অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

- *ব্রহ্মাণ্ডের বিগ ব্যাং তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যাক।*

আমি এই তত্ত্বকে পুরো মানতে পারছি না।

- *আপনি এটা নিশ্চয় জানেন যে আমরা সৃষ্টির আদিতে সবাই পরমাণু ছিলাম।*

আমি মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করি। আমরা কোনওদিন এই মৌলিক কণিকার সন্ধান খুঁজে পাব না।

- *আপনার প্রথম বইতে আপনি চিন্তার আয়নীকরণের কথা ও বিস্ফোরণের কথা বলেছেন।*

তখন থেকে আমার কোনও কিছুকে বোঝার প্রক্রিয়া বুদ্ধিযুক্ত নয়। বছরের পর বছর ধরে আমরা আমাদের বুদ্ধিকে ঊর্ধ্বস্তরে নিয়ে এসেছি এবং একে ক্ষুরধার করে তুলেছি। সুতরাং এ জিনিস (ইউ জী-র বোধশক্তি) নিজে থেকেই এ ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে যে এ বুদ্ধি ঠিক অস্ত্র নয় এবং অন্য কোনও অস্ত্রেরও দরকার নেই এবং বোঝার মতন কিছুই নেই। আমার সমস্যাটা ছিল এরকম যে আমি সবসময় আমার বোধশক্তি ব্যবহার করতাম আমি যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তাকে বোঝার জন্য, কিন্তু এ আমাকে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারেনি। তারপর আমি অন্য শক্তির খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলাম একে বোঝার জন্য। যেমন পরাজ্ঞান জাতীয় জিনিস। কিন্তু আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম যে, এই বুদ্ধি হল আমার একমাত্র অস্ত্র; আর কোনওদিন অন্য কোনও অস্ত্র খুঁজে পাব, যা ভিন্ন স্তরে ভিন্নভাবে কাজ করে, যার সাহায্যে আমি সব কিছু বুঝতে পারব – এই আশা একদিন আমার ভেতর থেকে নিঃশেষ হয়ে গেল। আমার মধ্যে এই জ্ঞানের অরুণোদয় হল, ‘‘বোঝার মতন কিছুই নেই।’’ যেই না এই বোধোদয় হল, সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে বজ্রাঘাত হল; তারপর থেকে বোঝার সমস্ত রকমের আগ্রহ চিরদিনের মতো শেষ হয়ে গেল। আর যা কিছু এ বুঝেছে তাই এখন সমানে ব্যক্ত করে চলেছে। এই অভিব্যক্তি কোনও যন্ত্র হিসাবে আমাকে সাহায্য করার অথবা পরিচালনা করার কোনও কাজে লাগানো যায় না – শুধু তাই নয় আপনাকে বা অন্য কাউকে কোনও রকম সাহায্য করতে পারে না।

- *আপনি কি মৃত্যুকে ভয় পান?*

এখানে মৃত্যু ঘটবার মতো কিছুই নেই (ইউ জী নিজেকে দেখিয়ে)। শরীর মৃত্যুকে

কখনও ভয় পায় না। আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি এ ব্যাপারে যে আন্দোলন সৃষ্টি করে তার কারণ হল এ চায় না কোনও কিছুর অন্ত হোক বা কোনও কিছু চিরতরে শেষ হয়ে যাক। কি করে এ জিনিস আমার মধ্যে শেষ হয়ে গেল আমি সত্যিই জানি না। আপনি যাতে ভয় পান তা মৃত্যু নয়। আপনি ভয় থেকে মুক্ত হতে চান না।

- *কেন?*

কারণ আপনার ভয় চলে গেলে 'আপনি' সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবেন।

- *কেন?*

এটাই হল এর প্রকৃতি। যে ভয় আপনার মধ্যে আছে, তা আপনার মধ্যে এই বিশ্বাস জাগায় যে আপনি বেঁচে আছেন এবং কোনওদিন আপনি মরে যেতে পারেন। আমরা যেটা চাই তা হল সেই ভয় যাতে শেষ হয়ে না যায়। সেই কারণে আমরা বিভিন্ন জিনিসের উদ্ভাবন করেছি, নতুন মন, নতুন বিজ্ঞান, নতুন চিকিৎসা, বিচারের অতীত সচেতনতা এবং আরও কত রকমের কায়দাকানুন। ভয় হল একমাত্র জিনিস যার হাত থেকে আপনি মুক্তি লাভ করতে চান না। আপনি যাকে 'আপনি' বলে ভাবছেন তার নাম হল 'ভয়'। সেই 'আপনি'র জন্ম হয়েছে ভয়ের মধ্য দিয়ে, সে বেঁচে আছে ভয়ের মধ্যে, সে কাজ করছে ভয়ের সাহায্যে আর মারা যাবে ভয়ের মধ্যে।

- *আপনাকে কোনওরকম শ্রেণীভুক্ত করা অত্যন্ত দুষ্কর।*

যাঁরাই আমাকে দেখতে আসেন, তাঁদের সবারই ওই একই সমস্যা, কোথায় আমাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন। তাঁদের পক্ষে আমায় দেবমানব, মুক্তমানব, জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত মানব ইত্যাদি সব বলে একটা ছাপ মেরে দেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। তাঁরা বলেন, ''আমাদের মুশকিল সেখানেই, আমরা সত্যি সত্যি জানি না তাঁকে কোথায় কোন শ্রেণীতে ফেলা যায়। হয়তো এর মধ্য দিয়েই আমাদের বুদ্ধির প্রতিফলন ঘটছে।'' এমনকী দার্শনিকরাও আমাকে তাঁদের সবরকম সংজ্ঞা দিয়েও কোনও শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারছেন না। কিন্তু এসব আমাকে কখনও অন্যের থেকে উচ্চতর মানুষ বলে গর্বিত করতে পারে না।

- *পৃথিবী যদি আপনার জন্য কোনও ছাপ খুঁজে না পায়, তাহলে আপনি পৃথিবীর জন্য কি ছাপ লাগাবেন?*

আমি পৃথিবীর ব্যাপারে খুবই সন্তুষ্ট (হাসি)। পরিতুষ্ট। পৃথিবীর অন্য কোনওভাবে অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। ভ্রমণ আমাদের মধ্য থেকে অনেক রকম মায়াময় ধারণা ধ্বংস করে দেয়, আবার নতুন মায়া সৃষ্টিও করে। আমি আমাকে অত্যন্ত হতাশ করে এটা আবিষ্কার করলাম যে মানুষের প্রকৃতি একই রকম তা সে রাশিয়ার লোক হোক, আমেরিকার লোক হোক বা অন্য কোনও দেশের লোক হোক না কেন! এ যেন সবাই এক ভাষায় কথা বলছে, শুধু ভিন্ন ভিন্ন স্বরভঙ্গি। আমি ইংরেজিতে কথা বলি অন্ধ্রপ্রদেশের বাচনভঙ্গিতে। আপনি হয়তো কর্ণাটকের বাচনভঙ্গিতে, আর একজন হয়তো ফরাসিদেশের বাচনভঙ্গিতে বলেন। কিন্তু মূলগত ভাবে সব মানুষ এক। এদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আমি তো কোনওরকম পার্থক্য দেখতে পাই না। হয়তো বিভিন্ন সংস্কৃতি তাঁদের মধ্যে কিছু ভিন্নতার সৃষ্টি করেছে। আমরা সবাই যে যেরকম লোক এতে পৃথিবীর অন্য কোনও রূপ থাকা কীভাবে সম্ভব। যতদিন পর্যন্ত আপনার মধ্যে নিজেকে পরিবর্তিত করার চাহিদা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আপনিও পৃথিবীর পরিবর্তন সাধনের জন্য উৎসুক হবেন। যেহেতু আপনি এই সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যবোধের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না, তাই আপনি চাইছেন অন্য কোনও সমাজ ব্যবস্থা আনতে যেখানে আপনার স্থান স্বস্তিপূর্ণ হয়।

- *আমি যা বুঝলাম আপনার কথা থেকে তা হল আমরা সবসময় কোনও এক মূল্যবোধ যুক্ত ব্যবস্থার আওতায় থাকব, তা সে ভালো হোক আর মন্দ হোক।*

ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক একে অন্যটার বিপরীত ছাড়া কিছু নয়, একই পয়সার দু'টো দিক। যেমন রামধনুর দু'টো প্রান্ত। এর একটা ছাড়া অন্যটার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নেই। আর আপনি যখন ভালো-মন্দের দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব (আমি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই শব্দটা ব্যবহার করছি। কারণ, এই শব্দ ব্যবহার করতে আমার পছন্দ হয় না) থেকে একবার মুক্তি লাভ করতে পারবেন, যখন এই সঠিক-বেঠিকের দ্বি-বিভাজনের মধ্যে আটকে থাকবেন না, তখন আপনার পক্ষে বেঠিক কোনও কিছু করা আর সম্ভবপর হবে না। যতদিন পর্যন্ত আপনি এর মধ্যে আটকে আছেন, ততদিন পর্যন্ত বিপদের কথা হল এই যে আপনি প্রায়শই ভুল করে বসবেন। আর আপনি যদি কোনও বেঠিক কাজ না করেন তার কারণ হল আপনি এক ভীত সন্ত্রস্ত কুক্কুটের মতো বলে। আর এই সব ভীরুতা আর কাপুরুষতার মধ্য

দিয়ে সব ধার্মিক চিন্তাধারার উৎপত্তি হয়েছে।

- *আপনি এক জায়গায় বলেছেন যে ক্রোধ কোনও খারাপ জিনিস নয় আর এ কখনও কোনও ক্ষতি করতে পারে না।*

ক্রোধ হল আমাদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এ ঠিক সমুদ্রের জোয়ার–ভাটার মতন। এই যে প্রশ্ন, 'রাগ দিয়ে আমি কি করতে পারি?' এটা আমাদের সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে চাপিয়ে দিয়েছে, কারণ এক ক্রোধান্বিত ব্যক্তি সমাজের ধারাবাহিকতাকে হুমকি দেয়, রীতিনীতিকে প্রশ্ন করে বসে।

- *বেশ তাহলে আপনি কোনও হুমকি নন?*

আমি কোনও বিপজ্জনক ব্যক্তি নই, আমি কোনও হুমকি দিতে পারি না। তার কারণ হল, আমি এই অবস্থা ছাড়া আর কোনও অবস্থার কথা ভাবতে পারি না। আমি কোনও কিছুর মধ্যে কোনওরকম পরিবর্তন আনতে চাই না। আপনারা সব সময় চাইছেন এবং আলোচনা করে চলেছেন কীভাবে পরিবর্তন আনা যায়। একই সময়ে আপনার ভেতরে এবং চতুর্দিকে সবকিছু এক অনুপম ধারায় বয়ে চলেছে। আপনার চতুর্দিকে সমস্ত কিছু পরিবর্তনশীল, অথচ আপনি কোনওরকম পরিবর্তন চান না। এবং এটাই হল আপনাদের সমস্যা। আপনার পরিবর্তিত হওয়ার অনীহা যাকে আপনি ট্র্যাডিশন বা পরম্পরা বলে অভিহিত করেন তা হল আপনার সমস্যার কারণ। আপনি ''পরিবর্তনশীল জগতের মাঝে অপরিবর্তনীয়'' থাকতে চাওয়াকে আপনার মহান ট্র্যাডিশন নামে চালাবার চেষ্টা করেন।

- *প্রকৃতি সমস্ত কিছু প্রথমে সৃষ্টি করে আবার কেন ধ্বংস করে দেয়?*

তার কারণ হল, কোনও কিছু জন্মায় না এবং কোনও কিছুর মৃত্যু ঘটে না। সৃষ্টির এবং ধ্বংসের মাঝে যে অন্তরের সৃষ্টি করে তা হল আমাদের চিন্তা। প্রকৃতিতে মৃত্যু বা ধ্বংস বলে কিছু নেই। যা ঘটে তা হল অনু–পরমাণুর নতুন সংগঠন। যদি শক্তির সমতা রক্ষার কোনও প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতিতে দেখা দেয় তাহলে মৃত্যুর প্রয়োজন হয় ও মৃত্যু ঘটে। আপনার হয়তো এটা পছন্দ হবে না। ভূমিকম্পকে আমরা অভিশাপ বলে মনে করি। সে কথা ঠিক, কারণ এ জিনিস হাজার হাজার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস করে দেয়। পৃথিবীর চারদিক থেকে মানবতাবাদী আন্দোলন তখন প্লেনভর্তি করে নানা রকম সাহায্য পাঠায়, এটা অসাধারণ কাজ। যারা অবস্থার বিপাকে পড়ে কষ্ট পাচ্ছে, যারা প্রচুর সম্পত্তি খুইয়েছে, তাদের কাছে এটা বিশাল

উপকার। কিন্তু এই ধরনের কার্যকলাপ একই জিনিস যা লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করতে বাধ্য করে। আমি যেটা বলতে চাইছি তা হল, মানবতাবাদ আন্দোলন এবং যুদ্ধবাদী আন্দোলন – এই দু'য়ের উৎসস্থল এক।

দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হল প্রকৃতির নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া মাত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও এক জায়গায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত যেখানে সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল, সেখানে নতুন ধরনের জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমি কখনই অবশ্য একথা বলব না যে আপনি সেই দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করবেন না।

যে আত্ম–সচেতনতা মানবজাতির মধ্যে ঘটেছে তার হয়তো প্রয়োজন ছিল। আমি জানি না, আমি কখনও দাবি করতে পারি না যে প্রকৃতির কার্যকলাপের ব্যাপারে আমার কোনও বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি আছে। আপনার প্রশ্নের উত্তর হয়তো শুধু এভাবেই দেওয়া সম্ভব। আপনি নিজেই একটু ভালো করে ভেবে দেখুন। এই কারণেই আমি বলি যে মানবজাতির সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হল, 'হয় বধ কর, নয় বধ হও।' এটা যে ঘটনা তা সবাই জানে। যদি কেউ আগাগোড়া মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকাতে আগ্রহী হন, তাহলে দেখতে পাবেন মানবতার সমস্ত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে এই ধারণার উপর যে, যারা আমাদের সঙ্গে একমত নন, তারা আমাদের বিরুদ্ধে। মানুষের চিন্তার মধ্যে এই ধারণা সবসময় কাজ করে চলেছে। সুতরাং ঈশ্বরের নাম করে হয় হত্যা কর, নয় নিজে হত হও, যার প্রতিনিধি হল পশ্চিমের চার্চ এবং এখানে অন্যান্য সমস্ত প্রাচ্যের ধার্মিক চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই কারণে এই দেশে এখনও এত অন্ধ বিশ্বাস। চীন দেশে যে কি নিদারুণ হত্যাকাণ্ড চলছে তা আপনি ধারণা করতে পারবেন না। বহু পণ্ডিত ও ধার্মিক লোকদের হত্যা করা হয়েছে। তারা কনফুসিয়াসের এবং অন্যান্য সমস্ত শিক্ষকদের সব বই পুড়িয়ে ফেলেছে, নয়তো কবর দিয়ে দিয়েছে। আজ যে রাজনৈতিক মতাদর্শের সেই দেশ প্রতিনিধিত্ব করছে, তা বর্তমান সমস্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। তারা অবশ্য এখন দাবি করার চেষ্টা করে যে তারা যা করেছে তা সে একই বিপ্লবের অঙ্গ, যে মহাবিপ্লব প্রথমে শুরু হয়েছিল। আমি আগেই বলেছি, বিপ্লব হল আমাদের মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন করা। এর প্রকৃতপক্ষে কোনও অর্থই হয় না। কিছুদিন পরে সব কিছু স্তিমিত হয়ে আসে এবং যাকে তারা আজ সোভিয়েত

ইউনিয়নে গ্লাসনস্ত বলে অভিহিত করছে, সেখানে এখন এসবের কোনও অর্থ নেই। গর্বাচভ সেই দেশে একশোটা পাঞ্জাবের সৃষ্টি করে ছাড়বে।

- *আমাদের খোঁজ করে কিছু বার করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয়।*

এ দেহ কিছুই শিখতে চায় না এবং কিছুই জানতে চায় না, কারণ এর মধ্যে সেই অন্তর্নিহিত বুদ্ধি আছে যার সাহায্যে এ বেঁচে থাকতে পারে। এ শরীর যদি কোনও জঙ্গলে থাকে, তাহলেও বেঁচে থাকবে। আর যদি না পারে, তাহলে চলে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে। আর ঠিক এভাবেই সমস্ত মানুষের শরীর কাজ করে। যখন কোনওরকম বিপদের মুখোমুখি হয়, তখনই এর মধ্যে যত হাতিয়ার আছে সব ছুঁড়ে দেয়, নিজেকে রক্ষা করার জন্য। যদি রক্ষা করতে না পারে, তাহলে নিজেকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু শরীরের কোনও মৃত্যু নেই। যে সমস্ত অণু–পরমাণু দিয়ে শরীরের সৃষ্টি তা পুনর্বিন্যাসের দ্বারা অন্য রূপ নেয়। সব কিছু অন্যত্র কোনও না কোনও জায়গায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং শরীরের না আছে জন্ম না আছে কোনও মৃত্যু, কারণ এর কোনওভাবে জানার উপায় নেই যে এ বর্তমানে বেঁচে আছে অথবা ভবিষ্যতে একদিন মারা যাবে।

- *আমরা সবসময় ভাবি যে আমাদের নিজেদের মধ্যে উন্নতি ঘটিয়ে আমাদের এই দুর্দশা থেকে মুক্ত করার কোনও রাস্তা পেতে হবে। প্রত্যেকেই ভাবে যে তার কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার বা উচ্চস্তরে পৌঁছনো দরকার। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?*

যে মুহূর্তে আমরা এই প্রশ্ন করি, ‘‘আমরা যা করি এর থেকে অধিক কিছু কি আমাদের জীবনে আছে?’’ সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রশ্নের সমস্ত যান্ত্রিকতাকে জীবিত করে তুলি। দুঃখের বিষয় হল, পাশ্চাত্য দেশে এসব কিছুর উপর আগ্রহের জন্ম হয়েছে হিপি সংস্কৃতির মাধ্যমে। তাঁরা তখন বিভিন্ন নেশা ও মাদক দ্রব্যের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে মনে করতেন ‘উচ্চ পর্যায়ের চেতনা।’ প্রথমবারের মতন তাঁরা অনুভব করেছিলেন এমন কিছু যা তাঁদের সাধারণ অনুভূতি ক্ষেত্রের বাইরে। যখন আমরা অসাধারণ কিছু অনুভব করি, যা সত্যি অসাধারণ কিছু নয়, তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের এই জাতীয় অভিজ্ঞতা পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠি – একই জিনিস বারবার আরও দীর্ঘক্ষণ ধরে উপলব্ধি করার জন্য। এই প্রবল উৎসাহ প্রাচ্যে, বিশেষ করে ভারত, চীন ও জাপানে একটা বড়সড় বাজার তৈরি করেছে।

হিপিরা দলে দলে এসব দেশে এসেছেন, আর সমানে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, যে তাঁরা একদিন তাঁদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন। কিন্তু এই সুযোগে সবাই হাবিজাবি জিনিস বিক্রি করেছে। লোকজন আসলে যাতে আগ্রহী ছিল তা প্রকৃত উত্তর খোঁজার মধ্যে নয়, তা ছিল এক আরামদায়ক কম্বলজাতীয় জিনিস। আমি আগে বলেছি, গুরুরা বিক্রি করত বরফের টুকরো যাতে আপনি আপনার ক্ষতের যন্ত্রণা ভুলে সাময়িক আরাম পান। কেউ মূল প্রশ্ন করতে চাইত না যে সত্যিকারের সমস্যাটা কোথায়? এইসব লোকেরা আসলে কি চায়? এরা কি খুঁজে বেড়াচ্ছে? আর এসব অবস্থার সুযোগ সদ্ব্যবহার করেছে প্রাচ্যের কিছু লোক। এ সমস্ত লোক যা দাবি করে তার সামান্য কিছু যদি সত্যি হয় (অর্থাৎ তাদের কাছে বর্তমান যুগের লোকেরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তার সমাধান আছে) তাহলে কেন তা নিজেদের দেশের লোকদের দিয়ে সাহায্য করতে পারছে না? যে মূল প্রশ্ন পশ্চিমের লোকদের সেসব গুরুর দিকে ছুঁড়ে দেওয়া উচিত, তা হল, আপনাদের উত্তর কি আপনাদের নিজের দেশের লোকেদের কোনও উপকারে লেগেছে? আপনার সমাধান কি আপনার নিজের জীবনে কাজ করে? কেউ এ ধরনের প্রশ্ন তাঁদের করে না। যে শত শত বিভিন্ন কলাকৌশল তাঁরা আপনাদের দেন তা কখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। আপনাদের কাছে কোনও স্ট্যাটিস্টিক্যাল নজির নেই যা দিয়ে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে তাঁরা যা বলেছেন তা সত্যি। লোকজনদের নিজেদের প্রতারিত করার প্রবণতা তাঁরা কাজে লাগান। আপনাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুর যখন জোগান হয়ে যায়, সমস্ত বস্তুমূলক জিনিস যখন পেয়ে যান, তখন চারিদিকে দেখতে থাকেন, আর জিজ্ঞাসা করেন, 'এই কি সব?' আর এই অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে শোষণ করছে সেইসব গুরুরা। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্যা আমাদের সামনে আছে তাঁদের কাছে তার কোনও উত্তর নেই। আজ আমাদের যে দুঃখকষ্টের সামনাসামনি হতে হচ্ছে তার প্রধান কারণ হল, আমরা ক্রমাগত আমাদের ব্যক্তিপরিচয়, যা আমাদের সংস্কৃতি তৈরি করেছে, তাকে বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, যা সংস্কৃতির সৃষ্টি, তার উপর আমাদের অপরিসীম বিশ্বাস। আমরা কখনও সেসবের উপর প্রশ্ন করি না। আমরা শুধু নিজেদেরকে সেই মূল্যবোধের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে চলেছি। আমাদের সমাজ আমাদের কাছে সবসময় দাবি করে চলেছে যেন আমরা সবাই সেই সংস্কৃতিকে মেনে নিই,

আর এই দাবিদাওয়া হল আমাদের দুঃখের কারণ। কোনও এক সময় মানুষের চেতনায় একাকীত্ববোধ এক অসহনীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল (যে একাকীত্ব মানুষকে প্রকৃতির অন্য সমস্ত জীবজগৎ থেকে পৃথক করে রেখেছে), আর সে সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য অধীরভাবে চিরদিন পথ খুঁজে বেড়ায়। আমি জানি না যে বিবর্তন বলে কিছু আছে কিনা। যদি তা থেকে থাকে তাহলে সে বিবর্তনের কোনও এক প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ নিজেকে সমস্ত প্রাণী ও বস্তু জগৎ থেকে বিভক্ত করে ফেলে। সেই নির্জন অবস্থায় তার মধ্যে এক অসহনীয় ভীতির সঞ্চার হয়, তার ভেতরে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নিদারুণ দাবিদাওয়ার জন্ম হয়, নিজেকে আশ্বস্ত করার এই তাগাদা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ধার্মিক চিন্তাধারারও সৃষ্টি হয় ঠিক এরকম অবস্থার মধ্য দিয়ে এবং শত শত বছর ধরে তা চলে আসছে। কিন্তু এই চিন্তাধারা মানবজাতি যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার সমাধান করতে কোনও কাজে লাগেনি। আমাদের মধ্যে এই যে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারা আজ বর্তমান, তাও সেই ধার্মিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাধারারই বিকৃত এক প্রশাখা মাত্র। সব কিছু হতাশাজনকভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান করতে অসফল রয়ে গেছে, আমাদের মাঝে এক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ পুরোপুরি অসফল রয়ে গেছে।

মানবজাতি বর্তমানে এক ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন। রাজনৈতিক মতাদর্শের অসফলতা যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে, সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে বিভিন্ন ধর্মপ্রতিষ্ঠান। তারা আরও জোর গলায় বলবে যে, আমাদের যিশুখ্রিস্টের কাছে ফিরে যেতে হবে, আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের দেশের প্রাচীন ঐশ্বর্যকে, পুরানো সেই মহান সংস্কৃতির দিনগুলোকে। কিন্তু যা প্রাচীনদের নিজেদের জীবনেই কাজ করেনি, তাঁরা অসফল রয়ে গেছেন, তা কোনওদিন আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

যখন কোনও মনস্তত্ত্ববিদ এবং বৈজ্ঞানিক আমাকে দেখতে আসেন, আমি তাঁদের এটা পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করি, ‘‘আপনারা আপনাদের লড়াইয়ের প্রায় শেষ অবস্থায় এসে পড়েছেন। আপনি যদি আপনার সমস্যার উত্তর খুঁজতে চান, আপনাকে আপনার নিজের কাঠামোর মধ্যে তার উত্তর খুঁজে বার করতে হবে, বাইরে কোথাও নয়। বিশেষ করে মরে ভূত হয়ে যাওয়া পুরানো কোনও

সংস্কৃতির মধ্যে একদম নয়, সেই পুরানো কার্যপ্রণালী ও বিভিন্ন কলাকৌশল যা অতীতে কোনও সফলতা আনতে পারেনি, তাতে ফিরে যাওয়া এবং তাকে অনুধাবন করা এক ভয়ানক ভুল পথে যাওয়া মাত্র। নাগরদোলার মতো একই জায়গায় ঘুরতে থাকার মতো।

- *আমরা যদিও সমস্যা তৈরি করে থাকি, আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছি।*

তা ঠিক। কিন্তু আমরা একথা কখনই স্বীকার করতে রাজি নই যে যা সমস্যার সৃষ্টি করে চলে তা কখনই নিজে তার সমাধান করবে না। আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করতে যা ব্যবহার করি তা হল 'চিন্তা।' কিন্তু চিন্তা হল রক্ষামূলক প্রক্রিয়া। এটা সবসময় চেষ্টা করে যাচ্ছে কীভাবে নিজের মর্যাদাকে বজায় রাখবে। আমরা হয়তো সবসময় নিজেকে পরিবর্তিত করার কথা বলি, কিন্তু যখন সময় এসে পড়ে তখন দেখি যে আমরা পরিবর্তনের জন্য তৈরি নই। আমরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করি যে পরিবর্তন শুধু ভালোর জন্যই হওয়া উচিত, খারাপ অবস্থায় যাওয়ার জন্য নয়। আমাদের এই 'চিন্তাশক্তি'র উপর অসম্ভব আস্থা, যদিও আমরা জানি যে চিন্তাই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এর কারণ হল, আমাদের কাছে সেই একটাই অস্ত্র (চিন্তা) আছে। প্রকৃতপক্ষে এ জিনিস কোনওদিন আমাদের সাহায্য করতে পারে না। এ শুধু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে, কোনওদিন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আমরা এই অসাধারণ সত্যটুকু কিছুতেই মেনে নিতে পারি না, কারণ এটা মানার মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির সমস্ত ভিত্তিপ্রস্তরকে আমাদের উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শুধু একটা ব্যবস্থা পালটে অন্য ব্যবস্থা আনতে চাই, এছাড়া আর কিছুই নয়। আজ পর্যন্ত আমরা সযত্নে যে সবকিছু তৈরি করেছি, আমাদের সংস্কৃতির কাঠামোর ধর্মই হল এ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করার মুখে আমাদের ঠেলে দেওয়া।

আমরা ভয় থেকে মুক্তি পেতে চাই না। ভয় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আপনি যা সমস্ত কিছু করেন তা প্রকৃতপক্ষে আপনার মধ্যে ভয়কে চিরস্থায়ী করে রাখে। তাহলে ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কি কিছু করণীয় আছে? ভয় এমন একটা জিনিস যাকে চিন্তা দিয়ে সামলানো যায় না; এটা জীবন্ত জিনিস, আমরা সবসময় দস্তানা পরে একে ছোঁয়ার চেষ্টা করি, এর সঙ্গে খেলা করার চেষ্টা করি।

আমরা যেটা করতে চাই তা হল, ভয়ের সঙ্গে খেলা করার চেষ্টা এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস মাত্র। বিভিন্ন ধরনের ডাক্তার আছে, বিশেষজ্ঞ আছে, তাঁদের সাহায্য নিই, নানারকম প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল প্রয়োগ করি। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসের থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছি তাকেই আমাদের মধ্যে আরও শক্তিশালী করে সুরক্ষিত করে তুলি।

- *আমরা তাহলে এমন এক সমাজে বাস করি যার ভিত্তি হল ভয়। আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠান – পুলিশ, ব্যাংক, ডাক্তার ও বিমা বা ইন্সুরেন্স সমস্ত কিছু যা আমরা নির্মাণ করেছি – তার মূল ভিত্তি হল ভয়?*

হ্যাঁ, ভয়। তাহলে আমাদের সবসময় নিজেদেরকে বলার অর্থ কি যে আমরা ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই? যেই মুহূর্তে আপনার ভেতর থেকে ভয় চলে যাবে, সেই মুহূর্তে আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হবেন, শারীরিক মৃত্যু ঘটবে। চিকিৎসাশাস্ত্রে যাকে মৃত্যু বলে, সেই মৃত্যু ঘটবে। যদিও আপনি ও আপনার ভয় দু'টো আলাদা জিনিস নয়, কিন্তু এটা অত্যন্ত স্বস্তিজনক ভাবনা যে আপনি ও আপনার ভয় দু'টো পৃথক জিনিস। আপনি কোনও বিশেষ ব্যাপারে ভীত এবং আপনি চান না কোনও কোনও বিশেষ ঘটনা আপনার জীবনে ঘটুক। আপনি চান এসব ভয় থেকে মুক্তি পেতে, কিন্তু এরকম কোনও উপায় নেই যা দিয়ে আপনি আপনাকে ভয়ের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবেন। যদি ভয় শেষ হয়ে যায়, তাহলে 'আপনি' যা আপনি নিজেকে জানেন, 'আপনি' যা আপনি নিজেকে অনুভব করেন, সব কিছু শেষ হয়ে যাবে, আর তার জন্য আপনি প্রস্তুত নন।

সাদা কথা কি জানেন, আপনার যদি কোনও সমস্যা না থাকে, তাহলে আপনি নিজেই একটা তৈরি করে নেবেন। আপনার যদি কোনও সমস্যা না থাকে তাহলে আপনি ভাবতে পারেন না যে আপনি বেঁচে আছেন। আসলে যে সমস্ত সমাধান আমরা আমাদের মহান শিক্ষকদের কাছ থেকে পেয়েছি, যাঁদের উপর আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও পরম বিশ্বাস তা প্রকৃতপক্ষে কোনও সমাধানই নয়। যদি সত্যি সত্যি সেসব সমাধান হত, তাহলে কোনও সমস্যাই এতদিনে থাকত না। আমরা চাই কোনও না কোনও একটা সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাকতে, তাই কোনও সমস্যার সমাধান হলে অন্য এক সমস্যার সৃষ্টি করি।

- *ধ্যান করায় কি শরীরের উপর কোনও খারপ ফল হয়?*

ধ্যান করার মধ্য দিয়ে আপনি আপনার দেহকে অপ্রয়োজনীয় অত্যাচারের মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

- *শরীর কি কষ্ট পায়?*

হ্যাঁ, শরীর কষ্ট পায়। এ শরীরের আপনার ধ্যান করার প্রতি কোনওরকম আগ্রহ নেই, প্রকৃতপক্ষে শরীরের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত প্রশান্তি আছে ধ্যান তার ধ্বংস ঘটায়। এই মানুষ এক অসাধারণ শান্তিপূর্ণ জীব। শান্তি পাওয়ার জন্য এর কোনও কিছু করার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। 'মনের শান্তি' বলে এক ভাবনা এই শরীরের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আমরা এক অযথা সংগ্রামের সৃষ্টি করেছি, যে সংগ্রাম কখনও শেষ হয় না। যে অবস্থা ধ্যান করার পর আমরা অনুভব করে থাকি, যাকে আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থা বলে অভিহিত করি, তা আসলে যুদ্ধ ক্লান্ত অবস্থা যা আমাদের 'চিন্তা' সৃষ্টি করেছে। একবার যেই আপনি মনের শান্তিপূর্ণ অবস্থার অনুভূতি উপলব্ধি করলেন, আপনি বারবার এ অবস্থার অনুভূতি পেতে চাইলেন।

- *আমি শুনলাম যে এই সপ্তাহে এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বৈজ্ঞানিকরা আসছেন, নানা বিষয়ের কর্তৃত্ব বলে যাঁদের গণ্য করা হয়, তাঁরা আসছেন – এমনকী আধ্যাত্মিক জগতের লোক, শিল্প-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেরও বিশেষ গুণীজনেরা সম্মিলিত হবে শুনলাম। এই প্রথম বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতরা আসছেন, তাঁদের নিজেদের বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের যে সামঞ্জস্য আছে তা নিয়ে কথাবার্তা বলতে, বিরোধিতা করার পরিবর্তে। সবাই একথা ভাবছে বলে মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকের প্রত্যেককে সাহায্য করা দরকার, এতদিন সবাই তাদের সীমিত ক্ষেত্রে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করত আর মতভেদের উপর জোর দিত।*

প্রথমেই আমি এটা বলতে চাই যে, বৈজ্ঞানিকরা এই সমস্ত ধার্মিক লোকেদের কাছে সাহায্য চাইলে এক গুরুতর ভুল করে বসবেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের ধারণা ও শক্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের কোনও প্রণালীতে যদি সমস্যা থাকে তাহলে তাঁদের নিজেদের সে সমস্যা সমাধান করতে হবে। ধার্মিক লোকেদের কাছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তার কোনও উত্তর থাকা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় না এসব একত্রকরণের চেষ্টার মধ্য দিয়ে পরস্পর

মতামতের বিনিময় করে এবং অন্যদের বক্তৃতা শুনে কিছু ফল হবে। আমার কথা শুনে হয়তো আপনার মনে হবে যে আমি এক বিশ্ব নিন্দুক, বিশেষ করে যখন বলি যে এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কোনও সমাধান আসবে না, তাঁদের শুধু এটা ভেবে খুব আশ্বস্ত বোধ হবে যে তাঁরা পরস্পরের দৃষ্টিকোণ বোঝার চেষ্টা করে খুব বক্তৃতা দিয়েছেন। আপনি যখন কাউকে কিছু বলেন, তখন সে আপনাকে বলবে এটা হল আপনার দৃষ্টিকোণ। কিন্তু তিনি একথা বোঝার চেষ্টা করেন না যে তারও একটা দৃষ্টিকোণ আছে। তাহলে এই দু'টো লোকের মধ্যে কীভাবে কোনওরকম ভাব বিনিময় হবে যাদের দু'টো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ? কথাবার্তা ও আলোচনার আসল উদ্দেশ্য হল আপনার উলটোদিকে যে লোকটা বসে আছে তাকে আপনার মতাদর্শে রূপান্তরিত করে দেওয়া। আপনার যদি নিজস্ব কোনওরকম দৃষ্টিকোণ না থাকে তাহলে কারোর পক্ষে আপনাকে রূপান্তরিত করে ফেলা সম্ভবপর হবে না। এই কথোপকথন হল দু'টো ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণের মধ্যে এবং এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটানোর কোনও উপায় নেই।

এই সম্মেলন খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার হবে (হাসি)। তাঁরা সবাই একত্রিত হোক, সেসব নিয়ে কথাবার্তা বলুক (তাঁদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেটা সাধারণ বিষয়), তাঁদের মতামত বিনিময় করুক, আর এতেই সব শেষ হয়ে যাবে। এ ঠিক সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের মতন (রাষ্ট্রপুঞ্জ হল এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় তামাশা। প্রত্যেকে যদি তাঁদের অধিকার চাপানোর চেষ্টা করেন, তাহলে কীভাবে একে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ বলা যাবে?)। আসলে প্রধান সমস্যা হল 'চিন্তা', এ জিনিস সবসময় সবজায়গায় সীমারেখা তৈরি করে যাচ্ছে। এছাড়া এর পক্ষে আর কিছু করা সম্ভবপর নয়।

- *আপনি কি মনে করেন যে প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে, যার জন্য আজ কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে, মানবজাতির কিছু সাহায্য (কল্যাণকর) হতে পারে?*

আমরা যদি প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করতে পারি তা সে যে কারণেই আমরা করতে চাই, শেষ পর্যন্ত এর ব্যবহার হবে প্রকৃতি যা সৃষ্টি করেছে তা ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে। আমাদের পৃথিবী বিপদগ্রস্ত, এই ধরনের প্রচার সংবাদ মাধ্যমের বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু না। প্রকৃতপক্ষে সবাই এসব ভুলে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীর কোনও বিপদ নেই। আমরা বিপদগ্রস্ত। আমরা এটা সরাসরি

দেখতে রাজি নই। আমাদের এই সমস্যার সমাধান অতীতের মধ্যে খোঁজা উচিত নয়, এ দেশের বা অন্য দেশের মহান ঐতিহ্যের মধ্যেও নয়। সে প্রশ্নের উত্তরের জন্য ধর্মের মহান শিক্ষকদের কাছেও যাওয়া উচিত নয়। তাঁদের কাছে এর কোনও উত্তর নেই। যদি বৈজ্ঞানিকরা আধ্যাত্মিক লোকেদের কাছে তাঁদের সমস্যার সমাধানের জন্য যান, তাহলে তাঁরা দারুণ ভুল করবেন, যার থেকে বড় ভুল আর কিছু হতে পারে না। ধার্মিক লোকেরা আমাদের যে ভুল পথে চলতে বাধ্য করেছে, সেই পথ থেকে ফিরে আসার আর কোনও প্রক্রিয়া নেই।

- *তাহলে আমাদের কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?*

আমি মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য আসিনি বা এরকম দৈববাণী শোনাতে চাই না যে মানবজাতি ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হচ্ছে। আমি কোনও ‘আর্মাগেডন’–এর কথা বলছি না বা এই পৃথিবীর বুকে এক স্বর্গ গড়ে তোলার ভাবনা উঠবে বলেও ভবিষ্যৎবাণী করছি না। এই যে স্বর্গের ধারণা এবং পৃথিবীর বুকে এক স্বর্গ গড়ে তোলার ভাবনা তা এই সুন্দর পৃথিবী যা সবসময় স্বর্গভূমি ছিল, তাকে নরকে পরিণত করছে। আজ পৃথিবীর বুকে যা ঘটছে শুধু মানবজাতি পুরোপুরি এর জন্য দায়ী; আজ আমাদের সামনে যেসব সমস্যা আছে অতীতের কোনও উত্তর তার সমাধান দিতে সক্ষম নয়। অতীতের গৌরব বা অতীতের মহান শিক্ষকদের শিক্ষা বর্তমান মানবজাতির কোনও কাজে লাগবে না। সেই শিক্ষকরা অবশ্যই বলবেন যে আপনারা সবাই অসফল রয়ে গেছেন কিন্তু তাঁদের কাছে সমস্যার সমস্ত উত্তর ও সমাধান আছে, যা আজ মানবজাতির সামনে বিশাল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় না কারোর কাছে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আছে বলে। আমাদের নিজেদের মুক্তির জন্য যদি কোনও উত্তর থাকে, তবে তা আমাদের নিজেদের খুঁজে বের করতে হবে।

- *আমি এক জায়গায় পড়েছিলাম যে, ‘‘আপনার নিজের ছবি আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধু।’’*

(হাসি) এসব সেলসম্যানের বক্তৃতা, কিন্তু খুব মজার কথা। প্রকৃত পক্ষে এর উলটোটাই সত্যি; আমাদের কাছে যে প্রতিচ্ছবি আছে, সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই পৃথিবীটা আসলে কি? এই পৃথিবীটা দু’টো ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এই ভিত্তির উপর ‘‘আমি সম্পর্কের

মধ্যে দিয়ে কি পাব?'' পরস্পরের স্বার্থ রক্ষাই সমস্ত সম্পর্কের ভিত্তি মূল। আপনি কোনও সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যা চান তা যদি না পান তাহলে সম্পর্কের মধ্যে ভাঙন ধরে। আর যা পড়ে থাকে, যাকে আপনি প্রেমের সম্পর্ক বলেন, তা হল ঘৃণা। আর যখন সবকিছু অসফল হয়ে যায়, তখন আমরা শেষ অস্ত্র চালাই, তা হল 'ভালোবাসা'। কিন্তু 'ভালোবাসা' তার প্রকৃতিতে, তার জন্মসূত্রে এবং তার প্রক্রিয়ায় এক ফ্যাসিবাদী জিনিস। এ আমাদের কোনও মঙ্গল করতে পারে না। আমরা ভালবাসা নিয়ে হয়তো অনেককিছু আলোচনা করি, কিন্তু তার কোনও অর্থ নেই। আমাদের এই যুগের সব গান হল, ''প্রেম, প্রেম, আর প্রেম।''

- *আপনি কি টেলিভিশন ভালোবাসেন?*

হ্যাঁ, আমি টেলিভিশন দেখি। আমি শব্দ বন্ধ করে শুধু ছবিগুলো নড়াচড়া করে তাই দেখি। আমি আসলে অনুষ্ঠানের থেকে বিজ্ঞাপন দেখতে ভালোবাসি, কারণ আসল অনুষ্ঠানের থেকে বিজ্ঞাপনগুলো অনেক আকর্ষণীয়। লোকে যদি বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়তে পারে, তাহলে লোকে আজকালকার বাজারে গুরুরা যে ধার্মিক সামগ্রী বিক্রি করে তার ফাঁদেও পড়তে পারে। আপনি কীভাবে বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়েন, আমি শুধু অবাক হয়ে সেটাই ভাবি; কিন্তু সত্যি কথা হল, বিজ্ঞাপনগুলো ভীষণ আকর্ষণীয়। আসলে আমি যা অবাক হয়ে দেখি তা বিজ্ঞাপনও নয় বা বিজ্ঞাপন দিয়ে যা বিক্রি করার চেষ্টা করে, সে বস্তুও নয়, তা হল সেলসম্যানশিপের কলাকৌশলগুলো। এসব সত্যি আশ্চর্যজনক ও আকর্ষণীয় – আমার এসব কলাকৌশলের উপর একটা টান এসে গেছে। তাঁরা যা বিক্রি করেন আমি তার কোনওকিছুই কিনি না।

- *শীঘ্রই রাশিয়াতে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখানো শুরু হয়ে যাবে।*

রাশিয়াতে এ ঘটনাই ঘটেছে। এসব আপনাদের (আমেরিকার) গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার ধ্যানধারণা বা আদর্শ নয়, যা রাশিয়াকে আপনাদের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছে। তা হল কোকা কোলা, যতদূর মনে হয় চীনদেশে এবং পেপসি কোলা রাশিয়াতে, যা সবার মন জয় করেছে। আমাকে বলুন কেন রাশিয়াতে জৈব প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা আলুর চিপস বাজারে বিক্রি করতে হবে? এসব আমি জানতে চাই। এখানে শুনলাম ম্যাকডোনাল্ডও খুলেছে। পশ্চিমের দেশ শুধু এসব জিনিস তাদের

দিতে পারবে, আর কিছু না, এবং এভাবেই বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের চালচলন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেঁচে থাকে, যদি আমরা বেঁচে থাকি, যদি আমারা আমাদের মূর্খ চিন্তাভাবনা এবং জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে নিজেদের ধ্বংস না করে দিই, তাহলে আমেরিকার জীবনযাত্রাই হবে ভবিষ্যতের জীবনযাত্রা। এমনকী তৃতীয় বিশ্বেও সে ধরনের জীবনযাত্রা চালু হবে, যার মধ্যে ভারতবর্ষও থাকবে। ভারতে এখন সুপার মার্কেট এসে গেছে। আমেরিকার লোকেরা নতুন জিনিসের প্রবর্তন করতে অত্যন্ত পারদর্শী। সুতরাং এই ব্যবসাজনিত মনোবৃত্তি পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

- *টাকা পয়সা সম্পর্কে আপনার মনোভাব কি?*

টাকা হল আমাদের জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস। তাঁরা (ধার্মিক লোকেরা) বলেন যে টাকা হল সমস্ত অশুভ জিনিসের মূল কারণ। কিন্তু সত্যি কথা হল, এটা মন্দের মূল হেতু নয়, এটা আমাদের অস্তিত্বের মূল বস্তু, আমাদের বেঁচে থাকার মূল উপকরণ। আমি কখনও কখনও বলি আপনি টাকার ভগবানকে যদি পূজা করেন তাহলে যথেষ্ট পুরস্কৃত হবেন। আর যদি অন্য ভগবানকে পূজা করেন – তা সে আছে কিনা সে যে কোনও লোকের ধারণার ব্যাপার, তাহলে আপনার যা কিছু আছে সব খোয়াতে হবে এবং তিনি আপনাকে বস্ত্রহীন করে রাস্তার এনে দাঁড় করাবেন। তাই বলি টাকাকে পূজা করা অনেক ভালো। একজন লোককে দেখান যে টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না; এই পৃথিবীতে এমন একজন লোকও খুঁজে পাবেন না। যে সমস্ত ধার্মিক লোকেরা পয়সার প্রতি তাঁদের নিস্পৃহ ভাবকে তুলে ধরে বক্তৃতা দেন, তাঁরা আসলে পয়সার ব্যাপারেই বেশি চিন্তিত। আপনি ভেবে দেখুন, কীভাবে তাঁরা বিরানব্বইটা রোলস-রয়েজ জড়ো করতে পারেন? আপনি চেষ্টা করে দেখুন তো একটা রোলস-রয়েজ কিনতে পারেন কিনা, তাহলে বুঝতে পারবেন এটা কত কঠিন ব্যাপার। ধার্মিক লোকদের পক্ষে এটা অত্যন্ত সোজা ব্যাপার, কারণ অন্য সবাই নিজেদের বঞ্চিত করে গুরুকে তাদের টাকাপয়সা দিয়ে দেয়। সুতরাং আপনি অন্য লোকের খরচায় ধনী হয়ে থাকতে পারেন। আপনার কত টাকাপয়সা প্রয়োজন সেটা অন্য ব্যাপার। প্রত্যেককে তাঁর নিজের প্রয়োজনের ব্যাপারটা নিজেকে স্থির করতে হবে। আর একবার যখন আপনার প্রয়োজন এবং লক্ষ্য এক হয়ে যাবে, তখন সমস্যা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

- *সুতরাং আপনি মোটামুটি এখানেই আছেন, এই মুহূর্তে যা–যা হচ্ছে তাই নিয়ে পুরোপুরি ব্যস্ত।*

একবার যখন এটা আপনার জীবনের বাস্তবতা হয়ে যায়, তখন পৃথিবীতে বাস করা অত্যন্ত সরল ব্যাপার হয়ে যায়, এই জটিল এবং দুর্বোধ্য পৃথিবীতে যা আমরা সবাই তৈরি করেছি। এই পৃথিবীর জন্য আমরা সবাই দায়ী। একবার যখন নিজেকে পরিবর্তন করে আরও ভালো করার দাবি ভেতর থেকে চলে যাবে, নিজে সত্যি যা তা থেকে অন্য কিছুতে পালটে ফেলার চাহিদা চলে যাবে, তখন পৃথিবীকে পালটে দেবার সব দাবিও ভেতর থেকে চলে যাবে। আমি এই পৃথিবীর কোনও কিছুতে কোনও গলদ দেখতে পাই না। এই পৃথিবীতে গোলমালটা কোথায়? আমরা যা, তা দিয়ে পৃথিবীর অন্য কোনওভাবে থাকা সম্ভব নয়। যদি আমাদের মধ্যে কোনও যুদ্ধ চলতে থাকে, তাহলে আমাদের বাইরে কোনও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী আশা করতে পারি না। আমরা অবশ্যই যুদ্ধ ডেকে আনব। আপনি হয়তো বলবেন যে এসব নির্ভর করে কে এবং কারা যুদ্ধের জন্য দায়ী। এটা শুধুই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ যে একজন অন্যজনকে বলছে 'যুদ্ধবাজ' আর নিজেকে জাহির করছে 'শান্তিবাদী' বলে। এই 'যুদ্ধবাজ'–রা এবং 'শান্তিকামী'–রা একই নৌকায় ভ্রমণ করছে। এ যেন ঠিক পাত্র বলে কেটলিকে 'তুই কালো' বা এর উলটোটা কেটলি বলে পাত্রকে 'তুই কালো।'

- *আমরা সবাই তাহলে বাক্য আর ধারণার মধ্যে আবদ্ধ।*

আমাদের সাহস নেই 'বর্তমান'–কে (যাকে দার্শনিকরা সবসময় 'What is' বলেন) একলা ফেলে রাখতে, এর অর্থ হল আপনি এখনও যাকে অভিমানের বশবর্তী হয়ে 'What is' বলে অভিহিত করছেন তাকে আঁকড়ে ধরে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এটা হল অজানার সঙ্গে লেনদেন করার মতো ব্যাপার। অজানা বলে আসলে কোনও কিছু নেই। জ্ঞানের জগৎ সমানে অজানাকে তার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস করে চলেছে। আমরা সবসময় এই খেলা চালিয়ে যাচ্ছি। এভাবেই আমরা আমাদের সবসময় বোকা বানাই যখনই কোনও সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে যাই। আমাদের সমস্ত উৎসাহজনক প্রচেষ্টা যখন আর কাজ করে না তখন আমরা নিরুৎসাহজনক প্রচেষ্টার উদ্ভাবন করি। কিন্তু নিরুৎসাহজনক প্রচেষ্টারও একই লক্ষ্য যা উৎসাহজনক প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল। আসলে আমাদের

পক্ষে যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হল আমাদেরকে লক্ষ্যে পৌঁছাবার চিন্তা থেকে মুক্ত করে ফেলতে হবে। একবার যখন আমরা এই লক্ষ্যের (সমস্যা সমাধানের) হাত থেকে মুক্ত, তখনই কোনওরকম প্রচেষ্টার – তা উৎসাহজনক হোক বা নিরুৎসাহজনক হোক তার আর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

- *প্রকৃতিতে এই আশাব্যঞ্জক চিন্তা বা হতাশাজনক চিন্তা বলে কি কিছুই নেই?*

এদের কোনও অস্তিত্বই নেই। যদিও বা থেকে থাকে, তাহলে এ দু'টো একই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা একথাই বলেন। আপনি যদি ব্রহ্মাণ্ড নিরীক্ষণ করেন, দেখবেন সেখানে বিশৃঙ্খলা। যেই মুহূর্তে আপনি বলবেন যে এটা বিশৃঙ্খলা, সেই মুহূর্তে সেই কাঠামোতে শৃঙ্খলার উপস্থিতি ঘটবে। সুতরাং আপনি নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন না যে ব্রহ্মাণ্ডতে শৃঙ্খলা বিরাজমান, না শুধুই বিশৃঙ্খলা। এ দু'টো জিনিস ঠিক একই সঙ্গে ঘটে চলেছে, ঠিক একই প্রক্রিয়ায় এই পৃথিবীর জীবন্ত প্রাণীরা বেঁচে আছে। যে মুহূর্তে চিন্তা জন্ম লাভ করে, তা এখানে টিকে থাকতে পারে না। চিন্তাকে আমি 'বস্তু' বলে অভিহিত করি। একবার যখনই এই বস্তু যা জীবন্ত প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন তার উৎপাদন হল – সেই বস্তু তখন শক্তির অন্তর্গত হয়ে গেল। ঠিক একইভাবে জীবন ও মৃত্যু হল সমকালীন প্রক্রিয়া। চিন্তা এই দুই সমকালীন প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তরের সৃষ্টি করে দু'টো আলাদা বিন্দু জন্ম ও মৃত্যু বলে অভিহিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে জন্ম ও মৃত্যু একক ও সমকালীন প্রক্রিয়া। আপনি বলতে পারবেন না যে আপনি জীবিত না মৃত। কিন্তু আপনি যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, ‘‘আপনি কি জীবিত?’’ আমি স্থিরতার সঙ্গে উত্তর দেব, ‘‘আমি জীবিত।’’ সুতরাং আমার উত্তর হল আমাদের দু'জনের সাধারণ জ্ঞান, যা আমরা জেনেছি যে কীভাবে জীবিত প্রাণী কাজ করে। এই জ্ঞানের উপযোগ করেই আমি বলতে পারি যে আমি এক জীবন্ত প্রাণী এবং কোনও মৃত ব্যক্তি নই। কিন্তু এসব ধারণাকে আমরা অসম্ভব প্রাধান্য দিই। আমরা সবাই এক হয়ে (বহু আলোচনা করে) অনন্তকাল ধরে আলোচনা চালিয়ে যাই। আর তার মধ্য দিয়ে আমাদের চর্তুদিকে এক বিশাল চিন্তার কাঠামো জন্ম গ্রহণ করে।

- *এর অর্থ কি তাহলে এই – যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা আগামী সপ্তাহে এখানে মিলিত হবেন, তাঁদের এটা উপলব্ধি করা দরকার যে সমাধানের কোনও রাস্তা নেই?*

তাঁরা যদি একথা সত্যি বুঝতে পারেন তা হলে আর কোনওদিন কোনও সমাধান দেবার চেষ্টা করবেন না। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও রাস্তা নেই। যেটা একমাত্র উপায়, তা হল এই যে, তাঁদের এটা বুঝতে হবে যে সমস্যার কোনও সমাধান নেই। এই মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে হয়তো কোনও কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে।

- *এমনকী যদি আপনি ভালো করে বুঝতে পারেন কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল ...*

ভালো–মন্দকে বলার বা চেনার প্রশ্ন এটা নয়। বেরোবার কোনও পথ নেই। এই ফাঁদ থেকে বেরোবার জন্য যে কোনও কাজ আপনি করুন না কেন, এতে ফাঁদ আরও সুদৃঢ় এবং মজবুত হয়ে যাবে, কারণ এ ফাঁদ আপনার নিজের তৈরি। আর আপনি কোনওভাবে এটা মানতে রাজি নন যে আপনার সব চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হবে। সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আমি এই 'আত্মসমর্পণ' শব্দটা ব্যবহার করতে পছন্দ করি না, কারণ এর মধ্যে এক অতিপ্রাকৃতিক সুর জড়িয়ে আছে। এটা হল এক সম্পূর্ণ আশাহীন অবস্থা, যা নিজে থেকে বলে এ পরিস্থিতি থেকে বেরোবার কোনও রাস্তা নেই। যে কোনও রকমের প্রচেষ্টা, যে কোনও দিকে, যে কোনও স্তরে করুন না কেন, তা আপনাকে আশাহীন অবস্থা থেকে সরিয়ে দেবে। সেই আশাহীন অবস্থায় থাকলে হয়তো কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। আমাদের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু এই যে আশাটুকু যা বলছে কিছু হলেও হতে পারে, সেটাও একটা আশাজনক অবস্থা।

- *কোনও কোনও সময়ে আমরা কোনও একটা সমস্যার কোনও সমাধান করার যখন আর চেষ্টা করি না, তখন সমস্যা আপনি–আপনি শেষ হয়ে যায়।*

হ্যাঁ। এরকম ব্যাপার ঘটে এমনকী গণিতজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিকদের জীবনেও, তাঁদের বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও। তাঁরা যখন পুরোপুরি অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, তখন সেই যন্ত্রটা যেটার উপযোগে তাঁরা সমাধান করেন সেটাও বিশ্রাম পায়। এটা কোনও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার বা ঘটনা নয়। আপনি আপনার কম্প্যুটারকে সময় দেন, সমস্যার সমাধান করার জন্য। সে ঠিক উত্তর বের করে আনে, যদি কোনও উত্তর থাকে। কিন্তু যদি কোনও উত্তর না থাকে, তাহলে তো সমস্ত গল্পের সেখানেই ইতি।

- *তাহলে আপনি সব হাল ছেড়ে দেন? ভাষার সমস্যার জন্য সঠিক ধাঁচের প্রশ্ন*

করাটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

আমাদের ভাষার কাঠামো এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে আপনি দ্বান্দ্বিকতার সাহায্য ছাড়া কোনও সমস্যার সমাধানের দিকে এগতে পারবেন না। আমি অবশ্য 'দ্বান্দ্বিক' শব্দটাও পছন্দ করি না, কারণ এর মধ্যে ধর্মের টান আছে?

- *শব্দের আর বাস্তবতার মধ্যে কি সম্পর্ক আছে?*

কোনও সম্পর্ক নেই। শব্দের বাইরে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

- *জীবন কি খুবই কঠিন?*

জীবন সত্যি কষ্টকর। তাই নিয়মানুবর্তিতা লোকের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। মানুষের মধ্যে এসব দেখে আমরা গুণমুগ্ধ হই এবং শ্রদ্ধাভরে বলি, তিনি ভীষণ জীবনযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। আমাদের ধার্মিক চিন্তাধারার মূল ভিত্তিপ্রস্তর হল যন্ত্রণাভোগ। যদি ধর্মের জন্য না হয় তাহলে আপনি কষ্টভোগ করুন দেশের জন্য, দেশপ্রেমের নাম দিয়ে...

- *আপনার পরিবারের জন্য...*

যাঁরা আমাদের উপর এই ধরনের নিয়মানুবর্তিতা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তাঁরা লোকের দুঃখে আনন্দ ভোগ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, আমরা সবাই নিজেদের ক্ষত-বিক্ষত করে আনন্দ লাভ করি, এসব কিছু মেনে নেবার মধ্য দিয়ে। আমরা কোনও কিছু পাওয়ার আশায় নিজেদের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে ফেলি....। আমরা আমাদের ভাবনার ও বিশ্বাসের 'দাসানুদাস'। আমরা এসব জিনিস ছুঁড়ে ফেলতে রাজি নই। যদি কখনও এসব ছুঁড়ে ফেলতে সমর্থ হই, তখন অন্য আর এক বিশ্বাস ও ভাবনাকে এনে সেখানে বসিয়ে দিই, নতুন ধরনের নিয়মানুবর্তিতার প্রচলন করি। আজ যারা যুদ্ধক্ষেত্রে কুচকাওয়াজ করে শত্রুর মুখোমুখি হচ্ছে, হত্যা করতে বা হত হতে, তা সে গণতন্ত্র রক্ষার জন্যই হোক, স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই হোক বা সাম্যবাদ আনার জন্যই হোক, প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গে পুরানো যুগে যাদের ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ছেড়ে দেওয়া হত, তাদের কোনও পার্থক্য নেই। রোমের লোকেরা উৎসাহ ও আনন্দভরে এসব দেখত। তাদের সাথে আমাদের পার্থক্যটা কোথায়? একবিন্দুও ফারাক নেই। আমরাও এসব ভালোবাসি। 'হয় মার, নয় মর' এই হল সংস্কৃতির মূল শিক্ষা।

- *আপনি যেখানেই যান লোকে আপনার আচরণ ও শারীরিক অবস্থার উপর*

মন্তব্য করে। আপনি নিজেকে কীভাবে এত সুস্থ রাখেন? আমি জানি যে আপনি যোগাভ্যাস বা অন্য ধরনের ব্যায়াম করেন না।

আমি কোনওরকমের ব্যায়াম করি না। আমার একমাত্র ব্যায়াম হল, আমি যেখানেই থাকি সেখান থেকে ডাকঘরে রোজ একবার যাই আর ফিরে আসি, হয়তো বড়জোর আধ মাইল দূরত্ব হবে। কিন্তু আগে আমি প্রচুর হাঁটতাম। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে হয়তো আমাকে প্রচুর ভুগতে হবে। কারণ অতীতে আমি অতিরিক্ত হাঁটাহাটি করেছি বলে। আপনি জানেন যে আমি এ ব্যাপারে পারদর্শী নই। তাই বিশেষ ধরনের মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি, আমি জানি না এর কারণ কি, তা সে যে কারণেই হোক, আমাদের এই দেহ আমাদের কাছ থেকে কিছু জানতে বা শিখতে চায় না। এ বিষয়ে অবশ্য কোনও সন্দেহ নেই যে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও তার কারিগরী ক্ষেত্রে আমাদের প্রগতি অসাধারণ, কিন্তু তারা কি সত্যিই এ শরীরের কোনও উপকার করে? সেটাই হল অন্যতম প্রধান প্রশ্ন এবং এই মূল প্রশ্নকেই আমাদের নিষ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করা দরকার।

- *আমরা কি শরীরকে সত্যি সত্যি সাহায্য করতে পারি?*

আমরা সত্যি সত্যি যা করি বলে মনে হয় আমার, তা হল আমাদের দেহে যদি কোনও লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে তার চিকিৎসা করি এবং সেই লক্ষণকে আমরা রোগ বলে অভিহিত করি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, যে প্রশ্নটা আমি সবসময় সেসব লোকের দিকে ছুঁড়ে দিই যাঁরা সত্যিকারের পারদর্শী অর্থাৎ ডাক্তাররা – স্বাস্থ্য কি? রোগ কি? শরীরের কি রোগ বলে কোনওকিছু আছে? আমরা, শরীর যখন ঠিকমতো কাজ করে না, তাকে অনুবাদ করি এভাবে যে শরীর তার স্বাভাবিক তাল হারিয়ে ফেলেছে এবং ভারসাম্যের তারতম্য ঘটেছে। তার অর্থ এই নয় যে আমি সত্যি জানি শরীরের স্বাভাবি ছন্দ কি? কিন্তু আমরা এতই ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি যে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে দৌড় লাগাই, বা এমন একজনের কাছে যাই যে এসব ভাল বোঝে বা জানে বলে আমরা মনে করি। আমরা আমাদের শরীরকে তার নিজের সমস্যা নিজেকে সমাধান করতে কোনওরকম সুযোগ দিই না। যে সমস্যা আসলে সৃষ্টি হয়েছে, তা আমরা যে পরিবেশের মধ্যে আছি তার ভেতর থেকেই হয়েছে। আমরা আমাদের শরীরের জন্য যথেষ্ট সময় পর্যন্ত দিই না, আমরা জানিও না যে

আমাদের শরীর সুস্থ না অসুস্থ।

- *আমরা জানি। আমরা স্বাস্থ্যকে অনুবাদ করি এভাবে, যখন শরীর সমস্ত লক্ষণ থেকে মুক্ত – তখন আমরা সুস্থ। আমার হাঁটুতে যখন কোনওরকম ব্যথা-বেদনা নেই, তখন আমি বলি আমার হাঁটুতে কোনও রোগ নেই। আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অনুসন্ধান চালাতে উৎসাহিত করি, যার মধ্যে দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন হবে, যার উপযোগ হবে তখন যখন আমাদের হাঁটুতে ব্যথা হবে।*

কিন্তু ব্যথা জিনিসটা কি? আমি কোনও আধিভৌতিক উত্তর আশা করি না। আমার কাছে ব্যথা হল আরোগ্য লাভের প্রক্রিয়া। কিন্তু আমার শরীরকে তার নিজেকে সাহায্য করার বা নিজেকে নিজের সারিয়ে তোলার বা আমরা যাকে ব্যথা বলি, তার থেকে নিজেকে নিজের মুক্ত করে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ও সময় কখনই দিই না।

- *আপনি কি বলতে চান যে, যে সমস্ত কাজ আমরা করি তা সে যে কোনওভাবেই হোক, সম্ভবত শরীরকে দীর্ঘদিন সুস্থভাবে ও সুখে বেঁচে থাকার প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে, সুতরাং আমাদের শরীরকে নিজের মতো থাকার জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত?*

হ্যাঁ, শরীরকে নিজের মতো থাকতে দিতে হবে। কিছু হতে না হতেই ভয়ে ভীত হয়ে এখানে, সেখানে দৌড়ে যাবার কোনও দরকার নেই। তা যে যাই করুন না কেন, মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই নেই।

- *আমি বুঝতে পারছি আপনি কি বলছেন। মানুষ অবচেতনভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে কীভাবে মৃত্যু রোখা যায়।*

আপনি হয়তো জানেন, আমাদের সবাইকে কোনও এক মূল্যবোধের কাঠামোতে মানিয়ে নেবার জন্য জোরাজুরি করাটা অত্যন্ত অনভিপ্রেত জিনিস। আপনি চান সবাই এক মূল্যবোধে বিশ্বাস করুক। আমরা কোনওদিন প্রশ্ন করি না এই মূল্যবোধের ধারণাকে। শত শত বছর ধরে এই ধারণা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, হয়তো এটাই আমাদের দুখঃ-কষ্টের প্রধাণ কারণ।

- *হ্যাঁ, হয়তো সেসবই হল রোগ ভোগের প্রধান উৎস।*

আমাদের জীবনে রোগ ভোগ এবং দ্বন্দ্ব বিরোধ এ দু'টোই হয়তো এর জন্য দায়ী।

আমরা যদিও সঠিকভাবে একথা জানি না। আর একটা জিনিসের উপর আমি জোর দিতে চাই এবং তা হল আমাদের পরিচিতি, যাকে 'আমি', 'তুমি', 'কেন্দ্র', 'আত্মা', 'মন' বলে জানি, সব কিছু কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদের আসলে কোনও অস্তিত্ব নেই।

- *এটা প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির দান।*

হ্যাঁ, এসব সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যা কিছু করা সম্ভব, তার সবকিছু করি এই সত্ত্বাকে বজায় রাখতে, তা সে ঘুমিয়ে থাকি, জেগে থাকি বা স্বপ্ন দেখতে থাকি। আমরা যে যন্ত্রের উপযোগ করি আমাদের সত্ত্বাকে বজায় রাখার জন্য, সে যন্ত্র এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী হয় ও আমাদের আরও গভীরে চলে যায় এবং সত্ত্বাকে বজায় রাখার কাজে অনেক বেশি কার্যকরী হয়। আপনার স্মরণশক্তির ক্রমাগত ব্যবহার আপনাকে ক্ষয় করে ফেলছে। আমরা সত্যি সত্যি জানি না 'স্মৃতি' জিনিসটা কি, কিন্তু আমরা সব সময় এর ব্যবহার করে চলেছি, আমাদের সত্ত্বাটিকে বজায় রাখতে।

- *সুতরাং আমরা বারবার আলোচনার এই বিন্দুতে এসে হাজির হচ্ছি যে, চিন্তা প্রকৃতপক্ষে আমাদের শত্রু, শরীরের উপর অনধিকার হস্তক্ষেপ করে চলেছে।*

এটা আমাদের শত্রু। চিন্তা হল আত্মরক্ষণমূলক কার্যসাধনের বন্দোবস্ত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, নিজেকে রক্ষা করা এবং জীবন্ত প্রাণের ক্ষয়ের বিনিময়ে সে এই কাজ করে।

- *তাহলে আপনি বলছেন চিন্তা হল সেই জিনিস, যা আমাদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করে।*

চিন্তা আমাদের জীবনে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি করে এবং এ জিনিস কোনওদিন আমাদের সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করবে না, কারণ এটা তারই সৃষ্টি।

- *আপনি এমন এক অবস্থার কথা বলছেন যা মানুষের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। আমি জানতে চাই, এই যে স্বাভাবিক অবস্থা, এটা কি চেষ্টা করে লব্ধ করা যায়? এটা আদৌ লব্ধ করা যায়, না এটা কোনও দৈবাৎ ঘটনা?*

আমি যখন 'স্বাভাবিক অবস্থা' বলে বর্ণনা করি বা শব্দটা ব্যবহার করি, তখন আমি 'জ্ঞানালোকপ্রাপ্তি', 'মুক্তি' বা 'ঈশ্বর উপলব্ধি' জাতীয় কোনওকিছু মনে করি না। কোনওভাবেই না। মানুষের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভার থেকে শরীর যখন মুক্তি

লাভ করে তখন শারীরিক জীবন অর্থাৎ দেহ তার নিজের ছন্দ অনুযায়ী কাজ করতে পারার সুযোগ পায়। আপনার স্বাভাবিক অবস্থা জীবভিত্তিক, স্নায়ুভিত্তিক এক শারীরিক অবস্থা মাত্র।

- *তাহলে আমি ধরেই নিতে পারি যে আপনি আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে একমত, আমাদের দেহের জিন আমাদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অন্তিম অবস্থায় নিয়ে যায়।*

আমাদের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় জিনের কতটা অবদান আছে সে ব্যাপারে আমি নির্দিষ্টভাবে কোনও মতামত দিতে পারব না। কিন্তু এই সময়ে মনে হচ্ছে ডারউইনের মতবাদ আংশিকভাবে ভুল যখন তিনি বলেন যে অর্জনকারী চরিত্রসমূহ পরবর্তী প্রজন্মে জিনের মাধ্যমে প্রেরিত হয় না। আমার মনে হয়, এই গুণাবলীও কোনওভাবে পরবর্তী প্রজন্মে পৌঁছে যায়। আমি অবশ্য এ বিষয়ে পারদর্শী নই, তাই বলতে পারছি না জিন এই চারিত্রিক হস্তান্তরে কোনও ভূমিকা পালন করে কি না।

সে যাই হোক, আসল সমস্যার অবস্থান হল 'মন'-এ। আমরা সবসময় কার্যকরী আমাদের চিন্তার জগতে, আমাদের জীবভিত্তিক অস্তিত্বের মধ্যে নয়। এই পৃথক অস্তিত্বের চিন্তা জগত, যা মানুষের জ্ঞানের অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপায়ণে এবং যাকে আমরা 'সাইকি', আত্মা বা আত্ম বলি, সেটাই আমাদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই সমস্ত জিনিস প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে দুর্দশার সৃষ্টি করে – এ সব সর্বদা মানুষের ভেতরে ভেতরে যুদ্ধ বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই উদ্বাস্তু বা পরগাছা চিন্তার জগৎ তৈরি করেছে সমস্ত রকমের মূল্যবোধকে। শরীর আমাদের কোনও মূল্যবোধকে কোনভাবেই পাত্তা দেয় না, আমাদের মূল্যবোধের কাঠামোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল, এই মুহূর্ত থেকে পরবর্তী মুহূর্তে টিকে থাকা আর কোনও কিছু না। এর কাছে আধ্যাত্মিক মূল্যের কোনও অর্থ নেই। যখন কোনও অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে বা দৈবক্রমে আপনি চিন্তার কঠোর বন্ধন থেকে এবং সংস্কৃতির হাত থেকে মুক্তি পাবেন, তখন আপনি শরীরের স্বাভাবিক কার্যাবলী নিয়ে বেঁচে থাকবেন। দেহ তখন চিন্তার ভার থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ছন্দে কাজ করতে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ভৃত্য, সেই চিন্তার কাঠামো যা পরগাছা হয়ে বাস করছে, তা এই দেহাবাসকে অধিকার করে

বসে আছে। কিন্তু আর সে নিয়ন্ত্রণ করে ঘর সংসারের কাজ চালাতে পারছে না। একে সরিয়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে। এই অর্থে একে আমি ‘স্বাভাবিক অবস্থা’ বলি, কোনওরকম আধ্যাত্মিক বা নির্বাণের সুর এর মধ্যে আদৌ নেই।

- *তথাপি আমাদের প্রায় সকলের মধ্যে বহু প্রশ্ন রয়ে যায়। আমরা সবসময় বার করতে চাই, জানতে চাই জীবন কি, আর তার অর্থ থাক আর নাই থাক।*

জীবন এমন একটা জিনিস যাকে আপনি ধরতে পারবেন না, বন্দি করতে পারবেন না এবং কোনওভাবে রূপদান করতে পারবেন না। শক্তি হল জীবনের অভিব্যক্তি। মৃত্যু কি? এটা শুধু মানুষের দেহের অন্য এক অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু বলে কোনও কিছু নেই। আপনি যা জানেন তা হল মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা। যে সমস্ত ধারণা যা অন্য একজনের অনুপস্থিতিতে আপনার মধ্যে বিশেষ এক রকমের অনুভূতি জাগায়। আপনার মৃত্যুর বা আপনার প্রিয়জনের মৃত্যুর আপনি কোনওদিন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন না। একে অভিজ্ঞতার আওতায় আনা যায় না। আপনি প্রকৃতপক্ষে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা হল শূন্যতা, যার সৃষ্টি হয় অন্য একজনের পুরোপুরি হারিয়ে যাওয়ায়; সেই ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ধারাকে বজায় রাখার তাগাদাকে আর সন্তুষ্ট রাখা যায় না, কারণ তার অস্তিত্বের কোনও প্রকাশ নেই। এই সমস্ত চিরস্থায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রস্থান হল মনের উদ্ভাবন, যার আগ্রহ হল বাধাবিঘ্নহীন ‘আত্মগঠিত’ চিরস্থায়ী এক মায়াবী ভবিষ্যতে। এই ভবিষ্যৎ ধারাকে বজায় রাখার মূল প্রণালী হল ক্রমাগত এক প্রশ্ন করে যাওয়া, ‘‘কীভাবে? কীভাবে? কীভাবে? কীভাবে জীবন চালাব? কীভাবে আমি সুখি হব? কীভাবে আমি নিশ্চিত হই যে ভবিষ্যতে সুখে থাকব?’’ এসব প্রশ্ন জীবনকে সমাধানের অতীত সমস্যা করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আমরা জানতে চাই এবং সেই জ্ঞানের মাধ্যমে আশা করি যে আমরা আমাদের দুর্দশাময় জীবন চিরকাল ধরে চালিয়ে যাব।

- *এই সমাজে কত লোক এ ব্যাপারে আগ্রহী...*

আমি যা বলছি তাতে সমাজ আগ্রহী হতে পারে না। সমাজ হল দু’টো লোক বা হাজার লোকের এক অবস্থান। যেহেতু আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে হুমকি দিচ্ছি ... আপনার অস্তিত্বকে, যাকে আপনি জানেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন, ... তাই আমি সমাজের পক্ষেও বিপজ্জনক। সমাজের কীভাবে এব্যাপারে আগ্রহ থাকার

সম্ভাবনা থাকতে পারে? কোনও সম্ভাবনাই নেই। সমাজ হল সব রকমের সম্পর্কের সমন্বয়, আপনি যেখানে (যা কিছু দেখেন বলে বিশ্বাস করেন) মেনে নিতে পারার মত কিছু পাবেন বলে যতই বিশ্বাস করুন না কেন, তা সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই সমস্ত হল হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন এবং ভয়ংকর; এটা অত্যন্ত বিস্বাদজনক, কুৎসিত এবং অপ্রিয় সত্য, যা আপনি গ্রহণ করুন আর নাই করুন। আপনার পক্ষে এই নিকৃষ্ট, কুৎসিত সম্পর্কের উপর এক অলীক বাহ্য-প্রলেপ, যথা ভালোবাসার, দয়ার, ভ্রাতৃত্বের বা ছন্দোময় সম্পর্ককে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

- *আমি প্রায়শই নিজেকে প্রশ্ন করি, সমাজের ব্যাপক জনসাধারণের উপর আমার কৃতজ্ঞতামূলক কোনও সম্পর্ক আছে কি?*

কোনও রকমের কিছুই নেই ... দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি যাতে আগ্রহী তা হল আপনার আত্ম-সন্তুষ্টি, আপনার চরম লক্ষ্য হল নোবেল প্রাইজ এবং শক্তি অর্জন করা। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই একথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে আপনি হয়তো সে সমস্ত ব্যাপারে আগ্রহী নন। ঠিক আছে। কিন্তু আমি লোককে সেসব করতে উৎসাহিত করি। একথা ঠিক যে আপনারা, বৈজ্ঞানিকরা এই সমস্ত স্বস্তিদায়ক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছেন এবং সেই অর্থে যারা আধুনিক কারিগরী বিদ্যার সুফলকে কাজে লাগায় আমি তাদের পছন্দ করি, এর জন্য আমিও এদের কাছে ঋণী। আমি আর গোরুর গাড়ির যুগে ফিরে যেতে চাই না। এটা হবে অত্যন্ত ছেলেমানুষি, অবাস্তব জিনিস। খাঁটি বিজ্ঞান, যাকে পিওর সায়েন্স বলে, তা হল কেবল অনুমান করা, এছাড়া আর কিছুই না। বৈজ্ঞানিকরা শুধু সমীকরণ নিয়ে অন্তহীনভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে এবং শেষে আমাদের হাতে কয়েকটা সমীকরণ ধরিয়ে দেয়। আমি এই 'প্রগতির কুচকাওয়াজে' এবং 'হাবিজাবিতে' একেবারেই মুগ্ধ নই। যখন প্রথমবার আমেরিকাতে গিয়েছিলাম সেই তিরিশের দশকে, আমাদের প্লেন সব জায়গায় থামতে থামতে অবশেষে আমেরিকায় এসে পৌঁছাতে প্রায় একদিনের বেশি সময় লেগেছিল; পরবর্তীকালে সেই একই পথ অতিক্রম করতে লেগেছিল আঠারো ঘণ্টা। কিছুদিন পরে লাগল বারো ঘণ্টা আর এখন ছ'ঘণ্টা, কনকর্ডে তিন ঘণ্টা। যদি সুপারসনিক জেটকে বাণিজ্যিক কাজে লাগান হয়, তাহলে একই রাস্তা হয়তো দেড় ঘণ্টায় অতিক্রম

করে যেতে পারব। ঠিক আছে, একে আমি প্রগতি বলতে রাজি। কিন্তু সেই একই কারিগরী বিদ্যা যা আন্তর্জাতিক ভ্রমণকে অত্যন্ত দ্রুততর করে তুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করেছে ভয়ংকর ধ্বংসকারী সামরিক যুদ্ধবিমান। এরমধ্যে ক'টা প্লেন যাত্রী পরিবহণের জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অত্যন্ত অল্প সময়ে এবং স্বচ্ছন্দে পৌঁছানো যায়? আর কত শত প্লেন ব্যবহার করা হয়, জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস করতে, আপনি কি তার হিসাব জানেন? আপনি একে প্রগতি বলতে চান?

আমি জানি না। যত আমাদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ছে ততই আমরা এসবের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। আমরা এসব পরিত্যাগ করতে ভয়ানক অনিচ্ছুক হয়ে পড়ি। একটা বিশেষ কাঠামোতে একে অবশ্যই প্রগতি বলতে পারি। বর্তমানে আমি একটা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকি। আমার দাদু তার ভৃত্যকে ব্যবহার করত, সে মাথাফাটা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দড়ি পাখার হাওয়া দিত আমার দাদুকে এবং তারও আগে তালপাতার হাতপাখা ব্যবহার করা হত গরমের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। আর যতই আমরা স্বাচ্ছন্দ্যকর অবস্থার মধ্যে চলে যাচ্ছি, ততই আমাদের পক্ষে আমাদের যা আছে তা পরিত্যাগ করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

- *কেউ কেউ তর্ক করে এটা বলার চেষ্টা করেন যে মানবজাতিকে সুরক্ষিত করা যাবে শুধু ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে নয়, এবং এটাই আমাদের একমাত্র আশা।*

আমি এখনও একথাই বিশ্বাস করি যে ভালোবাসা নয়, দয়া, মানবিকতা বা ভ্রাতৃত্বের অভিমান দিয়ে মানবজাতিকে রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না। কিছুতেই না, কোনওভাবেই না। যদি কোনও কিছুর পক্ষে আমাদের সাহায্য করা সম্ভব হয়, তবে তা হল 'ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ংকর ভীতি', এটাই একমাত্র আমাদের বাঁচাতে পারে। আমাদের দেহের প্রতিটি কোষ তার আশপাশে সমস্ত কোষের সঙ্গে সহাবস্থান করেই তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। এ কাজ করতে এর কোনও অভিমান বা আমরণ ভালোবাসার ঘোষণা করার দরকার হয় না। প্রত্যেকটি কোষ এটুকু ভালোভাবেই জানে যে তার প্রতিবেশী মারা গেলে সেও মারা যাবে। কোষসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সহাবস্থান করে ভ্রাতৃত্বের ভাবনা, ভালোবাসা বা এ জাতীয় কোনও কিছু ধারণার

বশবর্তী হয়ে নয়, শুধু এই জরুরি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে তাকে এই মুহূর্তে বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের ক্ষেত্রেও এটাই ঘটছে, কিন্তু অনেক বৃহৎ আকারে। শীঘ্রই আমরা সবাই একটি সাধারণ জিনিস জানতে পারব – আমি যদি আপনাকে ধ্বংস করি, আমারও তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। আজকের মহাশক্তিশালী দেশগুলো অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন তৈরি করতে চাইছে, সই করতে চাইছে এক শর্তে যে, প্রথমে কেউ কাউকে আঘাত করবে না। এমনকী সবচেয়ে শক্তিশালী দেশসমূহ যারা তাদের মধ্যে বিশ্বের অধিকাংশ যোগান নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, আজ তারাও পারমাণবিক যুদ্ধের সফলতা সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না। এমনকী দুর্দান্ত প্রতাপশালী, উদ্ধত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাদের সুর বদলেছে। তারা এখন আর সেসব কথা বলে না – যা কুড়ি বছর আগে বলত – ভংয়কর বদলার হুমকি। আপনি যদি আজকালকার টাইম সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েন, দেখবেন এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দেশ বলে অভিহিত করে না। একে 'অন্যতম প্রধান মহাশক্তিমান' দেশ বলেই সম্বোধন করে।

- *সে যেভাবেই হোক আমি মানুষের প্রতি আমার কিছু নৈতিক কর্তব্য আছে বলে মনে করি, কোনও দার্শনিক বা আধ্যাত্মিকভাবে নয়, কিন্তু আরও মূলগতভাবে। আপনি যখন দেখেন কেউ ক্ষুধার্ত তখন এ ব্যাপারে আপনার কিছু একটা করার ইচ্ছা জাগে।*

এককভাবে আপনি হয়তো কিছু করতে পারেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি এক প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন এবং এই প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করল প্রত্যেকের সাহায্যের একটি তালিকা তৈরি করতে, তখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল। আপনাকে দলবদ্ধ হতে হবে এবং এছাড়া কোনও উপায় নেই। তার অর্থ হল, আপনার পরিকল্পনা, আমার পরিকল্পনা এবং শুরু হল যুদ্ধ।

- *আপনি হয়তো বলবেন এই যে সাহায্য করার প্রবণতা এটা হল আমার সংস্কৃতির ফল। আপনি যখন কারোর দুঃখ দেখেন তখন আপনার চোখে জল আসে। আমরা জোর দিই ...*

আমরা একটা বিশেষ অবস্থাকে দুঃখ বলে অভিহিত করি এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিমানের বশবর্তী হওয়ার ফলে চোখে জল এসে যায়। কিন্তু অশ্রুকোষের

অস্তিত্বের কারণ হল, চোখকে অন্ধ হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং ভিজিয়ে পিচ্ছিল করে পরিষ্কার অবস্থায় রাখা যাতে ভালো করে বাইরের জগতকে দেখতে পায়, অন্যের দুঃখ–কষ্টে আপনার প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেওয়ার জন্য নয়। এটা হয়তো অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বলা হল, কিন্তু ঘটনার মূল সত্য হল এটাই।

- *আমি আপনার কাছে আর একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। যদিও আমরা যা নিয়ে আলোচনা করছি সেই প্রসঙ্গের সঙ্গে তা সম্পর্কহীন, এই প্রশ্নটা বহু লোক আপনাকে করতে চায়। ভগবানের অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?*

হে ভগবান। আপনি সত্যিই আমার উত্তর চান। আমার কাছে ভগবান আছেন কি নেই এ প্রশ্ন অবান্তর ও অবাস্তব জিনিস। ভগবানের কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা ভগবানকে ব্যবহার করেছি আমাদের কোটি কোটি লোককে হত্যা করার যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য। আমরা ভগবানকে উপযোগ করে শোষণ করেছি। এটা হল এর ভালো দিক, খারাপ কিছু নয়। দু'টো বিশ্বযুদ্ধে যত লোক মারা গেছে, তার থেকে অনেক বেশি লোক আমরা হত্যা করেছি ভগবানের নাম করে। জাপানে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে পবিত্র বুদ্ধের নাম করে। এখানে ভারতবর্ষে একদিনে পাঁচ হাজার জৈন ধর্মের লোককে হত্যা করা হয়। এটা কোনও শান্তিপূর্ণ দেশ নয়। আপনি আপনার নিজেদের ইতিহাস পড়তে চান না ... প্রথম থেকে শেষ অবধি পুরোপুরি হিংসা আর হিংসা।

- *ইউ জী, প্রায় সব লোকের কাছে এবং কখনও কখনও আমার কাছে আপনার কথা অত্যন্ত অযৌক্তিক বলে মনে হয় ... আপনি যা বলেন তার বেশিরভাগই বুঝতে পারি না এবং যে সমস্ত লোক আপনার বই পড়েছে এমনকী তারাও বোঝে না আপনি কি, তথাপি এমন একটা জিনিস আছে যা আমাদের বাধ্য করে আপনার উপর ধ্যান, মনোযোগ দিতে। আপনি যা বলেন তা যেভাবে বলেন সেটাই হল আসল। একটা অদ্ভুত ধরনের দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে আপনি সবকিছু বলেন। আপনি কি এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ করে এসে পড়েছেন?*

আমি কীভাবে এ অবস্থায় এসে পড়েছি, যে অবস্থায় আমি বর্তমানে আছি, তা আপনাকে বলার কোনও উপায় আমার নেই। 'কেমন করে' এবং 'কি' হল আমাদের সমস্যা, যাকে আমাদের সর্বদা সামনাসামনি করতে হচ্ছে। আপনি বুঝতে পারছেন না যে এটা হল সেই প্রশ্ন যা সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং আপনি এটাও মেনে নিতে

পারেননি যে সমাধানের প্রচেষ্টাই হল সমস্ত সমস্যার জন্য দায়ী।

- *আমরা যে নেশার সামগ্রী দিয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছি, এবার তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। সাফল্য, মোক্ষলাভের অনুসন্ধান, বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক – এসব হল আমাদের নেশার যোগান, কিন্তু আজকাল আমি যাদের চিনি তাদের অনেককেই দেখি, তারা স্নায়বিক অবসাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমনকী কিছু জোড়া লাগানোর জিনিস আছে, যা আমাদের ভেঙে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে আমাদের ধরে রাখতে পারবে?*

কি আর হবে যদি সব কিছু ভেঙে পড়ে? আপনি বিশৃঙ্খলাতে কেন এত ভয় পাচ্ছেন যা নাও ঘটতে পারে? আপনি কেন এত শঙ্কিত যে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে? আপনি সবসময় পরিবর্তনের কথাই শুধু বলেন, কিন্তু আপনার পরিবর্তিত হওয়ার কোনও আগ্রহ নেই। আপনার যাতে আগ্রহ তা হল, শুধু উন্নতি করার জন্য পরিবর্তন। কিন্তু এটা আপনি কখনই বুঝতে পারছেন না যে পরিবর্তন সবসময় ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তনশীল বাতাবরণের মধ্যে থেকে আপনার পরিবর্তিত হওয়ার অনিচ্ছা সেই জোড়া লাগানোর আঠা খোঁজার জন্য দায়ী। বাজারে কত শত লোক বিভিন্ন রকমের আঠা বিক্রি করে চলেছে, কিন্তু সেসব কোনওভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না...

- *আপনি কোনওরকম স্তর দেখেন না এইসব আঠার মধ্যে, ধর্ম, যৌন প্রচেষ্টা, মাদকদ্রব্যাদি; কেউ যদি এর মধ্যে কোনও একটা ব্যবহার করে, তাতে আপনার কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যারা সমাজে আছি, তাদের মন্দিরে বা মসজিদে যাওয়া ঠিক কাজ এটা সবাই মেনে নেয়। কিন্তু বেশ্যাবাড়িতে যাওয়া বা মদের আড্ডায় গিয়ে জ্বালা-জুড়ানো সমাজে সর্বসম্মতিক্রমে নিন্দাজনক কাজ।*

আপনার পক্ষে ওই সমস্ত জিনিসের প্রতি আগ্রহের মধ্যে কোনও তারতম্য নেই। কিন্তু যে সমাজে আজ আমরা বাস করি তা কোনও কোনও কাজকে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং অন্য সকল কাজকে অসামাজিক বা সমাজবিরোধী কাজ বলে মনে করে। আপনি হয়তো নিজেকে সমাজবিরোধী বা বিপ্লবী বলে অভিহিত করে এ সমাজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আপনি নিশ্চয়ই অন্য একটা সামাজিক কাঠামো তৈরি করবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় হল কি জানেন, আপাতত

যেখানে আবদ্ধ হয়ে আছেন তার থেকে আপনার নতুন সমাজ খুব একটা ভিন্ন ধরনের হবে না। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব বলে কোনও কিছু নেই। যাকে আপনি বিপ্লব বলবেন, তা শুধু আপনার মূল্যবোধকে নতুনভাবে রূপায়ণ করবে। মূল সমস্যা হল আপনার নিজেকে এই কাঠামোতে মানিয়ে নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই আপনি অন্য আর একটা কাঠামো সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। নতুন চিন্তাভাবনা করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ মূলগত দিক দিয়ে এ দু'য়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

- *যৌন প্রক্রিয়ার সময় সেই অনন্তের সঙ্গে এক হওয়ার অভিজ্ঞতার এক সম্ভাবনা থাকে। হয়তো সেই কারণেই যৌনতা আমাদের জীবনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করে আছে...*

পুরুষ এবং স্ত্রী একসঙ্গে অভিজ্ঞতার চরমে পৌঁছতে পারবে এই ধারণা ভুল, কারণ আপনি কোনওভাবেই সেই অবস্থার সৃষ্টি করতে পারবেন না, যেখানে দু'জনে একাত্মতার মুহূর্তে পৌঁছাতে পারবেন। হয়তো পশুপাখি এটা করতে পারে কারণ এদের কোনও প্রাক-যৌন অনুরাগের প্রয়োজন হয় না। তা এ যৌনতা হোক বা ভগবান হোক, একবার যখন এরসঙ্গে আপনি আবদ্ধ হয়ে আছেন তখন এখান থেকে বেরোবার কোনও পথ নেই। আর এই কারণেই 'তান্ত্রিক যৌন মিলনের' সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। একথা হয়তো আপনার কাছে অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক বলে মনে হবে। কিন্তু এসব থেকে মুক্ত হওয়ার কোনও পথ নেই। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সব কিছু ধ্বংস হতে হবে। জীবন ও মৃত্যু হল এক সমকালীন প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়া দু'টো ভিন্ন বস্তুতে বিভক্ত করার কোনও উপায় নেই।

- *সুতরাং আমি এই লোকটা যাঁর নাম ইউ জী এবং তিনি যা বলছেন তার সাহায্যে এবং তাকে প্রয়োগ করে কোনও কিছুকে চিরস্থায়ী করার কাজে লাগাতে পারব না?*

আপনার পক্ষে চিরস্থায়িতার দাবি করাটা এক অযৌক্তিক জিনিস যখন চিরস্থায়ী বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। ধার্মিক লোকেরা বাজারে শুধু হাবিজাবি জিনিস বিক্রি করে চলেছে, আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করে চলেছে যে আপনার চাহিদা পূরণের পথ তাঁদের কাছে আছে। যদিও জীবনের সব কিছু অনিত্য এই দর্শনের কথা তাঁরা বলেন, অথচ সবসময় তাঁরা এই ইঙ্গিত দেন যে চিরস্থায়ী হবার এক

উপায় আছে। প্রকৃতিতে কোনও কিছু চিরস্থায়ী নয়।

- *ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি নিয়ে লেখা সহজ ব্যাপার, এই ধারণা নিয়ে আলোচনা করা এক জিনিস, কিন্তু যখন মানুষ তার অস্তিত্বের বিলুপ্তির মুখোমুখি হয়...*

সে এই সত্যের সামনা-সামনি হতে তৈরি নয় যে একদিন সব শেষ হয়ে যাবে। জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আপনার শরীর যে আপনার অধিকারভুক্ত যা আপনি সত্যি বলে ধরে নিয়েছেন, সেই শরীর আপনার কাছে কোনওরকমের চিরস্থায়িতা কখনই দাবি করছে না, কোনও একভাবে এ চিরস্থায়ী। আপনি যাকে মৃত্যু বলেন, তা হল পুনরায় ব্যবহারের প্রক্রিয়া মাত্র এবং এটাই হল একমাত্র উপায় যার দ্বারা প্রকৃতি তার শক্তির সমতা বজায় রাখতে পারে...

- *সুতরাং জীবনের ধারাকে বজায় রাখার জন্য মৃত্যু অপরিহার্য...*

আপনি যে অর্থে জীবনের ধারা মনে করছেন সেই অর্থে নয়। আমরা জানতে পেরেছি যে জীবনের কাল ফুরিয়ে একদিন অন্ত এসে যায় এবং সেই কারণে আমরা 'পরবর্তী জীবন'-এর উদ্ভাবন করেছি যাকে 'জন্মান্তরবাদ' বলি।

- *সুতরাং প্রথমে আপনি স্বপ্ন দেখেন, তারপর আপনি মারা যান এবং জীবনটা মনে হয় যেন এক দীর্ঘ পরিশ্রান্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া।*

কোনও পরিশ্রম নেই...

- *আমাদের কাছে মনে হয় জীবন পরিশ্রান্ত হয়ে যাওয়ার এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া মাত্র...*

যেহেতু আপনি এক লক্ষ্যের স্থাপন করেছেন, সেহেতু আপনি সবসময় যা করছেন তা হল সেই অভীষ্ট লক্ষ্য সাধন করার চেষ্টা, যদিও প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য বলে সেখানে কিছুই নেই।

- *এই সমস্ত আলোচনার কোনও সারাংশ করা কি সম্ভব নয় – কোনও শেষ কথা?*

আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম, তার সংক্ষিপ্তসার লেখার কোনও পথ নেই।

তৃতীয় খণ্ড

মৃত্যুর স্বাদ

সুইজারল্যান্ডের গেস্টাডে ইউ জী-র সঙ্গে তিরিশ দিন

১৯৯৫ – গ্রীষ্মকাল

১০ জুলাই ... প্রথম দিন

জুরিখে এখন গরম, ভীষণ গরম! (বহু বছরের ইতিহাসে ইউরোপ এরকম অসহ্য গরমের প্রকোপে পড়েনি)। ইউ জী আমাকে রিসিভ করতে বিমানবন্দরে এসেছেন সুষমার সঙ্গে (ফরাসি এই ভদ্রমহিলা পেশায় ফার্মাসিস্ট, আগে রজনীশ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন)। আমরা গাড়িতে করে হোটেলে পৌঁছে গেলাম; এ হোটেলটা শহরের সমস্যাজর্জরিত এলাকায় অবস্থিত, দুটো কামসংক্রান্ত মনোরঞ্জনের দোকানের ঠিক মাঝখানে। আমরা নিরামিষ রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করলাম। এখানে তৈরি খাদ্য ওজনে বিক্রি হয়। সন্ধ্যায় 'গরজিয়াস' লিসাকে সঙ্গে নিয়ে মারিও এসে উপস্থিত হলেন। মারিও এবং লিসা এই কিছুদিন আগেও রজনীশ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ''মিউনিখের মেলায় আমি না পারলাম লক্ষ্মীর মূর্তি বিক্রি করতে, না পারলাম বুদ্ধের মূর্তি বিক্রি করতে।'' পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই মারিও আক্ষেপের সুরে একথা জানালেন। তার কথা শুনে ইউ জী হেসে উঠলেন।

আমরা খুব ভোরে গেস্টাডের অভিমুখে রওনা দেব। ''মহেশ কর্মনেশাগ্রস্ত'' ইউ জী সবসময় বলেন, ''কী করে তিনি একমাস গেস্টাডে টিকে থাকবেন কে জানে? কাজ ছাড়া মহেশ নিরুদ্দেশ!'' মনে মনে ভাবলাম, 'আমাকে কর্মনেশার উপর একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে।' সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গির্জার ঘণ্টা শুনে হঠাৎ মনে হল, এখন ভারতে কটা বাজল! জুরিখের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আবিষ্কার করলাম, আমার নজর উগ্র সুন্দরীদের থেকে বাচ্চাদের এবং প্যারামবুলেটারে চড়া শিশুদের দিকে অপেক্ষাকৃত বেশি করে আকৃষ্ট হচ্ছে। বিস্ময় লাগল নিজের এরকম আচরণের কথা ভেবে। তাহলে কি আমি মধ্য বয়সের সংকটের কবলে পড়েছি! ছেচল্লিশ বছর বয়সের লোকের কাছ থেকে আর কি বা আশা করা যেতে পারে?

বারবনিতাদের ঝগড়ার আওয়াজ রাস্তার মোটর গাড়ির অ্যালার্মের আওয়াজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে। আমি সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে থাকলাম। অবশেষে ঘুমের কোলে হারিয়ে যেতে যেতে ইউ জী–র সেই কথা আমার মাথায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, ‘‘আপনি যদি নিজেকে না বলেন যে কোথায় আছেন, তাহলে কি করে জানবেন যে জুরিখে আছেন?’’ আমি যদি নিজেকে না বলি যে এই আমি বিছানায় শুয়ে আছি, তাহলে কি করে জানবো যে এটা আমি?

১১ জুলাই ... দ্বিতীয় দিন

ভোরবেলায় হোটেল থেকে বিদায় নিতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম আমাদের হিসেব মেটাবার জন্য আমন্ত্রণ কক্ষে কেউ নেই। অবশেষে তখনও নেশার ঘোর কাটেনি নিম্নশ্রেণির একজন অত্যন্ত স্থূলকায় কর্মচারি আমাদের হিসাব–নিকাশ মেটাবার কাজে সাহায্য করলেন। তাপমুক্ত ভোরের পরিত্যক্ত অপরিষ্কার জুরিখের রাস্তায় বেরিয়ে আসতে আসতে ইউ জী বললেন, ‘‘একজন নিম্নশ্রেণির কর্মচারি হিসেবে রিসেপশনিস্টের কাজটা কিন্তু উনি মন্দ করেননি।’’ নতুন ভোরের আলোয় জুরিখ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। এই শহরের নীল রং–এর ট্রামগাড়ি আমার শৈশবকালে দেখা মুম্বই–এর লাল রং–এর ট্রামগাড়ির কথা মনে করিয়ে দিল।

আমরা সুষমার গাড়িতে এগিয়ে চলেছি। সুষমার গাড়ির রেঞ্জ রেকর্ডে চলা বিটলসের একটা পুরানো গান, ‘‘আমাকে ভালোবাসা কিনে দিতে পারবে না ...’’ শুনে ইউ জী মন্তব্য করলেন, ‘‘এমন কোনও কিছু নেই যা টাকা দিয়ে কেনা যায় না ... তাদের নিজেদের জীবনের কথাই ভাবুন। নিজেরা পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা টিকিয়ে রাখতে পারল না, অবশেষে নিজেদের দল ভেঙে গেল, ভালোবাসার গান গেয়ে টাকা রোজগার করাটাই তাঁদের একমাত্র কৃতিত্ব ...।’’

সত্যবচন ঃ ‘ভালোবাসা’ কথা ছাড়া সংগীত জগৎটা পুরো ভেঙে যাবে! প্রেম সংগীত ছাড়া একটা জগতের কথা চিন্তা করা যায়? আমাদের মতো সিনেমার জগতের লোকেরা, সংগীতের জগতের লোকেরা সবাই বেকার হয়ে যাবে।

গতকাল আমার স্ত্রী সোনি আমাকে টেলিফোনে কি বলেছিল সে কথা মনে পড়ল, ‘‘মহেশ, তোমার সঙ্গে আমি রোজ রোজ এতক্ষণ ধরে ফোনে এভাবে কথা বলতে পারব না, প্রচুর খরচ! তুমি বরঞ্চ আমায় ফোন কোর।’’ ভেতরে ভেতরে একটু আঘাত লেগেছিল, কিন্তু আমি এসবের ঊর্ধ্বে এমন একটা ভাব দেখিয়ে

বলেছিলাম, ''ঠিক আছে, বুঝেছি।'' কথাবার্তা শেষ হবার ঠিক আগে বলেছিল, ''আগেরবারের মতো যত টাকা আছে সব যেন খরচ করে বোস না।'' এরপর তাড়াহুড়ো করে ফোন রাখতে রাখতে বলেছিল, ''আই লাভ ইউ।''

আমরা বার্ন থেকে এখনও ঊনচল্লিশ কিলোমিটার দূরে। গাড়ির টেপ রেকর্ডার থেকে মহিলার কামার্ত স্বরে গান ভেসে আসছে! আমি সামনের দুটো সিটের মাঝখান দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ''ইউ জী, আপনি গান-বাজনা পছন্দ করেন?'' ''আমি কুকুরের গর্জন, শূকরের ঘোঁতঘোতানি এবং ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি অপেক্ষাকৃত বেশি পছন্দ করি। কারণ এগুলি মধ্যে প্রাণের সাড়া আছে, একটা শক্তি আছে ... গান শোনা একটি নকল ইন্দ্রিয় সুখ ...।''

'এমনকী ভজন বা বেদপাঠ?' আমি উলটে প্রশ্ন করলাম। ''হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবকিছু, প্রকৃতপক্ষে আপনাদের ভগবান হল মনের তৈরি সর্বোচ্চ ইন্দ্রিয় সুখকর জিনিস...।'' অনেক দূরে, দেখলাম ভোরের সূর্যের কমলা আভা সবুজ মাঠের প্রতিটি দূর্বাপত্রে ঝকঝক করছে।

সকাল সাতটায় বার্নে পৌঁছলাম। শহরে ঢুকতে না ঢুকতেই টের পেলাম ট্রাফিক জ্যাম। ইউ জী বলে উঠলেন, ''পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ একই ধরনের। এই যে দেখছেন আমাদের সামনের গাড়িতে সুইজারল্যান্ডবাসী গাড়িচালক, তিনি ঠিক বোম্বের বা মাদ্রাজের জ্যামে পড়া ড্রাইভারদের মতনই বিরক্ত হয়ে গালাগালি করছেন।''

গেস্টাড

''টাকার সঙ্গে আপনার যে সম্পর্ক সেটাই সব কিছু প্রমাণ করে। যখন ভ্যালেন্টাইন মারা যান আমি চন্দ্রশেখরকে বলেছিলাম, ভ্যালেনটাইনের দাঁতের ভেতর সোনা আছে, মৃতদেহ দাহ করার আগে সোনাটা যেন বের করে নেওয়া হয়। আপনি কি জানেন যে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা কুড়ি মিলিয়ন ডলার (প্রায় একশো কোটি টাকা) ক্ষতিপূরণ দিয়েছে এবং তার কারণ হল বিভিন্ন গির্জার পাদ্রীদের নামে অল্পবয়সের ছেলেদের ধর্ষণ করার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে বলে।''

''বম্বেতে বস্তিবাসীদের দুর্দশার জন্য আপনি ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে দায়ী। আপনার এবং আমার মতো লোকজনের জন্য পঁচাত্তরভাগ বম্বেবাসী এরকম নিম্নমানের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।''

আমার অন্তরে কি যেন একটা জানান দিচ্ছে, ইউ জী–র সঙ্গে এই গ্রীষ্মকালটা অসহ্য উত্তাপের মধ্যেই কাটবে। প্রদীপ নেভার আগে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে। এই প্রবাদবাক্যই কি গুণীজনেরা বলে থাকেন?

সান্ধ্যভোজনে আমার এবং ইউ জী–র আলোচনার সঙ্গে যোগ দিলেন মারিসা, একজন ইতালিয়ান ভাস্কর, বোডিল, একজন সুইস চিত্রকর এবং অধ্যাপক গডফ্রিড মায়ার, একজন বিখ্যাত জার্মান পেইন্টার। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল, আমার পরবর্তী সিনেমা, 'একজন বার্ধ্যক্যে উপনীত নায়িকা।'

''মহেশ, রেখা হলেন এই ভূমিকার জন্য সঠিক নায়িকা। বর্তমানে তিনি নিজের জীবনে এইসব সমস্যার মুখোমুখি। এই ছবির মধ্যে সেই সমস্যার জীবন্ত রূপের স্নায়ুস্পন্দন দেখা যেতে পারে।'' ইউ জী ঘোষণা করলেন।

নারীর সৌন্দর্য্য এবং শক্তির মধ্যে কি সম্পর্ক, এস্ট্রোজেন চিকিৎসা এবং মানুষের চিরস্থকীয়তার খোঁজ ... হল আজকের নৈশভোজনের আলোচনার বিষয়বস্তু। ''মানুষের বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ – পরাজয়ের যুদ্ধ।'' আমাদের দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্ত শেষ কথা জানালেন ইউ জী।

''শিল্প কলার জন্ম হয়েছে হতাশা থেকে। সমস্ত কিছু সৃষ্টি হয়েছে হতাশা থেকে।'' ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, বুঝতে পারলাম জেটল্যাগের কবলে পড়েছি।

১২ জুলাই ... তৃতীয় দিন

নিচের উপত্যকায় টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। গেস্টাডে এখন ভীষণ ভিড়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্রীড়ামোদীরা খেলা দেখতে এসেছেন।

এই মুহূর্তে গেস্টাডে ঘর ভাড়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এরই মধ্যে পার্শ্ববর্তী সানেন গির্জায় বেহালাবাদক য়েহুদি মেনুইনের বেশ কয়েকটি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে।

আজ সকালে আমার জন্য দ্বিতীয়বার কফি তৈরি করতে করতে ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি তাঁর বাল্যকালে কোনও এক ট্রেন স্টেশনে কি ঘটনা ঘটেছিল সেই অদ্ভুত কাহিনীর বিবরণ দিলেনঃ ইউ জী সবেমাত্র এক বিলাসবহুল প্রথম শ্রেণির কম্পার্টমেন্ট থেকে মাদ্রাজ স্টেশনে অবতরণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দাদুর সঙ্গে, যিনি ভিড় ঠেলে একই ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির এক সাধারণ কম্পার্টমেন্ট থেকে অবতরণ করলেন। নাতির এরকম বিলাসবহুল কম্পার্টমেন্ট থেকে নামার দৃশ্য

দেখে বৃদ্ধ মাতামহ ভয়ানক রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘তুমি কি করে এসব করছ? আমরা রক্ত-ঘাম এক করে পয়সা বাঁচাবার চেষ্টা করছি, যাতে ভবিষ্যতে তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পার, আর তুমি এখন থেকেই পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছ!'' ভাবতে পারবেন না ইউ জী সেদিন কি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘‘ভবিষ্যতের জন্য আর অপেক্ষা করা কেন? আপনি আজ নিজের চোখেই দেখলেন, আপনার কষ্টার্জিত অর্থে আমি কেমন স্বস্তিতে জীবনযাপন করছি। এটাই তো আপনি চান, তাই না!''

আমি হাঁটতে হাঁটতে সানেন উপত্যকার এক হোটেলের দিকে এগোলাম। অজয় দেবগণের সঙ্গে দেখা করতে হবে। যে ছবিতে বর্তমানে সে অভিনয় করছে, তার শুটিং চলছে সুইজারল্যান্ডে। যাওয়ার পথে এক ভারতীয় সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি তাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। তার নাম টুইঙ্কল, ডিম্পলের মেয়ে। তাড়াহুড়ো করে গেস্টাডে যাচ্ছেন শেষ মিনিটের বাজার সারতে। ফিল্ম প্রোডাকশনের যে অংশটার সঙ্গে তিনি জড়িত, তাঁরা আজ সন্ধ্যায় ভারতে ফিরে যাচ্ছেন। অজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার খুব ভালো হয়েছে বলে মনে হল। এই যুবকটিকে আমার খুব ভালো লাগে, তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্টপূর্ণ আকর্ষণ আছে। ফেরবার পথে দেখা সরোজ খানের সঙ্গে। বলিউডের বিখ্যাত কোরিওগ্রাফার। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি আমার কাছে নিজের ছেলে রাজুর সম্পর্কে অনেক রকমের অভিযোগ জানালেন এবং এর প্রধান কারণ হল রাজু আমার প্রিয় কোরিওগ্রাফার। ‘‘আপনি শুধু আমার ছেলের সঙ্গেই কাজ করেন। আমি কি খারাপ? আমার সঙ্গে কেন কাজ করেন না? আমাকে অন্তত একটা ছবিতে কাজ করতে দিন।'' এক নিঃশ্বাসে সরোজ খান আমাকে এসব কথা শোনালেন। এটা একটা জীবন্ত সত্য কাহিনি, মা তার ছেলের মুখের খাবার ছিনিয়ে নিতে চাইছে। এই হল মনোরঞ্জনের ব্যাবসা।

আমি ‘টেনডার মারসিস'-র কথোপকথন পড়ছি, এই ছবিতে অভিনয় করে রবার্ট ডুভাল প্রথম একাদেমি পুরস্কার পান। এছাড়াও এ ছবিটা শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য হিসাবে একাদেমি পুরস্কার পায়। এই ছবির একটি সংলাপ আমার খুব মনে ধরেছে, ‘‘আমি সুখি হওয়াটা অবিশ্বাস করি।'' এই ছবিটায় জীবনের যথার্থতা সম্পর্কিত চরম পরিণতি খুবই কার্যকরী। যদিও ভারতীয় ছবির তুলনায় খুবই মৃদু

ধরনের। কখনও কখনও কমই বেশি কার্যকরী।

১৩ জুলাই ... চতুর্থ দিন

আজ সকালে ইউ জী বললেন, একটা ফুল কোনও ধর্মকথা শোনায় না। ‘‘আপনার রেখাকে নিয়ে প্রবীণ অভিনেত্রীর গল্প – ভালো কাজ হবে বলে আমি নিশ্চিত। আপনার গল্পে সবাই যা চায় তাই প্রতিফলিত হবে। এই ভূমিকার জন্যই হয়তো সবাই তাঁকে মনে রাখবে। মনোরঞ্জনের ব্যাবসা থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কোনওরকম হইচই না করাটাই বাঞ্ছনীয়। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নিজেকে এসবের বাইরে এনে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।’’

বার্ধ্যক্যে উপনীত অভিনেত্রী সম্পর্কে আরও কিছু ধারণা ...

এই ছবির শেষ দৃশ্যটা হবে এরকম, নায়িকা ধীরে ধীরে নায়কের কাছে এসে, নিজের মুখের সামনে আয়না তুলে ধরার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাবে। এরপর একদম শেষের চূড়ান্ত দৃশ্যে থাকবে নায়িকা কোনওরকম সাজসজ্জা, যা ছিল এতদিনের নিজেকে ঢাকার ঢাল–তলোয়ার, ছাড়াই জগতের মাঝে চলতে শুরু করবেন। প্রভাতের আলোয় দর্শকরা আবিষ্কার করবেন তার চিরন্তন সৌন্দর্য্য। এই অবস্থায় তার মুখটা অত্যন্ত কাছ থেকে পরদায় তুলে ধরতে হবে। চিত্র স্থির হয়ে যাবে, আর পশ্চাৎপট থেকে শোনা যাবে নায়কের উক্তি, ‘‘তুমি সত্যিই সৌন্দর্যের প্রতীক...।’’

নৈশভোজনের সময় বেশিরভাগ লোক যে যার ঘরে ফিরে যাবার পর, আমি, গডফ্রিড, বোভিল এবং মারিসা, ইউ জী এবং মৃত্যু নিয়ে অনেক আলোচনা করলাম। যথারীতি আমাদের আলোচনা আবার এসে দাঁড়াল সেই বিষয়বস্তুর উপর ‘বার্ধক্যে পদক্ষেপ।’ মারিসা বললেন, তার এক বান্ধবী বহুবছর ধরে নানারকমের সাজসজ্জা করে নিজের রূপকে চিরস্থায়ী করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ একদিন সবকিছু ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে বিউটি পার্লারে এসে বন্ধুদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘‘আমার এই নতুন রূপটা তোমাদের কেমন লাগছে।’’ মনে হল, এটাও একটা ফিল্মের ভালো দৃশ্য হতে পারে।

বোভিল সুইস পেইন্টার। আমাকে উপদেশ দিলেন যে, শেষ দৃশ্যটা এরকম হওয়া দরকার – নায়িকা ধীরে ধীরে এক–একটা সাজসজ্জার সরঞ্জাম ফেলে দিতে লাগলেন এবং সবশেষে সূর্যাস্তের দিকে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললেন ...।

মারিসার সাহস এবং রসিকতা আমার খুব ভালো লাগল। আমার ছবিতে তার মতন এক চরিত্রের আবির্ভাব ঘটাতে হবে এবং নায়িকার চরিত্রের বিপরীতে ভালো কাজ করবে।

গডফ্রিড আমাকে জানালেন যে, পাশ্চাত্যে সাজগোজের ব্যাপারটা শুধু জীবিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এমনকী মৃতদেহকেও ভালোভাবে সাজানো হয়। অল্প বয়সের চেহারা বজায় রাখার প্রবণতা এমন একটা বদ্ধমূল ধারণায় রূপান্তরিত হয়েছে যার পরিণতি অবিশ্বাস্য। মারিসা বললেন, সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হল, মানুষ মরে যাওয়ার পরে তাকে অত্যন্ত ঠান্ডা ঘরে জমাট করে রাখাটা যুক্তিযুক্ত মনে করে, কারণ যে রোগে তার মৃত্যু ঘটেছে তার চিকিৎসা আবিষ্কার হলে হয়তো তাকে পুনর্জীবিত করে তোলা সম্ভবপর হবে। অথচ যন্ত্র দিয়ে কোনওরকমে বাঁচিয়ে রাখা কোনও ব্যক্তি যদি যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যন্ত্র বন্ধ করে দিতে চায় তাহলে তাকে আততায়ী বলে অভিহিত করা হয়।

আজ পূর্ণিমার রাত। বজ্র এবং বিদ্যুৎ ঘরের মধ্যে শব্দ এবং আলোর এক নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি করল। ইউ জী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তিনি তাঁর শয়নকক্ষে যাবার আগে বলেছিলেন, ‘‘শুভরাত্রি! যদি কাল সকাল অবধি বেঁচে থাকি, তাহলে আবার দেখা হবে।’’ রাত্রি গভীর হওয়ার আগে সব বন্ধুরা যে যার ঘরে ফিরে গেছেন, আমি ধীরে ধীরে আবিষ্কার করলাম, এই গৃহের স্তব্ধতা নিদারুণ অস্বস্তিকর।

১৪ জুলাই ... পঞ্চম দিন

ইউ জী বললেন যে নায়িকা ক্রমশ বাইরের জগতে সাধারণ মানুষের মুখের সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে শুরু করবে। বিশেষ করে ভারতের রাস্তায় এবং বস্তিতে বাস করা উপেক্ষিত মানুষের মুখের সৌন্দর্যের মধ্যে। একথা এখনও সবাইকে জানানো হয়নি যে আমার ‘অর্থ’ ছবির শেষ দৃশ্যটি, যেখানে নায়িকা তার স্বামী এবং তার প্রেমিক দু’জনকেই প্রত্যাখ্যান করেন এবং জীবনের পথে একলা চলতে শুরু করেন, প্রকৃতপক্ষে এটা ইউ জী-র নিজস্ব ভাবনার পরিণতি। ইউ জী আমাকে জোর দিয়ে এই দৃশ্য উপস্থাপিত করতে বলেছিলেন, যদিও সমস্ত চিত্র বিশেষজ্ঞরা এবং উপদেষ্টারা আমাকে বলেছিলেন যে, বক্স অফিসে এই ছবি শুধু শেষ দৃশ্যের জন্যই ফ্লপ হতে বাধ্য। এখন অবশ্য এই ঘটনাটা ইতিহাস হয়ে গেছে। ছবির শেষ দৃশ্যটি

ছিল এই ছবির সাফল্যের কারণ।

“প্রসাধনী শিল্প, বিউটিশিয়ান, ফ্যাশন ডিজাইনার এবং পোশাক–পরিচ্ছদ উৎপাদক শিল্প, সবাই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে যদি তাদেরকে আপনি আপনার ছবিতে খলনায়ক বলে চিহ্নিত করেন।” ঘোষণা করলেন ইউ জী। ইউ জী কি বলতে চান সেটা ধীরে ধীরে আমার কাছে পরিষ্কার রূপ ধারণ করতে লাগল। আপনি যদি সারাজীবন যৌবন ধরে রাখার প্রচেষ্টা বন্ধ করে হাল ছেড়ে দেন এবং যারা আপনাকে এ ব্যাপারে নানারকমের সাহায্য করতে অধীর, তাদের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেন, তাহলে আপনার উপর তাদের আর কোনও অধিকার থাকবে না, তাদের ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

পড়ন্তবেলায় যখন সবাই স্বাভাবিকভাবে ইউ জী–র কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন, তখন একজন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার ওহাইতে থাকেন, আমার পুরানো বন্ধু স্কটী স্কট। তারসঙ্গে বহু বছর পর দেখা হল। মনে হল তিনি ভীষণ দুঃখী। স্কট চলে যাওয়ার পর আমি ইউ জী–র পাশে বসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্কটের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে, তাঁর এ ব্যাপারে কি মনে হয়, স্কটের অসুবিধাটা কি? তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন অসুস্থ।

এই আমেরিকান ভদ্রলোক অত্যন্ত বিকারগ্রস্ত এবং ভীত–সন্ত্রস্ত। এই ভদ্রলোক হঠাৎ করে নুনছাড়া খাদ্য খাওয়া শুরু করেছেন। ক্রনিক ফ্যাটিগ সিনড্রোম (দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তির লক্ষণ) নামের রোগে নাকি ভুগছেন। মানুষের দেহে লবণের ভীষণ প্রয়োজন আছে। এইসব চিকিৎসকরা এবং পথ্যবিশেষজ্ঞরা আপনাদের নিয়মিত প্রতারণা করছেন। হঠাৎ একদিন তারা বললেন যে কোলেস্টেরল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত হানিকারক। এসব কথা লোকজনদের কাছে পৌঁছতে না পৌঁছতেই কয়েক বছরের মধ্যে তারা মত পালটে বললেন, শরীরের জন্য কোলেস্টেরলের প্রয়োজন আছে। আপনি রোজ সকালবেলা আমাকে প্রাতঃরাশ করতে দেখেছেন, তাই না? আমি কফির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘন দুধ (এখানে বলে ক্রিম) খাই। আমার এখন সাতাত্তর বছর বয়স এবং আমার মধ্যে কোনওরকমের গন্ডগোল নেই। যে সমস্ত ডাক্তাররা আমায় সবসময় চেতাবনি দিতেন, ক্রিম স্পর্শ করা আপনার অনুচিত, হার্টের পক্ষে খুব খারাপ, তারা সব মরে ভূত হয়ে গেছেন। আর আমি মনের আনন্দে সুস্থ শরীরে সারা পৃথিবী চরে বেড়াচ্ছি।

এবার গরমের ছুটিতে ইউ জী-র মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছি। তিনি আমাদের সংস্কৃতির প্রতিটি দুর্গ যা আমরা সযত্নে নিজেদের মধ্যে লালন-পালন করি তা যেন ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছেন, সে তা যতই মহান হোক না কেন।

রাতে ইউ জী সেই তিনজন বারবনিতার গল্প শোনালেন, যাদের সঙ্গে টোকিওতে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। প্রথম জন ভগবান রজনীশের ভক্ত, দ্বিতীয় জন জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির জন্য পাগল এবং তৃতীয় জন বুব্বা ফ্রি জনের শিষ্য। এই মহিলারা তাদের খদ্দেরদের কাছ থেকে একরাতের জন্য ছশো ডলার দাবি করেন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কীভাবে আপনারা এত টাকা পান, উত্তরে জানালেন যে সহবাসের আগে এবং পরে তারা ধর্ম, দিব্যজ্ঞান এবং অতীন্দ্রিয়তা সম্পর্কে খদ্দেরদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এইসব আলোচনা করতে পারার জন্য বাজারে তাদের এত মূল্য। সিসিল বি ডিমেল নামে একজন বিখ্যাত মার্কিন চিত্র পরিচালক বলেন, ‘‘ধর্ম এবং যৌনতার যুগপৎ পরিবেশন বক্স অফিসে প্রায় সবসময় সফল হয়।’’

১৫ জুলাই ... ষষ্ঠ দিন

‘‘দুঃখ এক অদ্ভুত আঠাল জিনিস, সবকিছু জোড়া লাগিয়ে রাখে। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য যত রকমের কলা, ধর্ম এবং উৎসাহব্যঞ্জক রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে সেসবের সৃষ্টি হয়েছে হতাশার মধ্য দিয়ে, কারণ জীবনের গতিবিধির মধ্যে কোনওরকমের অর্থ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব বলে।’’ ঘোষণা করলেন ইউ জী। আজ সকালে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন যেন দিনের আলোয় নির্মল আকাশের বুকে প্লেনে করে অনেক উপরে উঠে যাওয়ার মতন। অসীম আকাশ আজ আমার মনে আর কোনও ভীতি সঞ্চার করল না।

আমি গটফ্রিড মায়ার, যিনি একসময়ে দক্ষিণ জার্মানির এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পেইন্টিং শেখাতেন, তাছাড়া ধাতুর উপর খোদাই করার শিল্প (এচিং) এবং স্থাপত্য বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘আপনাকে যদি সমস্ত পেইন্টিং এবং স্থাপত্য বিদ্যার শিক্ষাকে এক শব্দে প্রকাশ করতে বলা হয়, তাহলে আপনার মতে সেটা কি হবে?’’ গটফ্রিড দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিলেন, ‘‘অনুধাবন..., জীবনকে অনুধাবন করা, প্রকৃতিকে অনুধাবন করা

...।'' ইউ জী একথা শুনে মন্তব্য করলেন, ''আপনি আপনার সমাজ এবং সংস্কৃতিলব্ধ ধ্যান–ধারণার রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে বা পরদার আড়াল থেকেই সমস্ত কিছু অনুধাবন করেন। একজন প্রকৃত শিল্পী একথা গভীরভাবে জানেন যে প্রকৃতি যেভাবে বিদ্যমান তার সঙ্গে শিল্পীর প্রকৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত ভাবনা–চিন্তা, যার জন্য শিল্প জগৎ, কলা জগৎ গর্বিত, সেসবের মধ্যে অনেক তারতম্য আছে এবং আমি জানি যে আমার কথা আপনি এবং আপনার জগতের লোকজনরা কিছুতেই মানতে পারবেন না। আপনাদের সেসব কথা শুনতে ভালো লাগে এবং তৃপ্ত হন, যা আপনারা শুনতে চান।'' ইউ জী এবার নিজের কাজে অন্যদিকে চলে গেলেন। আমরা আবার আলোচনায় ফিরে এলাম।

সন্ধ্যাবেলা স্কট এখানে এলেন এবং আমরা দু'জনে নিচের একটা রেস্টুরেন্টে এসে বসলাম। তিনি এক কাপ কফি নিয়ে বসলেন এবং আমি নিলাম এক কাপ দার্জিলিং চা। স্কট আমার সঙ্গে হৃদয় উন্মোচন করে তার জীবনের কথা বলা শুরু করলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক যুবকের অবৈধ সম্পর্ক সম্বন্ধে কথা শুরু হল। গত আট বছর ধরে সেই যুবকের সঙ্গে তার স্ত্রীর এই সম্পর্ক তাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তিনি সেসব যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে এবং স্ত্রীকে ঠিক আগের মতোই ভালোবাসেন। তিনি খুব গর্বের সঙ্গেই বললেন যে তিনি দশ কোটিতে একজন যে তাঁর পত্নীকে কোনওরকম অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে না ফেলে পত্নীর ইচ্ছামতো কাজ করতে অনুমতি দেন। তিনি এই তিনমুখী সম্পর্কের সমস্ত রকমের ব্যবস্থাগুলো বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এরপর আরও বললেন যে, এ সমস্ত বন্দোবস্ত তাঁর কাছে রীতিমতো যৌন উত্তেজনাময়। তার এসব কথা শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে গেল আমার জীবনের প্রেম সম্পর্কিত অতীতের কথা। আমার প্রেমিকাকে যখন আর একজন চেয়েছিলেন, মনে পড়ছে তখন আমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল। হে ভগবান, আমাদের এইসব সম্পর্কগুলো কি অসাধারণ জটিল ব্যাপার!

রাতে ইউ জী আরেক তিনমুখী সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলেন – জে কৃষ্ণমূর্তি, রোজালিন্ড রাজাগোপাল এবং রাজাগোপাল ... 'রাজাগোপাল তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে জে কৃষ্ণমূর্তির অবৈধ সম্পর্ক না দেখার ভান করে থাকার একমাত্র কারণ হল প্রচুর টাকাপয়সা এবং অগাধ সম্পত্তির সঙ্গে তারা সকলেই জড়িত ছিলেন বলে। এই

নাটকীয় সম্পর্কে তার নিম্নমানের অবস্থান স্বেচ্ছাকৃত। মনের ভেতর থেকে এ সমস্ত লোকদের কখনই ক্ষমা করবেন না। এইসব লোকজন নিজেদেরকে এমনভাবে উপস্থাপিত করেন যেন তাঁরা আমাদের মত সাধারণ নশ্বর লোকদের তুলনায় অত্যন্ত মহান, প্রকৃতপক্ষে তারা আর পাঁচজনের মতন অথবা আরও হীন প্রকৃতির ...।'

১৬ জুলাই ... সপ্তম দিন

''মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যৌথ মালিকানা বলে কিছু থাকা সম্ভব নয়।'' এই হল ইউ জী-র শেষ মন্তব্য এবং স্কটের জীবন যে তিনমুখী সম্পর্কের ভারে বিধ্বস্ত – তার সারমর্ম। ''এটাই হল তার অসুস্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। স্কটের স্ত্রী রাজি হবেন যদি স্কট আরেকজন মহিলার সঙ্গে এমন অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন? যদি রাজি না হন, তাহলে স্কটের দুঃখের জীবন কাটানোই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হল, স্কট কেন এসব দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে এত দীর্ঘদিন ধরে জীবনযাপন করছেন?'' আমারও অবশ্য একই প্রশ্ন, ''কেন?'' ''আপনি নগ্ন সত্য জানতে চান? অবচেতনভাবে স্কট তাঁর পত্নীর উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। প্রথমত, স্কটের শরীর খারাপ হয়ে গেছে, দ্বিতীয়ত, পত্নীর টাকায় প্রধানত সংসার চলে।'' এবার ব্যাপারটা একটু বোধগম্য হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় আর একটা প্রশ্ন এল, ''কিন্তু স্কটের স্ত্রীর যুবক ছেলেবন্ধু আছে, তাহলে স্কটের সঙ্গে সে সম্পর্ক শেষ করে দিচ্ছে না কেন?'' উত্তরে ইউ জী বললেন, ''স্কটের পত্নী এখনও স্কটকে ধরে রেখেছেন তার কারণ হল, তার বিশ্বাস একদিন সেই যুবক প্রেমিকটি তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।''

'' সর্বস্বান্ত হয়ে মরুন ..., বংশধরদের জন্য সম্পত্তি রাখার কথা ভুলে যান ..., যত টাকাপয়সা আছে, তার সদ্ব্যবহার করুন এখন, বেঁচে থাকতে থাকতে।'' 'ওয়ার্থ' নামে একটা মার্কিন সাময়িক পত্রিকার মলাটে বড় বড় করে উপরোক্ত লেখাটা চোখে পড়ল। অর্থনীতির উপর বুদ্ধিমান সাময়িক পত্রিকা। এই লেখাটির মূল বক্তব্য হল, যেসব লোক বংশধরদের জন্য টাকাপয়সা রাখার ব্যাপারে উদগ্রীব, সেসব লোক উন্নতমানের জীবনযাত্রার বদলে মৃত্যুর কথা বেশি চিন্তা করেন এবং ভালোভাবে মৃত্যুর বন্দোবস্ত করেন।

যতই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, ততই আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ইউ জী-র অমানুষিক শব্দবাণে আরও বিব্রত হয়ে পড়ছি। ''আপনি কি জানেন কেন

আপনি আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন যে আপনি মরে যাওয়ার পরও আমি আপনার পুত্রকন্যাদের সেইসব জমানো টাকাপয়সাগুলি দিতে থাকব? তার অর্থ হল আপনি মরে যাওয়ার পরেও সেইসব টাকার উপর আপনার অধিকার হারাতে চান না। আপনি নিজে মরে যাওয়ার পরও পুত্রকন্যাদের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে চান। আপনার শুধু এই চিরস্থায়ী হওয়াতেই আগ্রহ। আপনি আপনার কাজের মাধ্যমে, আপনার চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, আপনার মানবিক কল্যাণকর কাজকর্মের মাধ্যমে অমর হয়ে থাকতে চান – আপনার সমস্ত চিন্তাভাবনা এই ধারাবাহিকতাতেই আগ্রহী।''

আজ সপ্তম দিন এবং খুবই খারাপ দিন। ইউ জী–র কথাবার্তা আমার গহন গভীরে অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করছে। আমার ক্ষুণ্ন অভিমান লুকিয়ে রাখা মুশকিল হচ্ছে। আমি ট্রেন স্টেশন অভিমুখে এক লম্বা রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করে দিলাম। সেই সমস্ত লোকজনদের উপর আমার খুব হিংসা হচ্ছে, যারা তাদের অভ্যন্তরের কুটিল অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। মনে হল, চীৎকার করে বলি, ''হে পৃথিবী, ক্ষণিকের জন্য থেমে যাও! আমি নেমে যেতে চাই!'' আপনি যখন ইউ জী–র সঙ্গে থাকবেন, তখন কিছুতেই কোনওরকমের পূর্বাভাস পাবেন না যে কখন কোনদিক থেকে কীভাবে কেমন বাক্যবাণ এসে আপনার মর্মভেদ করে দেবে। নিজেকে মনে হল যেন ঝড়ের মুখে উড়ে যাওয়া শুষ্কপাতার মতো।

নিচের 'সুইস ওপেন টেনিস' প্রতিযোগিতা পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। লোকজন চীৎকার করে বিজয়ীদের উৎসাহ জানাচ্ছে। দর্শকদের উল্লাস আমাকে বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে এনে হাজির করল। জেগে উঠছে স্কুলের মাঠে ক্রিকেট ম্যাচের স্মৃতিকথা। পড়ন্ত বেলায় সূর্যের আলো হয়তো আমার মধ্যে সৃষ্টি করেছে এক অদ্ভুত নস্টালজিয়ার।

স্তব্ধতা সমস্ত উপত্যকাকে গ্রাস করে ফেলেছে। সন্ধ্যা যতই গভীর হচ্ছে আমি ততই খবরের কাগজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। এই কর্মপ্রচেষ্টায় মনে হচ্ছে যেন কোনও আশ্রয়স্থলে বিপদমুক্ত অবস্থায় আছি। অচিরেই বুঝলাম আমার ধারণা ভুল। ইউ জী হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে তিরস্কারের সুরে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর প্রিয় 'টাকা' সম্পর্কে বলা শুরু করলেন। অস্বস্তিতে আমি কেঁপে উঠলাম, যখন সবার

সামনে তিনি আমার মুখোশ খুলতে লাগলেন। ভাবতে অবাক লাগছে উনি কি বোঝাতে চাইছেন, তাঁর কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর আমার মনে হল, আমি হয়তো কান্নায় ভেঙে পড়ব। কেন আমি এত অত্যাচার সহ্য করছি? আমি এমনকী খুঁজছি যা এ রাস্তার শেষে দেখা যাবে! আমি এখানে কি করছি? কে এই মানুষ, যাকে আমরা ইউ জী বলি? আমি তাঁর কাছ থেকে কি চাই? কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না, একদম কোনওকিছুই না!

১৭ জুলাই ... অষ্টম দিন

ভোর ছ'টার আগেই উঠে পড়লাম। একটা অস্বস্তিকর ভয় আমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। বর্তমানে এই ঘরে ঘড়ি চলার টিক্ টিক্ শব্দটা সবচেয়ে জোরাল আওয়াজ। সাদা পরদার ওপারে নতুন ভোরের আলো আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে। আমার চারপাশে সবকিছু যেন স্পন্দনহীন। ইউ জী-র সঙ্গে বাস করা যেন হাওয়ার সঙ্গে থাকার মতন। রাত থেকে ভোরের এই সময় অবধি মনে হয় যেন পাশের ঘরে কেউ নেই।

গরম স্নানপাত্রে বসে উষ্ণ জলে ধারাস্নান করা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। যখন একজনকে ধীর স্থির হয়ে যেতে বাধ্য হতে হয়, তখন জীবনের এই ছোট ছোট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার চোখে পড়ে এবং সে এসব উপভোগ করতে পারে। ইউ জী একবার বলেছিলেন, "স্নানের আনন্দ কামনা চরিতার্থ করার মত। ধার্মিক মানুষ স্নানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেন। শরীরের উপর জল ঢালার এই সামান্য ব্যাপারটা সেইসব মানুষ ধার্মিক আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত করে। এই যে মনের মতো স্নান করার সুখানুভূতিকে আপনারা সবসময় আপনাদের সাবানের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগাচ্ছেন, এটা কি আপনার চোখে পড়ে না?" মায়ের কথা মনে পড়ল। ছোটবেলায় শিবাজী পার্কে আমাদের মধ্যবিত্ত ছোট্ট ফ্ল্যাটের স্নানঘরে মা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতেন। সেই ছবি মনের পরদায় ভেসে উঠল। যে দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে মায়ের জীবন কাটত, স্নান করাটাই হয়তো ছিল তার সাময়িক অবসর।

'সুপ্রভাত।' রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন ইউ জী। আজ একটু দেরি করে তাঁর সকাল শুরু হয়েছে। এখন প্রায় সাতটা বাজে। ইউ জী সাধারণত সকাল সোয়া ছ'টায় তাঁর প্রাতঃরাশ এবং আমার কফি তৈরি করেন। চায়ের কাপ, চামচ

এবং রান্নাঘরের আলমারির পাল্লা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ, কেটলির ধোঁয়া নির্গমনের শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মনে হল আমার অন্তরাত্মা বলছে, ‘‘তুমি কি পরবর্তী পালার জন্য তৈরি!’’ নিঃশব্দে নিজেকে বললাম, ‘‘হ্যাঁ, আমি তৈরি! আজ আমি মাথা তুলে বন্দুকের সামনে দাঁড়াব, তারপর যদি গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তাহলে তাই করব।’’

ঘণ্টাধ্বনি বাজতে না বাজতেই ইউ জী জে কৃষ্ণমূর্তিকে নিঃশেষ করে দিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি জে কৃষ্ণমূর্তিকে টুকরো টুকরো করে এক তাত্ত্বিক দার্শনিকের পর্যায়ে নিয়ে এলেন। তারপর নির্দ্বিধায় তিনি বার্টান্ড রাসেলকে প্রশংসা করতে শুরু করলেন। ‘‘বার্টান্ড রাসেলের অনেক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং প্রিয় বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গেও সহবাস করেছেন। এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আমার বলার কিছুই নেই। কারণ এ ব্যাপারে আমি কোনওরকম ভণিতা করতে চাই না। কিন্তু জে কৃষ্ণমূর্তি যা করেছেন তা অত্যন্ত ঘৃণিত। কেন তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে যৌনতার বিরুদ্ধে কথা বলতেন – নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কত কথা বলতেন? কেন তিনি যে সমস্ত আমেরিকান যুবক-যুবতীরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাদের বলতেন, ‘মহাশয়! কেন আপনারা যৌন সহবাস করতে চান? কেন শুধু তাদের হাত ধরেই আপনারা ক্ষান্ত হচ্ছেন না?’ হয়তো সেই ভণ্ড ভদ্রলোকটির অকালে বীর্যস্খলন হয়ে যেত!’’

সংক্ষিপ্ত লিপি

‘‘নিজের ছায়াকে অতিক্রম করার প্রয়াসটাই হল আপনার প্রধান সমস্যা। একটা বৃক্ষ কখনই তার ছায়াকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে না, করে কি? যতক্ষণ আপনি সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে থাকবেন, ততক্ষণ আপনার ছায়া থাকবেই। ছায়াটিকে দূর করার একমাত্র উপায় হল, নিজেকে বিলুপ্ত করে ফেলতে হবে। যখন ‘আপনি’ চলে যাবেন, তখন দুঃখ-দুদর্শাও চলে যাবে। যতক্ষণ আপনি আছেন, ততক্ষণ দুঃখ-দুর্দশাও আছে।’’

‘‘আমি আপনাকে পীড়া দিই নিজেকে পীড়ামুক্ত করার জন্য’’ – ‘দ্য রাভেন’ বলে ১৯৩৬ সালের হলিউডের একটা সিনেমার সংলাপকে নকল করে বললেন বব কার। এই সংলাপের মধ্যেই সমস্ত অর্থ অন্তর্নিহিত আছে।

সন্ধ্যাবেলা আমি এবং স্কট যথারীতি চা এবং কফি খেতে গেস্টাডে গেলাম।

আমি স্কটকে উইলিয়াম স্টাইরনের সর্বাধুনিক বই 'এ টাইড ওয়াটার মর্নিং' পড়তে দিলাম। স্টাইরন অসাধারণ লেখক। তার লেখা আমার দারুণ ভালো লাগে।

আজ গেস্টাডের রাস্তাঘাট জনশূন্য। সুইস ওপেন টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। স্কট আমাকে জানালেন, এই রেস্টুরেন্টেই নাকি আজ সকালে একজন আমেরিকান অভিনেতাকে দেখেছেন। 'কোন আমেরিকান অভিনেতা?' জিজ্ঞাসা করলাম আমি। তিনি অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই নামটা মনে করতে পারলেন না। তাকে দেখে খুব খারাপ লাগল – তার অবস্থা অত্যন্ত দুঃখজনক! হাল ছেড়ে দিয়ে স্কট বললেন, ''হে ভগবান, ক্রনিক ফ্যাটিগ সিনড্রোম আপনার মস্তিষ্ককে এভাবেই পঙ্গু করতে থাকে। নামটা আমার মাথার মধ্যে আছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করে মুখে আনতে পারছি না।''

আজ রাতটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।

১৮ জুলাই ... নবম দিন

''আপনি ভুল লোকের উপর নির্ভর করছেন। আমার কোনও ঐশী শক্তি নেই, কোনও আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাও আমার মধ্যে নেই, আপনার জীবনের সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণ প্রয়োজনের থেকে অধিক দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে ... বিদায়!'' ফোনের অপরপ্রান্তে কোনও এক ব্যক্তিকে একথা বললেন ইউ জী। তারপর টেলিফোন রেখে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন যথারীতি নিজের প্রাতঃরাশ এবং আমার কফি বানানোর জন্য। প্রায় অন্ধকার বসার ঘরে ঘড়িতে এখন সকাল ছ'টা কুড়ি। সুইজারল্যান্ডে আমার নবম দিন শুরু হল। আমার ভেতরটা আজ অস্বাভাবিক ভয়ে স্তব্ধ। ''ডঃ রঘুনাথ ফোন করেছিলেন, কানাডায় থাকেন। পি এইচ ডি করছেন দর্শনের উপর। থিসিসের বিষয়বস্তু ঋষি অরবিন্দ। ভারত থেকে দূরে থাকতে আমি তাকে একবার সাহায্য করেছিলাম। এখন তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে চান। তিনি জানতে চান ভারতে তার কি ধরনের সম্ভাবনা আছে।'' আমার না করা প্রশ্নের উত্তর দিলেন ইউ জী।

''ধর্ম মানুষকে পরিবর্তিত করতে কেন অক্ষম? একই জিনিস বার বার করলে যে ধরনের ভালো পরিবর্তন হয়, সেটা একমাত্র প্রযোজ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।''

আমার টেবিলের উপর একটা মাছি বসে আছে। মাছিটা চারিদিকে ঘোরাঘুরি

করছে, নিশ্চয়ই খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্য করলাম, যখনই আমি সন্দেহজনকভাবে কিছু করার চেষ্টা করছি, তখনই মাছিটা উড়ে যাচ্ছে এবং প্রায় তৎক্ষণাৎ চারিদিকের অবস্থা ভালো করে দেখে নিয়ে পুনরায় ফিরে এসে খাবার খোঁজার অসমাপ্ত কাজে লেগে পড়ছে।

"বুঝলেন, এর নাম সহজাত প্রবৃত্তি। আপনার তথাকথিত 'আমি'কে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারটা প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি নয়। এর চিরস্থায়ী হওয়ার ক্রমাগত চাহিদা আপনার শক্তিকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এটা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনার চিন্তার প্রক্রিয়া, যার চাহিদা চিরস্থায়ী হওয়া, একটা মৃত জিনিস। এই প্রক্রিয়া জীবন্ত কিছুকে স্পর্শ করতে পারে না ... সেই হতাশা আপনাকে ফল দিচ্ছে। আপনার কলার সমস্ত জগৎ এই হতাশার উপর নির্মিত। আপনি নিশ্চয়ই বহুল প্রচলিত কুকুর এবং তার শুকনো হাড় চিবোনোর উপমা শুনে থাকবেন। ক্ষুধার্ত কুকুর শুকনো হাড় চিবোতে চিবোতে তার মাড়িকে ক্ষতবিক্ষত করে এবং মাড়ি থেকে রক্তপাত হয়। বেচারা কুকুর জানতে পারে না, যে রক্ত সে পান করে সেটা হাড় থেকে আসছে না, আসছে নিজের মুখ থেকে। যা কিছুতে আপনার কোনও অভিজ্ঞতা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে আপনারই সৃষ্টি এবং এইসব অভিজ্ঞতাগুলো যতই গভীর এবং মহান হোক না কেন, সেসব বেশিদিন টেকে না।"

"আমার টেবিলের উপর মাছিটা আমাকে সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে যা শিখিয়েছে, তা আমার সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যার থেকে অনেক বেশি", বলেন ইউ জী। "কিন্তু ওই মাছিটার দিকে রোজ রোজ তাকিয়ে থেকে যদি কেউ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করতে চায়, তাহলে সেটা হবে অসম্ভব ব্যাপার ...।"

কিন্তু আমি কীভাবে আমার সমস্ত মূল্যবান অভিজ্ঞতাগুলো সময়ের ঘূর্ণিপাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি! আমার এই যে লেখার প্রচেষ্টা, এটা কি জীবন্ত মুহূর্তগুলোকে খাঁচায় বন্দি করে রাখার মতো নয়? জীবন্ত এই সব মুহূর্তগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে সূত্রবদ্ধ করে রাখাটা একটা ভালো কাজ বলেই আমার মনে হয়। কিন্তু এই কাজ কি ফল অর্জন করবে কে জানে?

"আপনি যদি গতানুগতিক ধারণা এবং পচাগলা সংস্কৃতি কোনও সমসাময়িক এবং নতুন কিছুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করাবার চেষ্টা করেন, তাহলে নির্ঘাত নতুনের মৃত্যু ঘটবে।" অধ্যাপক নারায়ণমূর্তি সবসময় আমাকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দেন।

তার সাবধানবাণী আমাকে এই শিক্ষা দিচ্ছে ঃ যে পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমি কাজ করছি, তাতে আমার কি করা অনুচিত।

স্কটী স্কট তার পাহাড়ি বাইসাইকেল দেয়ালে হেলান দিতে দিতে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আপনি কি জানেন কে সেই অভিনেতা, যার নাম আমি মনে করতে পারছিলাম না। তাঁর নাম হল জর্জ সি স্কট! হে ভগবান এই নামের শেষ ভাগটা আমি মনে করতে পারছিলাম না। ওই যে দূরে তুষারাবৃত পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ভাবছি আজ সেখানে গিয়ে কিছু কবিতা লিখব ... বিদায়! আবার পরে দেখা হবে।’’

আজ মারিওর জন্মদিন, তিনি একত্রিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। ‘জীবনের অর্থ কি?’ মনট্রোর প্যালেস হোটেলে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে যাওয়ার জন্য তার গাড়িতে ওঠার সময় রসিকতার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মারিও। ‘‘হত্যা করা এবং নিহত হওয়া, বধ করা এবং বধ হওয়া এবং এ সমস্ত কাজকে দশরকমভাবে যথাযথ ন্যায্য কর্ম বলে প্রমাণিত করাটাই আপনার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং অর্থ!’’ গাড়িতে উঠে সামনের সিটে বসতে বসতে আগ বাড়িয়ে মাথা গলিয়ে উত্তর দিলেন ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি।

১৯ জুলাই ... দশম দিন

শোয়ার জন্য ঠিকমতো শয্যা তৈরি করা রীতিমতো শক্ত কাজ। মনে হয় লেখার থেকেও অনেক কঠিন।

গতকাল রাত থেকে কোনও একজন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য খুব চেষ্টা করে চলেছে। টেলিফোন বারবার বেজে উঠছে আর যেই আমি রিসিভারটা ওঠাতে যাচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে লাইনটা কেটে যাচ্ছে।

‘‘আমার কাছে টাটকা জিনিস বলতে কিছু নেই। তাজা শাকসবজি, টাটকা দুধের সর – এসব একদম বাজে ধারণা। আপনারা ঠান্ডা ঘরে রাখা শাকসবজি এবং ফলের উপর ‘তাজা’ ছাপ মেরে দিয়ে লোকজনকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন। মানুষ যে কতভাবে প্রতারিত হচ্ছে? তাই আমি সবসময় বলি, আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, মেরি কুমারী ছিলেন, তাহলে আপনি সবকিছু বিশ্বাস করবেন। আপনার এই টাটকা তাজা জিনিসের প্রতি অস্বাভাবিক আসক্তির জন্ম হয়েছে ‘ভালো স্বাস্থ্য’ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থেকে। নিরামিষ জাতীয় আয়ুবর্ধনকারী

ম্যাক্রোবায়োটিক খাদ্যপদ্ধতির জনক খাওয়ার টেবিলে বসে শ্রোতাদের বলার চেষ্টা করছিলেন যে, তার স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত খাদ্যতালিকা যারা ঠিক ঠিক অনুসরণ করবে তাদের সুস্বাস্থ্যসহ দীর্ঘজীবন নিশ্চিত। এবং এসব বক্তৃতা দিতে দিতেই তিনি হঠাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এটা একটা বহুজনবিদিত গোপন খবর যে, জেন ফন্ডা, যাকে বিশ্বজুড়ে অ্যারোবিক শরীরচর্চা নিয়ে যে পাগলামি হচ্ছে, সেসবের প্রায় অধিষ্ঠাত্রী বলে মানা হয়, তার গোপনে হৃদযন্ত্রের বাইপাস সার্জারি হয়েছে। জে কৃষ্ণমূর্তি তার শরীরকে নমনীয় এবং কর্মক্ষম রাখার জন্য নিয়মিত তেল মালিশ করে স্নান করতেন। আপনি কি জানেন যে সেই তেল আসত সুদূর কেরালা থেকে। এতসব যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্য দিয়ে। কেউ কেউ ভালো করে খায় জীবনকে সুদীর্ঘ করার জন্য, আবার কেউ কেউ উপবাস করে বা কম খেয়ে থাকে জীবনকে সুদীর্ঘ করার জন্য। যাই হোক, সংক্ষেপে, আপনি যাই করেন না কেন, সেসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মৃত্যুকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। এটাই হল আপনার নিদারুণ যন্ত্রণা। শরীরের এইসব চিরস্থায়িতাজনিত ভাবনাচিন্তা নিয়ে ক্রীড়ামগ্ন হওয়ার কোনও আগ্রহ নেই। স্বাস্থ্য শুধু একটা সংজ্ঞামাত্র।

যোগাভ্যাস এবং অন্যান্য যে সমস্ত শরীরচর্চা আপনারা করেন তাতে শরীরের শক্তিধারা বিপরীতগামী হয়। জন্তু–জানোয়াররা যে সমস্ত শারীরিক কার্যে লিপ্ত হয় তা শুধু আহারের সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য অথবা বিপজ্জনক অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। আমাদের সমগ্র অস্তিত্বটা শুধু লেনদেন বা কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে, এমনকী আধ্যাত্মিক ধারণাও এর অন্তর্গত ... কাউকে চিরকালের জন্য সুখ্যাতি প্রদান করার অর্থ হল তাকে অমর করে রাখা। 'অমর' মানে মৃত্যুহীন এবং 'আত্মা' কথার অর্থ হল একটা সত্তা যা অশেষ এবং অবিনশ্বর'' – অভিধান থেকে পড়তে পড়তে বলেন ইউ জী।

''আপনার সঙ্গে কথা বলা ঠিক মৃত্যুর সঙ্গে কথোপকথন করার মতন'' – আমি তাঁকে বললাম। ইউ জী–র প্রত্যুত্তর, ''মৃত্যুর সঙ্গে আপনি কীভাবে কথোপকথন করবেন? সেই 'আপনি' শেষ না হলে মৃত্যুর সঙ্গে কোনও সাক্ষাৎ নেই। অবশ্য মৃত্যু সম্পর্কে আপনি সমানে কথা চালাতে পারেন এবং বলতে পারেন আপনার মধ্যে সমস্ত অতীতের সমাপ্তি ঘটেছে।''

'আপনার কি বক্তব্য, ইউ জী?' অত্যন্ত উত্ত্যক্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

'এখুনি মরে যেতে হবে!' সরাসরি আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উত্তর দিলেন তিনি।

'আপনি কারও মৃত্যুকে আপনার অভিজ্ঞতার আওতায় আনতে পারবেন না, এমনকি আপনার অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যুকেও না। যা আপনি অনুভব করেন তা হল একটি শূন্যতা, অতি ভালোবাসার মানুষ চলে গেলে সেটা হয়।'

বিচ্ছেদ এক গভীর বেদনা। মৃত্যু যেহেতু সম্পর্কের চিরসমাপ্তি তাই বেদনাও অত্যন্ত অসহনীয় বলে আমার মনে হচ্ছে। আমার ভেতরের শূন্যতাকে ভরাবার জন্য আমি যথাশীঘ্র আমার ছেলেমেয়েদের ফোন করা শুরু করলাম। ''তুমি কি জানো শাহীন রোজ তোমার জামা পরে ঘুমোতে যায়?'' সোনি ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে বলল, ''ও বলে তোমার দেহের সুগন্ধ ওর খুব পছন্দ। তোমার অনুপস্থিতি ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে।''

২০ জুলাই ... এগারো দিন

সঞ্জয় দত্ত এবং আমি বোম্বের জনবহুল রাস্তা দিয়ে একসঙ্গে হাতে হাত ধরে হেঁটে চলেছি। আমাদের কিন্তু কেউ সেরকম চিনতেও পারছে না। কেন? ''তুমি স্বপ্ন দেখছ'' – মাথার মধ্যে কে যেন বলে উঠল। আমি জেগে উঠলাম। এখনও খুব ভোর। ঘুমোতে যাওয়ার আগে জানালার পরদা ঢেকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। ঘরে বেশ আলো। ডায়েরি খুলে বসলাম। ইউ জী এটা আমায় উপহার দিয়েছেন এবং ২০ জুলাই তারিখের উপর দাগ কেটে দিলাম। এই 'স্বর্গে' আজ আমার এগারো দিন। হে পরমেশ্বর!

গতকাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে। ভেজা ঘাসের গন্ধ আমায় বোম্বের শিবাজী পার্কের কথা মনে করিয়ে দিল। তুমি শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য এবং স্বাদের এক সমন্বয় ছাড়া আর কি কিছু? ইউ জী উঠে পড়েছেন। ভোরের আলোয় খালিপায়ে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন, সদ্যকাচা তিনটি অন্তর্বাস হাতে করে জামা-কাপড় শুকোতে দেওয়ার জন্য যে দড়ি টাঙানো আছে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। জেন ছাত্রের উক্তি, ''আমি গুরুর কাছে তাঁর কথা শুনতে যাই না, তিনি কীভাবে জুতোর ফিতে বাঁধেন সেটা নিরীক্ষণ করতে যাই।'' সেই জেনবাদী সন্ন্যাসীর শিষ্য যা বলেছিলেন আমি আজ ঠিক তাই করব।

জামা–কাপড় শুকোতে দেওয়ার মতন অত্যন্ত সামান্য কাজ করাটাও যেন ইউ জী–র কাছে সেই সময়ের জন্য তাঁর অস্তিত্বের পরম সত্তা বলে মনে হয়। তিনি এ কাজের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নিমগ্ন হয়ে যান। তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব তখন শুধু সেই কাজ! তাঁর মুখমণ্ডলে এক বিস্ময়বোধ জেগে ওঠে, যখন তিনি ক্লিপ দিয়ে গেঞ্জিটাকে দড়িতে টাঙান বা সামান্যতম ভাঁজগুলোকে টেনে টেনে সমান করে দেন। প্রতিটি মুহূর্তে জীবনযাপন করাটা তাঁর জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছে। কোনও চাপিয়ে দেওয়া দার্শনিক তত্ত্ব নয়।

ইউ জী জানালার পরদা সরিয়ে বসার ঘরে প্রভাতকে প্রবেশ করতে দিলেন। তারপর সোফা থেকে আলমারির মধ্যে ছোট ছোট কাজগুলো, চেয়ারের ঢাকনা টান টান করা এবং সোফার বালিশগুলো যথাস্থানে রাখা, করতে লাগলেন তাঁর স্বাভাবিক মাধুর্যপূর্ণ গতিময়তার সঙ্গে। সবকিছুকে যথাস্থানে রেখে শৃঙ্খলা বজায় রাখাটাই তাঁর কাজের লাবণ্যময় প্রকাশ। এবার তিনি কোনও একটা জিনিসের সন্ধান করছেন, যেটা তিনি যথাস্থানে দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁর চোখের নজর এখন সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, ‘‘ফোনের কাছে একটা পেনসিল ছিল’’, তখন হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম ঃ আমি যদিও সবচেয়ে বেশি টেলিফোন ব্যবহার করি এবং টের পেয়েছিলাম যে পেনসিল যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। তবুও আমি সে ব্যাপারে কিছুই করিনি, অথচ এই ভদ্রলোক যিনি কদাচিৎ টেলিফোন ব্যবহার করেন এবং কখনও পেনসিল ব্যবহার করেন না, তিনি পেনসিল খোঁজার ব্যাপারে উঠেপড়ে লেগেছেন। ‘‘আমার দৃঢ় বিশ্বাস জুলি পেনসিলটা নিয়ে অন্য কোথাও রেখে দিয়েছে।’’ নিশ্চয়তার সঙ্গে জানালেন ইউ জী। অবশেষে একটা নতুন পেন টেলিফোনের কাছে রেখে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে লিভিংরুমে বসে পড়লেন। বর্তমানে ঘরের সবকিছু চিত্রপটের মতো নিশ্চল। তাঁর চলন ভঙ্গিমা থেমে যাওয়াটা দেখলে মনে হবে যেন একটা গানের কলি শেষ হল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে অভিভূত করা একটা স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। ‘‘যতক্ষণ আপনি অবগত, ততক্ষণ কোনও নীরবতা নেই। সেই প্রত্যভিজ্ঞতাই আপনি। সেটাই মহেশ! যে ট্রেনটা আমাদের বাড়ির কাছ থেকে যাচ্ছে তার যে আওয়াজ আপনি এখন শুনতে পাচ্ছেন তাই আপনাকে নীরব করে দিতে পারে। আপনার ইতি ঘটাতে পারে। আপনি সেটা সহ্য করতে পারেন না, তাই আপনি পালিয়ে যেতে বাধ্য।

যেমন নাকি আপনি সূর্যের দিকে, অন্ধ না হয়ে গিয়ে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারবেন না। ঠিক সেরকম আপনার চারিদিকের আওয়াজও আপনি একই রকম ভাবে শুনতে পারবেন না।''

বব এবং পল, ক্যালিফোর্নিয়াতে বসবাসকারী মার্কিন বন্ধু, এখানে এসেছেন তাদের বন্ধু কণীর সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য। কণী আধ্যাত্মিক গবেষক, আধ্যাত্মিক বাজারে অনেক খোঁজাখুঁজির পর, মদের নেশার কবলগ্রস্ত, কণী এখন থাইল্যান্ডে, কিন্তু নিরুদ্দেশ। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্নের মার্কিন দূতাবাস বব এবং পলের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে। তারা কণীর বিপজ্জনক কিছু হয়েছে বলে সন্দেহ করছেন। 'কণী হয়তো মারাই গেছেন,' বব বলে উঠলেন, তাকে দেখে অত্যন্ত সংযত বলে মনে হল।

''মানুষের মিথ্যাগর্বজনিত দুর্বলতা এবং ভঙ্গুর মানসিকতা আমি কিছুতেই মানতে পারি না। ধার্মিক লোকেরা এসবের সায় দেয়, কারণ এ সমস্ত লোকেরাই তাদের জীবনযাপনের পুঁজি। এসব কি আপনারা দেখতে পান না। এই যে বাজারে যারা গুরুগিরি করে, মনস্তত্ত্ববিদরা এবং সেই জাতীয় চিকিৎসকরা আপনাদের এই সব দুর্বলতা এবং অক্ষমতাকেই পুঁজি করে বেঁচে আছে,'' ইউ জী ঘোষণা করলেন।

আজ রাতে যে সিনেমা দেখব, তার নাম 'এড উড।' এটা সাদা-কালো চলচ্চিত্র, হাস্যরসাত্মক এই নাটকটা একজন পরিচালকের জীবনীর উপর ভিত্তি করে লেখা। যিনি তার কর্মজীবনের শেষদিকে 'বিশ্বের সর্বনিকৃষ্ট পরিচালক'-এর খেতাব পেয়েছিলেন। সিনেমাটা আমার দারুণ ভালো লেগেছে। একজন প্রাক্তন অভিনেতার সঙ্গে এক যুবক ব্যর্থ পরিচালকের সম্পর্কটা খুব সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে, সত্যিই হৃদয়বিদারক। সিনেমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ দেখলাম জুলী এবং নারায়ণ মূর্তি ইন্টারনেটে এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব নিয়ে কীভাবে খেলা করছেন। সারা পৃথিবীতে যাদের কাছে ইন্টারনেট আছে এরকম প্রায় চার থেকে সাত কোটি লোকের পক্ষে ইউ জী সম্বন্ধে জানতে পারার সুযোগ হয়েছে। ''হে ভগবান, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা কী করেছে একবার দেখুন ইউ জী,'' মুগ্ধ হয়ে আমি বললাম। ''কিন্তু এটা ভুলে যাবেন না এই প্রযুক্তি বিদ্যাই আবার অযথা জীবন ধ্বংস করে।'' কোনওরকম উচ্ছ্বাস না দেখিয়ে বললেন ইউ জী।

২১ জুলাই ... বারো দিন

সিনেমার ব্যাবসা আপনাকে পান চিবিয়ে খাওয়ার মতো করে খেয়ে তারপরে রাস্তার ধারে পিক ফেলার মতো করে ফেলে দেবে। চিত্ত বিনোদনের ব্যাবসায় টিঁকে থাকতে হলে অসম্ভব সাহস এবং নিজেকে পুনর্জীবিত এবং পুনরাবিষ্কার করার ক্ষমতা থাকা দরকার। কোনও একজনের চরিত্র নির্ভর করে কোনও ঘটনার সম্মুখীন হলে তার মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তার উপর। আপনি যা করেন সেটাই আপনার পরিচয়, আপনি যা করতে চান সেটা নয়। ‘‘আপনি তখনই বেশি ভাবনাচিন্তা করেন যখন আপনি কিছু করতে চান না। চিন্তা করাটা কর্ম করার একটা অত্যন্ত নিম্নমানের বিকল্প। আপনার চিন্তা আপনার সমস্ত শক্তি শোষণ করছে। কর্ম করুন, চিন্তা নয়!’’ আমার দিকে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে বললেন ইউ জী। ইউ জী যখন আপনাকে আক্রমণ করবেন, তখন তিনি অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে যাবেন, এক মিনিটের জন্যও থামবেন না। ‘‘আমি একটা জন্তুর মতন’’, বলেন তিনি। ‘‘হয় আমি আপনাকে বধ করা অবধি যুদ্ধ করে যাব, নয়তো আমি পালিয়ে যাব।’’

আমি কর্মনেশাগ্রস্ত। কাজ না থাকার জন্য আমার ভয়ানক অস্বস্তিতে সময় কাটছে – এও এক দুর্ভোগ। ড্রাগ বা মাদক দ্রব্যের ভয়ংকর নেশার কবলগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে আমার তেমন কোনও পার্থক্য নেই, যারা নেশার সামগ্রীর অভাববোধে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে। সমস্যা এবং কঠিন চাপের মুখোমুখি না হলে মনে হয় না বেঁচে আছি। সমস্যা আমাকে দানাবাঁধা স্ফটিকে রূপান্তরিত করে। সমস্যা আমার সংজ্ঞা। ইউ জী আপনার কথাই সত্যি। আমরা সমস্যাগুলো ভালোবাসি। ‘‘আপনার আসক্তির জন্য আপনাকে মূল্য দিতে হবে, এর কোনও অন্যথা নেই। আসক্তি এবং ভারমুক্ততা – উভয় জিনিস একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। এটা অসম্ভব।’’ মারিওকে উদ্দেশ্য করে বললেন ইউ জী। তার ঘরের এবং বান্ধবীর সমস্যা নিয়ে তারা আলোচনা করছেন। ‘‘কঠিন সত্যই সবচেয়ে বড় শিক্ষক। এই সত্যই আপনাকে জাগিয়ে দিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত করাবে।’’ আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, ‘‘ইউ জী, যখনই আপনি কোনও প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করেন, আমি নিজেকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চাই, কিন্তু কেন?’’ এবার তিনি সরাসরি আমার চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বললেন, ‘‘আপনি শুধু আমার কাছ থেকেই নিজেকে সরিয়ে নেন না, আপনি এই পৃথিবীর নিষ্ঠুর বাস্তবের কাছ

থেকেই নিজেকে গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। গতকাল রাতে টেলিভিশনে বুলফাইট (স্পেনের বিখ্যাত খেলা – মানুষের সঙ্গে ষাঁড়ের যুদ্ধ) দেখে জুলী কেন এসবের বিরুদ্ধে বলছিলেন, এসব খেলার নিন্দা করছিলেন? তিনি বলেছিলেন, এসব তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাহলে দেখার কি দরকার ছিল? যুদ্ধ চলাকালীন ষাঁড়ের উপর যে অত্যাচার হয় সেটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না, কিন্তু তাহলে তাদের সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যাদের তিনি সমর্থন করেন, তারা যখন হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে স্বাধীনতার অজুহাতে হত্যা করে, তার জন্য কি করা যেতে পারে?''

সন্ধ্যাবেলা ইউ জী আমাদের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা শোনালেন। একদিন এক ভদ্রমহিলা জে কৃষ্ণমূর্তির কাছে গিয়ে বেহালাবাদক য়েহুদি মেনুহিনের বাজনা শুনতে শুনতে আগেরদিন রাতে তার মধ্যে যে অসাধারণ সৃষ্টিমূলক অভিজ্ঞতা হয় সে সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন। কৃষ্ণমূর্তি সেই ভদ্রমহিলাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন জানেন, ''ম্যাডাম, বেড়ালের অন্ত্রের সঙ্গে ঘোড়ার চুলের ঘষাঘষিতে কি এমন সৃষ্টিমূলক জিনিস থাকতে পারে?'' এখানে গেস্টাডে থাকাকালীন জে কৃষ্ণমূর্তির দলের এক অভ্যন্তরীণ সদস্যের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম যে জে কৃষ্ণমূর্তি নিজে খুব সংগীতপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই বেঠোফেনের নাইনথ সিম্ফনি শুনতেন।

অনেক রাতে বব, পল, নারায়ণ মূর্তি এবং আমি নক্ষত্রে ভরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে আছি। হঠাৎ ইউ জী আমাকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীমায় আঘাত করতে শুরু করলেন – ''মহেশ, এমনকী আপনিও আমার একটা কথাও বুঝতে পারছেন না। আপনি একথা কখনই ভাববেন না যে আপনি যাদের অবহেলার চোখে দেখেন তাদের থেকে আপনি এমন কোনও উচ্চতর মানুষ ...'' মনে হল যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমেছি। অনেক কষ্টেও তাঁর সমকক্ষ হওয়ার বৃথা চেষ্টা করলাম, সংগ্রাম বিফল হল। আক্রমণের পরে মনে হল যেন আমার মধ্যে কিছুই নেই। কিন্তু একটা অদ্ভুত শান্তভাব জাগ্রত হল। আমি মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। কোনও কারণে তারাগুলো যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মনে হল যেন আমার সামনে থেকে কোনও পরদার উন্মোচন হয়েছে। গভীর রাতে ঘুমের অপেক্ষায় বিছানায় এপাশ–ওপাশ করতে থাকলাম।

২২ জুলাই ... তেরো দিন

অতীতের যে সমস্ত ক্ষত আমাদের সঞ্চিত সম্পদ, 'আমি' বলতে যে জিনিসটা আছে সেটা কি শুধু তাই নয়? আজ আমি খুব ভোরে উঠে পড়েছি। রাতের বিধ্বস্ত আক্রমণের প্রচণ্ড ধাক্কায় এখনও টলমল করছি। গতকাল আমার আত্মাভিমান অত্যন্ত আহত এবং ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল।

আমরা গেস্টাডের এক ট্রাভেল এজেন্টের কাছে যাই। ইউ জী নিজে আমার বাড়ি ফিরে যাওয়ার অগ্রিম বুকিং করছেন। ফিরে যাওয়ার দিন নির্ধারিত হয়েছে। লন্ডনের অভিমুখে রওয়ানা দেব আট তারিখে। এই কষ্টভূমিতে আরও পনেরোদিন থাকব। আমি সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে আলোর আভাস পাচ্ছি। অথবা আলোর পরপারে সুড়ঙ্গের আভাস পাচ্ছি। দয়া করে কেউ আলোটা নিভিয়ে দিন। আমার অন্ধকার আমি আবার ফিরে পেতে চাই।

'সুপ্রভাত' বলে ইউ জী রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেয়ালের ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে জানান দিলেন ক'টা বাজল। ছ'টা বেজে পনেরো মিনিট। যথারীতি রান্নাঘর থেকে থালা বাসনের পরিচিত আওয়াজ কানে আসছে। তিনি বললেন, ''মহাশয়, আপনার কফি তৈরি।'' আমি আজ খাওয়ার টেবিলে তাঁর সঙ্গে কথা বলব না। আজ সকালে শুধু আমার স্ক্রিপ্টের উপর কাজ করব।

স্কটী স্কট ঘরে প্রবেশ করল। হঠাৎ ঘরের বাতাবরণে একটা কর্মোচ্ছ্বাস দেখা দিল। ''আমি এই পৃথিবীর, এই সমাজের একটা সক্রিয় অঙ্গ। আপনি আমায় কি করতে বলেন? একটা গুহায় গিয়ে কেন আমি বসবাস করব? আপনার সঙ্গে এ সমাজের সংঘাত, এই কারণে আপনি ক্রমাগত সমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে শান্তির খোঁজ করেন। আপনি কোন দুঃখে সমানে পালিয়ে গিয়ে ওই পাহাড়ের ওপরে বসে থাকেন? এই পৃথিবী, এই সমাজ – যেভাবে আছে, যা দেখছেন, তাছাড়া আর কোনওরকম কিছু হতে পারে না।'' অকল্পনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন ইউ জী।

আমার মনে হয় এখন আমি জানি আমার সমস্যাটা কি ঃ তাঁর মতন হওয়ার ইচ্ছাটাই আমার সমস্যা, আমার দুঃখের কাহিনি।

কিন্তু তিনি চান না যে আমি তাঁর মতন হই। তিনি চান আমি যেন আমার মতন হই। আমি কিন্তু আমার মতো হতে চাই না। আমি তাঁর মতন হতে চাই। এবং আমি এও জানি যে আমি কোনওদিন তাঁর মতন হতে পারব না। খুব বেশি হলে একটা

ভান ধরে থাকতে পারি যে আমি তাঁর মতন। আমাদের সমগ্র সংস্কৃতিটাই এই ভান ধরে থাকাটা কত ভালোভাবে করা যায়, তারই একটা কসরত মাত্র। আমি কি কোনওদিন প্রসন্নচিত্তে আমার দুর্বলতা এবং অসামর্থ্য মেনে নিয়ে ভান ধরা বন্ধ করতে পারব? মনে হয় না কোনওদিন পারব।

দার্শনিক নীটশ–এর একটা উক্তির কথা মনে পড়ল ঃ ‘‘আমাকে একজন মহান লোক দেখান আমি আপনাকে তার নিজের ধারণাগত এক অন্ধ অনুকরণকারীকে দেখিয়ে দেব।’’ কি সত্যিকথা! এটা কোনও আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

বব, পল এবং আমি অনেকক্ষণ ওপরে বসে ইউ জী নামক এই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলাম। পল আর্মস বললেন, ইউ জী যেসব কথাবার্তা বলেন, সেসবের উপর একটা বিশেষ আগ্রহ নিয়ে হয়তো আপনাকে জন্মাতে হবে, তা না হলে কেন এমন কষ্ট এবং অস্বস্তি আপনি সহ্য করতে যাবেন। ঠিক সেই সময় মারিও আমাকে ডেকে বললেন, ‘‘আপনার প্রভু আপনাকে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিচে আসতে বলছেন।’’ আমার হৃদয় ক্ষণিকের জন্য থেমে গেল। এখন আবার কি হবে কে জানে, বলতে বলতে সুবোধ বালকের মতন নিচে যাওয়ার জন্য দৌড় লাগালাম।

হ্যারির মা যাকে খুদে ইন্টেলেকচ্যুয়াল বলে অভিহিত করেন, সেই হ্যারি প্রতি বছর ইউ জী–র জন্মদিনে তাকে একশো ডলার উপহার দেন। আজ তিনি যথারীতি ইউ জী–কে কিছু টাকা দিয়েছেন। ইউ জী বললেন, ‘‘অনেকে আমাকে অনেক কিছু উপহার দেন, তাদের মধ্যে কিন্তু আপনার উপহার আমার কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান, হ্যারি। আপনি কি জানেন, কেন? কারণ আপনি শৌচালয় পরিষ্কার করেন, দরজা–জানালা ধোয়ামোছার কাজ করেন এবং ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করেন। আমি জানি এই পয়সা রোজগার করতে আপনাকে কতই না কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। শুধুমাত্র এই কারণেই।’’ ইউ জী–র এই বক্তব্য উপস্থিত সবাইকে বিস্মিত করে দিল। অমায়িক হ্যারি ইউ জী–র এই প্রশংসায় যদিও খুব লজ্জাবোধ করলেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব খুশি হলেন।

সন্ধ্যার শেষে গটফ্রিড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। ‘‘আপনি যখন এধরনের চরম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে

যান, তখন ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন যে এ পৃথিবীতে আপনার অধিকারে কিছু নেই – আপনার স্ত্রী, আপনার প্রিয় কুকুর, আপনার সন্তান – কোনও কিছু না।''

আমাদের সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে যে বিষয়টা বারবার আলোচিত হয় তা হল 'মৃত্যু'। এ জায়গাটা ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে। এখন ভীষণ গরম বোধ হচ্ছে, ওঃ, দারুণ গরম লাগছে।

ফোনটা বেজে উঠল। ভারত থেকে আমার জন্য ফোন এসেছে ভেবে আমি ফোনের দিকে দৌড়ে গেলাম।'' বব কারের সঙ্গে কথা বলা যাবে কি? থাইল্যান্ডের আমেরিকান অ্যামব্যাসি থেকে বলছি।'' ''একটু ধরুন, আমি ডেকে দিচ্ছি। বব আপনার ফোনের প্রত্যাশায় অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছেন।'' আমি বললাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ কৃষ্ণমূর্তির ছেলে কিরণকে ইশারায় জানালাম ববকে ডেকে দিতে।

''আমি আগে কয়েকবার ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এখানে থাইল্যান্ডে এক ভয়ানক ঝড়ের আঘাতে সমস্ত টেলিফোন লাইনগুলো কিছুদিনের জন্য অকেজো হয়ে গিয়েছিল।'' শান্ত এবং পেশাদারী কণ্ঠ ভেসে এল ফোনের অপর প্রান্ত থেকে। কিছুক্ষণ পরে যখন সবাই ইউ জী–র সঙ্গে হাসি ঠাট্টায় মগ্ন তখন আমার নজর স্বাভাবিকভাবে বব কারের দিকে আকৃষ্ট হল। দেখলাম এই হাসিখুশি এবং আত্মসন্তুষ্ট ভদ্রলোক কীভাবে এক কোণায় অসহায় বালকের মতো ফোনের অপরপ্রান্তের সেই কণ্ঠস্বর গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে শুনতে ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছেন। বুঝতে পারলাম বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শেষ পর্যন্ত তাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। অবশেষে বব কারের কাছে জানতে পারলাম কণীর মৃতদেহ এখনও দাহ করা হয়নি। কর্তৃপক্ষ বব কারের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছে। বব তাদের করণীয় কাজ যথাশীঘ্র করতে অনুমতি দিলেন। এই ফোন কলটা যেন প্রবাদ বাক্যের শেষ কথার মতো কাজ করল। টেলিফোনটা রাখতে রাখতে বর কার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ইউ জী বব কারকে এমনভাবে কাঁদতে দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলেন। মানুষের অন্তিমকাল প্রিয়জনের কাছে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক।

২৩ জুলাই ... চোদ্দো দিন

আরও জেগে থাকা দু'শো সত্তর ঘণ্টা এখানে অতিবাহিত করতে হবে। অর্থাৎ আমার গেস্টাডে থাকার অর্ধেকটা সময় পার হয়ে গেছে। এখানে আসার পর আমি

প্রচুর হাঁটাচলা করছি। ভারতে ফোন করার মাধ্যমে আমি নিজেকে ব্যস্ত রাখি। বোম্বের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার মাধ্যমে নিজেকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে সক্ষম হচ্ছি। লোকজন বলছেন, আমার ওজন অনেক কমে গেছে। ‘‘খাওয়াদাওয়া হচ্ছে মানুষের এক নম্বর শত্রু। আমরা প্রচুর পরিমাণে খাই এবং আমরা সুখভোগের জন্য খাওয়াদাওয়া করি। আমাদের শরীরের এত খাদ্যের কোনও প্রয়োজন নেই। কম খাওয়া কোনও রকমের ক্ষতি করে না। কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়াদাওয়া নিশ্চিতরূপে আপনাকে অতি শীঘ্র হত্যা করে ফেলবে।’’ সকালে খাওয়াদাওয়ার সময় একথা বললেন ইউ জী কৃষ্ণমূর্তি।

‘‘ইউ জী, বিবাহ প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে আপনি অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করেন।’’ অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে রান্না ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন জুলী। ‘‘আমাকে বলুন, সম্পত্তি এবং নিরাপত্তা ছাড়া ওই কাগজের টুকরোটার কি মূল্য আছে?’’ ইউ জী উত্তরে জানালেন। জুলী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

ইউ জী কথোপকথনের কিছু অংশ ...

... বিশ্বের সমস্যাগুলো আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যার প্রসারণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

... অন্তর্দৃষ্টি বলতে কিছুই নেই। আমাদের জীবনের সমস্যার মুখে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ আর পাঁচজনের মতনই ব্যবহার করেন।

... মৃত্যু মানুষের যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটায়। কিন্তু এমনকী এখানেও, আপনি আপনার চির সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যন্ত্রণায় কাতর মানুষটিকে সমস্ত রকমের আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে জোর করে বাঁচিয়ে রাখবেন, কারণ তার অনুপস্থিতির শূন্যতার মুখোমুখি কিছুতেই হতে চান না। আপনি কি এবার বুঝতে পারছেন মানুষ কত স্বার্থপর?

... প্রায় সমস্ত সন্ধিক্ষণে মানুষ একই মুহূর্তে দুটো পরস্পর-বিরোধী জিনিস চায়। এটাই হল মানুষের দুঃখের করুণ কাহিনি।

... আপনাদের নারীমুক্তির সমস্ত বক্তৃতা অন্তঃসারশূন্য। আমি একজন ভদ্রমহিলাকে চিনি, তিনি বলেন যে স্বামীর সঙ্গে তার বসবাস করা অসহ্য হয়ে পড়েছে। ভদ্রমহিলা বলেন, তার স্বামী নিদারুণ বিরক্তিকর মানুষ, অথচ নির্লজ্জভাবে তার সঙ্গেই বসবাস করেন। কিন্তু কেন? খুবই সাধারণ ব্যাপার, টাকার

জন্য এবং নিরাপত্তার জন্য।

... আপনার প্রিয় বন্ধু মারা গেলে আপনি কতই না কান্নাকাটি করেন, কিন্তু যখন তাকে দাহ করার জন্য টাকা দেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন ভয়ে অসাড় হয়ে যান। তাহলে বুঝতে পারছেন তো টাকা আপনার কাছে কি জিনিস?

... আপনি বলেন, ‘‘আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি, আমি তোমাকে খুব মিস করছি,’’ অথচ সেই লোককে লং ডিসট্যান্স ফোন করার আগে দু’বার ভাবতে হয় ...। এই কারণেই আমি সবসময় টাকার কথা বলি। এবং এই টাকাই বলতে পারে আপনি কোন জায়গায় অবস্থান করছেন।

... আপনাকে টাকা দিয়ে তারা নিয়ন্ত্রণ করে। আবার টাকা থেকে বঞ্চিত করে তারা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে ...। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কারোর কাছ থেকে কোনও কিছু চান, ততক্ষণ অবধি কেউ না কেউ ঠিক আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

ইউ জী–র কাছে যা কিছু বেঁচে থাকে তা ঠিক সঞ্চয় নয়। প্রত্যেক নববর্ষের প্রথম দিনে, ইউ জী–র কাছে যা কিছু বেঁচে থাকে তা তিনি অন্যদের দান করে দেন। এই দান করাটা তিনি শিখেছিলেন অ্যানি বেসান্টের কাছ থেকে এবং অ্যানি বেসান্ট অনুকরণ করতেন সম্রাট অশোককে। সম্রাট অশোক প্রতি পাঁচ বছর অন্তর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে দিতেন।

গরমের প্রকোপ অনেকটা কমেছে।

২৪ জুলাই ... পনেরো দিন

আমার বিছানার গোছগাছ সব কিছু বলে। যেভাবে আমার বেডকভার বিছানায় গোঁজা আছে, সেটা দেখলেই বোঝা যাবে কী ধরনের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের সঙ্গে এসব কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আপনি যা করেন তাই আপনার পরিচিতি। আপনি আপনার কাজকর্ম থেকে পৃথক কিছু নন। আপনার কর্মই আপনাকে প্রকাশ করে। আমার এলোমেলো বিছানার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বললাম।

‘‘আপনার সকল কাজকর্মে এক অসাধারণ মাধুর্য আছে ইউ জী। রোজ সকালে আপনি যখন ওটমিল সিদ্ধ করে খান, সেটা দেখতেও আমার দারুণ লাগে।’’ খাবার টেবিলের উলটোদিকে বসে তাঁকে কথাগুলো বললাম আমি। ‘‘আমার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম যন্ত্রবৎ, ঠিক যন্ত্রের গতিবিধির মতন।’’ বললেন ইউ জী। আমার প্রশংসাবাণী তাকে কোনওভাবে স্পর্শ করতে পারল না। আমি তর্কের খাতিরে

বললাম, ‘‘কিন্তু একটা যন্ত্রের মধ্যে কোনও মাধুর্য নেই।’’ ‘‘অবশ্যই আছে, যন্ত্রের গতিবিধির মধ্যেও এক অসাধারণ মাধুর্য আছে। আপনি একটা ঘড়ির কাঁটা চলা লক্ষ্য করে দেখেছেন কখনও? তাকে যন্ত্র বলে অভিহিত করেই আপনি সেই চলার মাধুর্য অনুভব করা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন।’’ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি তিনি কি বলার চেষ্টা করছেন। ঘড়ির কাঁটা চলা লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে কি তার মাধুর্য। কোনও এক ব্যক্তি যখন কোনও কিছু সম্পর্কে এক বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তখন নিজেকে সেই জিনিস ঠিক ঠিক যে রকম সেভাবে দেখা থেকে বঞ্চিত করেন। ‘‘আচ্ছা ইউ জী, এই যে আপনি এখন যা বললেন এই নতুন ধারণা নিয়ে আমি যখন একটা যন্ত্রের দিকে তাকাচ্ছি এবং বলছি যন্ত্রের গতিবিধির মধ্যে একটা মাধুর্য আছে, তাহলে কি ব্যাপারটা একই দাঁড়াল না?’’ ইউ জী সম্মতি জানিয়ে বললেন, ‘‘আপনি একই জিনিস করছেন।’’

আমি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললাম, ‘‘আমি যখন বলেছিলাম যন্ত্রের গতিবিধির মধ্যে কোনও মাধুর্য নেই, তাহলে এ দু’টো মতামতের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই?’’ ইউ জী আবার হেসে বললেন, ‘‘না, কোনই পার্থক্য নেই!’’ বুঝলাম আর একবার আমি চোরাগলিতে এসে হাজির হয়েছি। ‘‘তাহলে ইউ জী, কোনও একজন যাই করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীকে দেখবে শুধুমাত্র তার ভাবনা এবং ধারণার মধ্য দিয়ে, তাই না?’’ ‘‘আজ্ঞে হ্যাঁ মহাশয়।’’ বলতে বলতে ইউ জী রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর প্লাস্টিকের বাটি পরিষ্কার করে ধোয়ার জন্য।

আপনার ভণিতাকে ইউ জী কঠোরভাবে আঘাত করলে প্রথম প্রথম মনে হবে আপনাকে কে যেন পোশাক পরিচ্ছদ খুলে নগ্ন করে দিচ্ছে। যখন আপনার ভান ভণিতার বর্ম খসে পড়তে থাকবে তখন নিজেকে খুব হালকা মনে হবে।

স্কটী স্কটের সঙ্গে গেস্টাডের রাস্তায় পায়চারি করে আমার অন্তরাত্মায় যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটে। তার জীবন সত্যিই শ্বাসরুদ্ধকারী। ওহাই-এর এই ছুতোর মিস্ত্রির জীবনের গল্প বাজারের সমস্ত প্রেরণাদায়ী বইগুলোর থেকে আমাকে অনেক বেশি উদ্বুদ্ধ করে। এ যেন অদম্য জীবনশক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশের এক দুরন্ত কাহিনি। সেসলিতে এক ভয়াবহ বন্যায় যে এগারো জন পদব্রজে দীর্ঘ ভ্রমণকারী ফুলে ওঠা নদীর ভয়ংকর স্রোতে ভেসে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে শুধু একজন বেঁচে ফিরে এসেছিলেন। তিনি হলেন আমার এই বন্ধুটি, স্কট এক্কার্সলী।

পল সেমপে, মারিও, ইউ জী এবং আমি গাড়ি চালিয়ে বার্নে এলাম। পেছনের সিটে বসে আমার নতুন চলচ্চিত্র 'তামান্না'র কথোপকথনের উপর কাজ করলাম। এখানে থাকাকালীন ছবির কথোপকথন যে উন্নত রূপ পেয়েছে তা বোম্বেতে থাকলে কিছুতেই সম্ভব হত না। আমরা একটা নিরামিষ রেস্টুরেন্টে মধ্যাহ্নভোজন করলাম। ''ভারতবর্ষে কি হচ্ছে একবার লক্ষ্য করে দেখুন, যে দেশ মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা দর্শনের জন্য এমন গর্বিত তারা দেশকে অবিভক্ত রাখার অজুহাতে কাশ্মীরে প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে লোককে হত্যা করছে।'' ইউ জী পল সেমপের দিকে তাকিয়ে একথাগুলো বললেন কারণ পল মহাত্মা গান্ধীর গুণমুগ্ধ প্রশংসক।

আমরা ফ্রাইবর্গ হয়ে গেস্টাডে ফিরলাম। ইউরোপে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হয় এই ফ্রাইবর্গে। ইউ জী সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাহ্য করেন। বলেন, এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো অসামরিক বন্দি শিবিরের মতন। ''জ্ঞান হল শক্তি। শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা বলে কিছুই নেই। আপনার প্রতিবেশীর উপর প্রতিপত্তি এবং অধিকার জমানোর জন্য আপনার জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা, আপনি জ্ঞানের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। এই জীবের জ্ঞান অর্জনের কোনওরকম আসক্তি নেই।'' হঠাৎ করে ইউ জী আবার তাঁর অতিপ্রিয় বিষয় টাকা নিয়ে কথা বলা শুরু করে দিলেন। ''টাকার সঙ্গে আনন্দের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু টাকা সহ দুঃখ-দুর্দশা, টাকা ছাড়া দুঃখ-দুর্দশার থেকে অনেক ভালো। যাদের টাকাপয়সা নেই, তারা প্রায়শই বলে থাকেন, 'এই যে এত সব ধনী লোক দেখছেন তারা কী সুখি!' তারা এইসব কথা বলেন, কারণ তারা ঈর্ষাপরায়ণ। নিজের অর্থাভাবকে মহান মনে করে স্বস্তি পাওয়ার জন্য তারা এসব কথা বলেন।'' ইউ জী বললেন।

সানেনে প্রবেশ করতে করতে একটা কথা আমার মনে এল। ''ধনী হতে গেলে যেমন দরকার টাকার, ঠিক তেমন সুখী হতে গেলে দরকার বন্ধুবান্ধবের (লোকজনের)।'' একথা তখন আমার খুব মনে ধরেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে এর উৎস হচ্ছে ঈর্ষান্বিত মন।

২৫ জুলাই ... ষোলো দিন

বাঃ! আমার বিছানা করাটা আজ দারুণ হয়েছে। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে কোনও কাজ করলে যে ফল পাওয়া যায়, তা আনমনা হয়ে অর্ধ-উৎসাহে বা আত্মমগ্ন হয়ে কাজ করার থেকে অনেক উচ্চমানের হয়। প্রতিটি কাজ করা উচিত প্রণয়পাশে আবদ্ধ

হয়ে যৌনমিলনের মতো মনোযোগ দিয়ে।

স্কটী স্কট, ওহাই-এর কাঠের মিস্ত্রি সবে দশদিন হল এখানে এসেছেন, যাকে দেখে মনে হত যেকোনও সময় মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারেন। গতকাল হঠাৎ জীবনরসে প্রাণবন্ত হয়ে এখান থেকে চলে গেলেন। (এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। তারা একসঙ্গে বার্নে রাত্রিযাপন করছেন। এরপর আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছেন।) আমার মনে হচ্ছে একদিন স্কটের জীবনী নিয়ে নিশ্চয়ই আমি একটা সিনেমা করব।

"চাওয়া এবং না-চাওয়া এ দুটোই 'আপনি', সেই চাওয়ার ভরবেগ কোনওদিন শেষ হবে না। ধ্যানের সমস্ত কলাকৌশলের মাধ্যমে যা আপনাদের বাজারের ধার্মিক লোকেরা এবং মানসিক চিকিৎসকরা আপনাদের শেখানোর চেষ্টা করেন, তাতে আপনার চাওয়া পাওয়া সাময়িকভাবে স্তিমিত থাকে, একটু দুর্বল হয়ে থাকে। কিন্তু সবকিছু পশ্চাৎপটে ভালোভাবে বসবাস করে। কোনও কিছু না চাওয়াটাও একটা চাহিদামাত্র। চাহিদার শেষ হল মৃত্যু! আপনি কি মৃত্যু চান? মনের চিরস্থায়িতাতেই আপনার একমাত্র আগ্রহ এবং চাহিদা," ইউ জী এসব কথা বললেন একদল প্রাক্তন রজনীশ ভক্তদের, যারা সবাই জার্মানির কোলন শহর থেকে এখানে এসেছেন তাঁর কথা শুনতে।

একটা কথোপকথন

মহেশ ঃ ইউ জী, আপনার কি কখনই একথা মনে হয় না যে আমার আপনার মত হওয়া উচিত বা অন্ততপক্ষে এখন আমি যা তার থেকে ভালো কিছু?

ইউ জী ঃ কখনই না।

মহেশ ঃ কিন্তু আমি তো সেটা সবসময় চাই। আমি আপনার মতো হতে চাই। কেন আমি আপনার মতো হতে চাই? বলুন, আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

ইউ জী ঃ আপনি বুঝতে পারছেন না। এটাই আপনার দুঃখের গল্প। সমাজ-সংস্কৃতির দমবন্ধকরা চাপ আপনার বিশেষত্বকে কিছুতেই বিকাশ হতে দিচ্ছে না। আপনি সবসময়, আপনি ঠিক যে রকম তার থেকে অন্য কিছু হতে চাইছেন। মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডে এই ঘটনাই ঘটে চলেছে। এই কারণে আমি বারবার বলি, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, সমস্ত স্কুল, সমস্ত কলেজ এবং সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যারা আপনাকে জোর করে একটা মহত্তর মানুষে

পরিবর্তিত করতে চাইছে, সেসব প্রতিষ্ঠান ঠিক অসামরিক বন্দিশিবিরের মতো। কিন্তু আপনাকে এই মানুষের তৈরি জঙ্গলে বেঁচে থাকতে হলে তাদের জগতের ভাষা শিখতেই হবে। অথচ আপনি যদি আপনার সন্তানকে এই সমস্ত বন্দিশিবির থেকে রক্ষা করার জন্য অন্য কোনও গালভরা নামের পরিবর্তিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে চান, যারা প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কথা বলেন তাহলে আপনি আপনার সন্তানের সর্বনাশ করবেন। আপনার ছেলেমেয়েদের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে কোনওকিছু শেখাবেন না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিযোগিতা জীবনের ঘটনা। আপনার ছেলেমেয়েদের এর মধ্যেই বসবাস করতে হবে, যুদ্ধ করেই বাঁচতে হবে এবং এর কোনও অন্যথা নেই। আপনি যদি সত্যিই তাদের ভালোবাসেন তাহলে তাদের জীবিকা অর্জনের সামগ্রী পেতে সাহায্য করুন। তারপর তাদের রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ান ...। সমাজের কাঠামোর অবশ্য একটাই আগ্রহ সবাই যেন সেই একরকমের ধাঁচে নির্মিত হয়। আমাদের সমাজ ব্যবস্থার এই কাঠামো এমন চাপের সৃষ্টি করেছে যেখানে আপনার স্বাভাবিকতা কিছুতেই প্রকাশিত হয় না।

রাতে আমি বোম্বেতে ফোন করে মুকেশের সঙ্গে কথা বললাম। গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম একটু নেশাগ্রস্থ। আমি অবাক হয়ে গেলাম একথা ভেবে, কীভাবে আমি মদের নেশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। কথা বলে মনে হল ও খুব খুশি। আমাদের নতুন চলচ্চিত্র ‘ক্রিমিনাল’ রিলিজ হচ্ছে। সিনেমা হলে পৌঁছবার আগেই টাকা রোজগার করে ফেলেছে। ভাগ্যবান ছেলে।

টেলিফোন বুথ থেকে থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় দেখা বব এবং পলের সঙ্গে। আমরা তিনজনে একটা মিষ্টির দোকানে বসে উন্মাদের মতো আলোচনা শুরু করলাম। ‘স্যালে সানবিমে’ কি ঘটনা ঘটেছে সেসব নিয়ে। আমরা সবাই এ ব্যাপারেই একমত যে ইউ জী যেসব কথা বলছেন আমাদের কাছে সেসবের কোনও অর্থ আছে বলে মনে হচ্ছে না। একটা অস্বাভাবিক কিছুর পূর্বাভাষ এবং ভীতি আমাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে বলে মনে হল।

পরে ববের ঘরে বসে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা ‘কমেন্টারিস অন লিভিং’ থেকে একটা জায়গা উচ্চস্বরে পড়তে লাগলাম, ‘‘কেমনভাবে এই ভয়ানক লোভী জিনিস যাকে বলে ‘অহং বা আমি’ তার আধিপত্য কৌশলে বজায় রাখে একথা বলে যে আমার ‘আমি’ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।’’ ইউ জী হঠাৎ ঝড়ের মতো আমাদের ঘরে ঢুকে

আমার হাত থেকে বইটা ছিনিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন, ‘‘এই ভদ্রলোক যা কিছু লিখেছেন তা তাঁর নিজের জীবনেই কাজ করেনি। কোনও ব্যক্তির মধ্যে যদি ‘আমি’ বলে জিনিসটা আর না থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি কোনওদিন তাঁর প্রিয় বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন করতে পারবে না, যা এই শঠের পক্ষে করা সম্ভব হয়েছে।’’

জাস্টিন লাজার্ডের সঙ্গে ফোনে কথা হল। তিনি একজন আমেরিকান অভিনেতা (জুলীর ছোট ছেলে) তার নতুন দূরদর্শন সিরিয়াল ‘সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্ট’ **১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫** সাল থেকে টিভি চ্যানেলে দেখা যাবে। জাস্টিন তার স্বপ্নের কথা আমায় জানালেন। তিনি স্বপ্ন দেখছেন যে তার টিভি সিরিয়াল পুরো ফ্লপ করেছে। ‘‘শুনুন এ ব্যাপারে আপনি শুধু একা নন জাস্টিন, প্রত্যেক মনোরঞ্জনের ব্যবসায়ীর ভেতরে এই একরকমের দুঃস্বপ্ন কাজ করে। একে সহজভাবে গ্রহণ করুন।’’ আমি তাকে বললাম। তিনি হাসলেন এবং স্বস্তিবোধ করলেন। চিত্ত বিনোদনের ব্যাবসা বিশ্বের সর্বত্র একধরনের।

আমরা সবাই মারিও’র বাসস্থানে তার রান্না ইতালিয়ান খাবার খেলাম। সিএনএন মারফৎ প্যারিসের পাতাল রেলে এক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা শুনলাম। মারিয়া এবং পল সেমপে খুবই মনঃক্ষুণ্ন। এই দুর্ঘটনায় ইউ জী-র মধ্যে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। শুধু তিনি বললেন, ‘‘আপনারা মানুষের জীবন সম্পর্কে কেন এই দুশ্চিন্তার নাটক করেন? যখন আমেরিকা দলবেঁধে মানুষ হত্যা করে তখন আপনাদের মধ্যে কি এই অনুভূতি জাগে? আপনারা সবাই মিলে কি করলেন ইরাকে? যে সমস্ত নেতারা স্বদেশ প্রেমের কথা বলেন, তারা কেন সপরিবারে যুদ্ধে যান না? যখন আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, আমি জুলিকে বলেছিলাম, ‘‘আমি দেখতে চাই আপনার দুই ছেলে এবং মেয়ের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লাশব্যাগে করে বাড়িতে আসুক। তখন আপনি বুঝতে পারবেন কোনও আদর্শের জন্য প্রাণ দেওয়া কি জিনিস। এই পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম প্রাণী। এরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করবে। কোনও শক্তির পক্ষে একে রোধ করা সম্ভব হবে না।’’ ঘরের মধ্যে এক গভীর স্তব্ধতা নেমে এল। কেউ কোনওরকম উচ্চবাচ্য করলেন না।

গেস্টাডে ট্রেন স্টেশনের পাবলিক টেলিফোন গুমটিতে আমি প্রতারিত হলাম।

আমি মিটারে পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিয়ে কথা বলা শুরু করি। যখন দেখলাম দু’ ফ্রাঙ্ক খরচ হয়েছে তখন ফোন রেখে দিলাম। কিন্তু মিটার আমায় আমার তিন ফ্রাঙ্ক আর ফেরত দিল না। পাহাড়ের উপর দিয়ে হাটতে হাটতে স্যালে সানবিমের দিকে এগোলাম। মনে মনে নিজেকে বললাম, “মিঃ ভাট, সৎভাবে ভাবুন, তিন ফ্রাঙ্ক অযথা হারাতে কোথায় যেন একটু লাগে, তাই না? এবার ভেবে দেখুন আপনার সর্বস্ব হারাতে কেমন লাগবে। মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ব্যাপারটা এরকম। আপনি কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত?” আমার সমস্ত সত্তা এ প্রশ্নকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেল।

একঘর ভরতি লোক, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ প্রাক্তন রজনীশ আশ্রমের সন্ন্যাসী, বব এবং পলের ভিডিও রেকর্ডিং দেখছেন। ইউ জী এবং দু-চারজনের একটা ছোটখাটো দলের মধ্যে উত্তপ্ত কথোপকথন, আমাদের সবার দৃষ্টি টিভি-তে নিবদ্ধ করে রেখেছে। এখন প্রায় সন্ধ্যা এবং বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। আমার মনে অতীতের সেই সময়ের কথা জেগে উঠছে যখন আমি আধ্যাত্মিকতার বিশাল বাজারে সচ্চিদানন্দের খোঁজ করে বেড়াতাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ইউ জী ঘরের এক অন্ধকার কোণে নিজের কথোপকথনের টেপ টিভিতে দেখছেন। দেখে মনে হল সম্পূর্ণ এক অপরিচিত মানুষ। তিনি তাঁর প্রতিমূর্তিকে টিভির পর্দায় চিনতে পারছেন বলে মনে হল না। ইউ জী বলে এই ভদ্রলোকটির গভীর সরলতা লক্ষ্য করাটাও এক হৃদয়-বিদারক অভিজ্ঞতা। রজনীশ এবং জে কৃষ্ণমূর্তির ভয়ংকর আত্মম্ভরিতা এবং বিশাল জাঁকজমকের সঙ্গে তুলনা না করাটা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। ওইসব লোকজন তাঁদের মহানতার ব্যাপারে কি অসম্ভব সচেতন ছিলেন!

২৬ জুলাই ... সতেরো দিন

“আসক্তি আমাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন আমরা নির্লিপ্ত হতে চাই। আসক্তির মধ্যে গলদটা কোথায়? চিরস্থায়িতা ঃ আমরা আমাদের আসক্তিকে চিরকাল ধরে রাখতে পারি না। এসব জানার পর, আমরা নির্লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করি এবং আসক্তি-নির্লিপ্ততা নাগরদোলায় চাপার মতন অবস্থা হয় আমাদের। এসব অত্যন্ত আকর্ষণীয় জিনিস, কারণ সবসময় আপনাদের মনে হয় যে আসক্তি প্রযুক্ত দুঃখ এবং বেদনার মুশকিল আসান মন্ত্র আপনাদের করায়ত্ত হচ্ছে। তারপর আপনি বন্ধন মুক্তির ধারণায় আসক্ত হয়ে পড়েন এবং সারাজীবন ধরে এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করার প্রয়াস করতে থাকেন,” ইউ জী বলেন। আমি আমার ভোরের কফির সুবাস পাচ্ছি।

এখানে মাছির উপদ্রব খুব বেড়েছে। সুইজারল্যান্ডের মাছিগুলো খুব মোটাসোটা, বিশেষ করে আমাদের দেশের মাছির তুলনায়। ‘‘সুইস লোকেরা এখানকার ঘাসে গোবর ছড়ায়, তারা রাসায়নিক দ্রব্যমিশ্রিত সার ব্যবহার করতে নারাজ। এই কারণে এখানে এত মাছির উপদ্রব।’’ ইউ জী আমাদের ব্যাখ্যা করলেন। ‘‘আপনার চেয়ে তাদের এখানে থাকার অধিকার অনেক বেশি।’’ ‘‘সুপ্রভাত ইউ জী এবং মন্তব্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।’’ আমি জানালাম। আমাদের এই কথোপকথন ভোরবেলার প্রথম আধঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়। ঘড়িতে দেখলাম সাতটা বেজে দু’ মিনিট হয়েছে।

‘‘প্রথমে যোগাযোগ স্থাপন, মেক্সিকোতে বিশ্ব পূর্ণমিলন কেবলমাত্র পূর্ণজ্ঞানীদের জন্য; হেরমেটিক সংস্থা ২৪ জুন, ১৯৯৬ (স্যান হুয়ান দিবস); ইগো সুম কই সুম, ইউ জী-র উদ্দেশ্যে লেখা একটা ইলেকট্রনিক মেইল কম্পিউটার পড়ে শোনালেন জুলী। ‘এতো সবে শুরু’, বললেন ইউ জী। ‘‘আরও কত রকমের পাগলামি দেখবেন সেটা ধারণা করতে পারছেন না।’’

ইউ জী, পল সেমপে, গটফ্রিড এবং আমি গাড়ি চালিয়ে থুনে এলাম মধ্যাহ্নভোজন করতে। আজকের দিনটা উজ্জ্বল, পরিষ্কার এবং গরম।

‘‘পিকাসোর মধ্যে একটা অদ্ভুত সাহস ছিল, তাই তিনি শিল্পকলার গতানুগতিক প্রচণ্ড চাপকে অগ্রাহ্য করে ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এজন্যই তার কাজের মধ্যে একটা ভিন্ন ধরনের নিজস্বতা অনুভব করা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার কাজকর্ম আধুনিক শিল্পীদের কাছে একটা বড় প্রতিবন্ধক। তারা পিকাসোর প্রভাব থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছেন না। নিজেকে ঠিক নিজের মতো প্রকাশের জন্য, আপনাকে অন্যের কাঠামোর নমুনা পরিত্যাগ করতেই হবে।’’ আমাদের কোনও এক বিশেষ ব্যাপার ভালো করে বোঝানোর জন্য ইউ জী দারুণ উদ্দীপনার সঙ্গে এসব কথা বললেন।

থুন খুবই আকর্ষণীয় শহর। আমরা পায়ে হেঁটে একটি বড় সেতু অতিক্রম করলাম। সেতুটির দু’ধারে পায়ে চলা রাস্তার পাশে পাশে নানা রঙের ফুলের ঝাড়। সেতুর নিচে নীল রঙের পরিষ্কার জলের নদী উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছে, আমাদের পায়ের ঠিক কয়েক হাত নীচ দিয়ে। আমার মতন বড় শহরে যার শৈশব কেটেছে সেরকম এক বালকের পক্ষে এ জায়গায় সত্যিকারের মানসিক উত্তরণের অভিজ্ঞতা হয়।

'বায়ো–পিক' থুন শহরের একটি নিরামিষ রেস্টুরেন্ট। এই শহর সুইজারল্যান্ডের জার্মান ভাষীদের এলাকায় অবস্থিত। এই দেশে ফরাসি ভাষীদের তুলনায় জার্মান ভাষীদের এলাকায় বেশি নিরামিষ রেস্টুরেন্ট পাওয়া যাবে। আমরা যে রেস্টুরেন্টে গেলাম, সেটা প্রায় ফাঁকা। গটফ্রিড, পল এবং আমি স্যালাড বার থেকে নিজেরাই নিজেদের খাবার নিলাম এবং ইউ জী রোস্টি'র (এক ধরনের আলুভাজা) অর্ডার দিলেন। তাঁর নজর পড়ল টেবিলের উপর থালা রাখার জন্য কাগজের 'টেবিল ম্যাটের' উপর। যেটা একটু আগেই পরিচারিকা রেখে গেছেন। এতে একটি সুন্দরী মেয়ের ছবি আছে, মেয়েটি একটি ঝকঝকে জলের বোতলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ঘাঘরা তুলছে। সুইজারল্যান্ডের এক মিনারেল ওয়াটার 'হেন্নিয়েজ'–এর একটা বিজ্ঞাপন। ''দেখছেন তো এটা কি অবাস্তব ব্যাপার? গতকাল আমেরিকার টিভি চ্যানেলে সিএনএন–এ দেখাচ্ছিল আমেরিকার লোকজন ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পর্নোগ্রাফি প্রবেশ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল। আর এখানে জলের বিজ্ঞাপনে, কীভাবে যৌনতাকে ব্যবহার করছে, প্রকৃতপক্ষে সকলেই যৌনতাকে ব্যবহার করে টাকা কামাচ্ছে, কিন্তু একই সঙ্গে আবার সেই যৌনতাকে নিন্দা করছে। কিন্তু কেন?'' জিজ্ঞাসা করলেন ইউ জী। ''সত্যি কথা, এমনকী যে লোকটা যৌনতাকে নিন্দা করছে, সেও তার মাধ্যমেই টাকা রোজগার করছে। তাই নয় কি?'' তার সঙ্গে সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিলাম আমি।

বুড়ো বয়সে ইউ জী–র মধ্যে জটিল রসবোধ দেখা দিচ্ছে। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে উঠতে যাচ্ছি, তখন ইউ জী এক বিরল রসপূর্ণ মন্তব্য করলেন ঃ ''গটফ্রিড, রেস্টুরেন্টে খাওয়ানোর জন্য ধন্যবাদ, পল সেমপে, গাড়ি চালানোর জন্য ধন্যবাদ এবং মিঃ ভাট, আপনার সুখদায়ক সঙ্গদানের জন্য ধন্যবাদ।'' এরপর তিনি বিপদজনকভাবে আমার অত্যন্ত কাছে এসে কানে কানে দুষ্টুমিতে ভরা অঙ্গভঙ্গি করে বললেন, ''প্রিয় পরিচারিকা, বিনামূল্যে স্তনপ্রদর্শনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।'' সাতাত্তর বছর পার করে আটাত্তর বছরে পা দেওয়া একজন বৃদ্ধ মানুষের কাছ থেকে এ মন্তব্য কিছুতেই আশা করা যায় না।

কিছুক্ষণ পরে আমরা যখন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছি, তখন ইউ জী বললেন, ''সেই স্তনযুগলের আন্দোলন আমার সমস্ত মনোযোগ অধিকার করেছিল। এরপর যখন মনে প্রশ্ন জাগল তখন জ্ঞানের মাধ্যমে উত্তর এল 'স্তন' সঙ্গে সঙ্গে

সব শেষ। আমার কোনও সহযোগ ছাড়া এ জিনিস মনে মনে কখনও বাড়তে পারে না। 'সুখ চাহিদা' আমার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। যখনই আমি অন্যদিকে তাকাই, এদিকের সবকিছু মুছে যায়।'' আমি বুঝতে পারলাম না তিনি কি বলতে চান। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''আপনি বলতে চান যে সেই স্তনের প্রতিচ্ছবি আপনি আর মনে করতে পারেন না?'' ''না, আমি মনে করতে পারি না।'' ইউ জী উত্তর দিলেন। ''আমি বেশ পারি!'' আমি প্রত্যুত্তরে জানালাম। ''এটাই আপনার জীবনের দুঃখজনক কাহিনি। সেই প্রতিচ্ছবি নির্মাণের যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যদি চলে যায়, আপনিও সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন। আপনি এই মুহূর্তে এই স্থানে শারীরিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন।''

আমরা গাড়ি করে গেস্টাডে ফিরছি। এখন বেশ ভালো গরম। পল হঠাৎ একটি মোড় ঘোরাতে গিয়ে গাড়ির গতিবৃদ্ধি করে দিলেন। ইউ জী একটু হতচকিত হয়ে জেগে উঠলেন। কিছুক্ষণ আগে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ''আপনার ঘুমে ব্যাঘাত করলাম ইউ জী, দুঃখিত।'' শ্রুতিমধুর ফরাসি ধাঁচের ইংরেজিতে বললেন পল সেমপে। তার মুখের হাসিতে আছে এক অদ্ভুত সুন্দর বালক–সারল্য। ''না না, আপনি আমার ঘুমে কোনও ব্যাঘাত ঘটাননি। এই শরীরটা প্রতি অবস্থায় তার প্রতিবেদন জানায়। আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে, কোনওরকম বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে মনে করে। এই দেহ আমাদের সমাজ সংস্কৃতি সৃষ্টিকারী জঘন্য 'বুদ্ধির' থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। এই শরীর শুধু তাকে সুরক্ষিত রাখতে এবং তার মতো আর একটা সৃষ্টি করতে আগ্রহী। আর অন্য কোনও কিছুতে এর কোনও আগ্রহ নেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ যৌনপ্রক্রিয়াকে সুখভোগের প্রধান সামগ্রীতে পরিণত করে আপনারা সবকিছু তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। এই শরীর আপনাদের কলা, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, লিখন বা ধর্ম কোনও কিছুতেই আগ্রহী নয়।''

২৭ জুলাই ... আঠেরো দিন

আজ গেস্টাডে আমার অষ্টাদশ প্রভাত। ''আপনি অন্ধকারে বসে আছেন,'' ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন ইউ জী। তারপরে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন যথারীতি তাঁর প্রাতঃরাশ এবং আমার কফি তৈরি করার জন্যে।

আমি খাবার টেবিলে বসে পেয়ালা থেকে চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছি। আর তার প্লাস্টিকের চামচের শব্দ, প্লাস্টিকের বাটির নিচের মৃদু আঘাতের শব্দ শুনছি। তিনি

তাঁর হালকা প্রাতঃরাশ গ্রহণ করছেন। কাগজের রুমাল দিয়ে তাঁর ঠোঁট পরিষ্কার করার শব্দ একটানা স্তব্ধ মুহূর্তকে মাঝে মাঝে ছিন্ন করছে। এমনকী শব্দ শোনাও আনন্দ উপভোগের কাজ। বিশেষ করে স্তব্ধতার আওয়াজ শোনার কাজ। ইউ জী এখন রান্নাঘরে তাঁর বাটি এবং চামচ ধুচ্ছেন। ''প্রত্যেকটি কাজ অন্য কাজের থেকে স্বতন্ত্র। মানুষের মন এসবের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে।'' ইউ জী–র কথাগুলো যেন আমার অন্তরে কানে কানে বলে গেল। এই মন্তব্যের সত্যতা যেন ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। তিনি কল বন্ধ করে জল পড়ার শব্দ বিচ্ছিন্ন করে চলে গেলেন। সিঙ্কের তলায় নলের মধ্যে জলপড়ার শব্দ মিলিয়ে যাওয়া শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে এ যেন রবিশঙ্কর বা বেঠোফেনের সংগীতের থেকেও অনেক বেশি শক্তিময়।

''কোনও কিছু শোনা মানে কথা বলা। এমনকী কোনও কিছু দেখাও কথা বলা। আপনি ভেতরে ভেতরে সবসময় কথা বলে চলেছেন। কিছুর নাম না জানলে তাকে চেনা অসম্ভব। বাইরের আন্দোলনগুলোকে চিনে, যখন বলছেন 'শব্দ' সেটাই আপনি,'' বললেন ইউ জী যখন আমি তাঁকে আমার ভোরের অভিজ্ঞতার কথা বললাম। ''তাহলে এই যে আপনি যাকে আমি বলি 'আমি' শুধুমাত্র একটা সাউন্ড ট্র্যাক?'' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি যা বলছেন তাতে আমি হতভম্ব হয়ে যাচ্ছি। ''সেটাই সব; আর সেসব জিনিস সমাজ–সংস্কৃতি আরোপ করেছে ... আপনি এর উপর শ্রেণিবিভাগ করে অসহায় লোকদের জোর করে মানতে বাধ্য করেছেন। ধর্মীয় ভজনের সঙ্গে রক মিউজিকের কোনও পার্থক্য নেই। এমনকী পঠন–পাঠনের মাধ্যমেও আপনি কি করেন জানেন! আপনি আপনার মস্তিষ্কে নতুন নতুন শব্দ আরোপ করেন, নতুন শব্দসকল আপনার কাছে অধিকতর আকর্ষণীয়। পুরানো জিনিসের মধ্যে নতুন একটা ভাঁজ – এই সবই আপনারা চান ... আপনি যা কিছু লেখেন সব মিথ্যা।''

দিনের শেষে ইউ জী তাঁর সঙ্গে জে কৃষ্ণমূর্তির একটা সাক্ষাতের ঘটনা আমাদের বললেন ঃ কৃষ্ণাজী এবং ইউ জী মাদ্রাজে সমুদ্রের পাড়ে হাঁটতে যেতেন। এক গরিব অল্পবয়সি ছেলের সঙ্গে তাদের দেখা হল। সে ভিক্ষা করছিল। কৃষ্ণাজী তাকে একবার আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন। কিন্তু কোনও টাকাপয়সা দিলেন না। ইউ জী তখন বললেন, ''কৃষ্ণাজী এর কোনও প্রেম আলিঙ্গনের প্রয়োজন নেই, এর প্রয়োজন টাকার।'' কৃষ্ণাজী উত্তরে বললেন, ''এই আলিঙ্গন তার ভিক্ষার নিবৃত্তি

করবে।'' ইউ জী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ''আপনি আপনার সব টাকা বাজি ধরতে রাজি? আগামীকাল এই ছেলেটি ঠিক এইখানে, এই সময়ে একইভাবে ভিক্ষা করতে আসবে।'' পরেরদিন ইউ জী যা বলেছিলেন ঠিক তাই হয়েছিল।

আমি আমার টিকিট পরিবর্তন করে লন্ডন হয়ে ফেরা ঠিক করলাম। আমার এথেন্স-এ সিনেমার শ্যুটিং করার ঠিকমতো জায়গা খোঁজার কাজ আপাতত বাতিল হয়ে গেছে। টিকিট কেটে ফেরার পথে ক্রেডিট সুইস ব্যাংকের সামনে ইউ জী, পল এবং লিসার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ইউ জী তাঁর ডঃ শেষগিরি রাও'র লেখা সদ্যপ্রাপ্ত একটি পত্র উচ্চস্বরে পড়ে শোনাচ্ছেন। চিঠিতে তিনি ইউ জী-কে ব্যাপক প্রশংসা করেছেন। ডঃ রাও এতদিন পর্যন্ত ইউ জী-কে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি ইউ জী-কে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেননি। কারণ ইউ জী তার বোন অর্থাৎ ইউ জী'র স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন বলে।

বব, পল এবং আমি ইউ জী-র সঙ্গ ক্ষণিকের জন্য পরিত্যাগ করে গেস্টাডের ট্রেন স্টেশনের উপর একটা কাঠের বেঞ্চে এসে বসলাম। ইউ জী-র সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভেতরে যে সমস্ত চিন্তাভাবনা উদ্বেলিত হয় তাকে মুক্ত করতে এখানে বসা। কারণ এই অবস্থা যেমন উন্মাদবৎ, তেমনই স্বস্তিদান করে। আমরা তিনজনেই এ ব্যাপারে একমত যে আমাদের প্রায়শই এমন মনে হয়, বিশেষ করে যখন ইউ জী কোনও কিছু জোর দিয়ে বলেন, যেন আমরা একটি বদ্ধ উন্মাদনার সম্মুখীন। স্যালে সানবীম এবং ইউ জী-র সঙ্গ থেকে এই ছোট ছোট বিরতিগুলো যেন বিশেষ কিছু কাজ করে। এই মানুষটির সঙ্গে একটানা বসবাস করা একদম অসম্ভব।

মধ্যাহ্নভোজনের সময় ইউ জী হ্যারি ডেককে যে ডালটুকু বেঁচেছিল তা শেষ করে দিতে বললেন। এই ভদ্রলোক ল্যাঙ্কেস্টার, পেনসিলভেনিয়াতে থাকেন। পেশায় মেথর। আগে মেহের বাবার ভক্ত ছিলেন, বর্তমানে ইউ জী-র বিশেষ বন্ধু। হ্যারি ইউ জী-র বিশাল হৃদয়ের অত্যন্ত প্রশংসা করে বললেন, ''যখন থেকে আপনার হাতের 'হৃদয়রেখা' উন্মুক্ত হয়েছে, তখন থেকে আপনার সঙ্গ যেন আরও আনন্দদায়ক হয়েছে।'' ইউ জী হ্যারিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ''হ্যারি, আপনাকে খেতে অনুরোধ করার একমাত্র কারণ হল থালা-বাসনগুলো পরিষ্কার করা যাবে; খাদ্যসামগ্রী রান্নাঘরের জঞ্জালপাত্রে যাওয়ার থেকে, এই জঞ্জালপাত্রে যাওয়া অনেক

ভালো'' (হ্যারির উদরকে দেখালেন)।

তারপর হঠাৎ তিনি জুলীকে আক্রমণাত্মক সুরে বললেন, ''আপনি এখান থেকে এক্ষুনি চলে যান। আপনি আপনার পরিত্যক্ত জিনিসপত্র এখানে রাখা বন্ধ করুন। আমি চাই না এখানে কোনও কিছু জমতে থাকুক। আমি লোকজনকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দিই। আমি আমার স্ত্রী, পুত্র–কন্যা এবং সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছি। আপনি কি ভাবছেন, এই যে অল্পমূল্যের দ্রব্যাদি কিনে আপনি জড়ো করেন সেসব আমি আপনাকে এখানে রাখতে দেব? এই যে এখানে আপনি আঠার কৌটো, ওখানে এক প্যাকেট ঘন দুধ – এসব আমার চোখের সামনে থেকে এক্ষুনি সরিয়ে ফেলুন। কই, আপনি তো কখনও আপনার টাকাপয়সা এখানে রেখে যান না। রাখেন? যখন টাকার কথা ওঠে তখন আপনি কুকুরীর মতো হয়ে যান ...।'' ঘরটা যেন এক সাঙ্ঘাতিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়েছে।

আমাদের বহু পুরানো বন্ধু চিত্রকর গডফ্রিড মায়ার এবং ইউ জী একদিন গেস্টাডের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গডফ্রিড ট্রাফিকের ধোঁয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য জানালা বন্ধ করতে করতে বলেছিলেন, ''দেখুন ইউ জী, এত গাড়ি চলছে রাস্তা দিয়ে, কীভাবে এরা পরিবেশকে দূষিত করছে।'' ''গডফ্রিড আপনার গাড়ির কথা ভাবুন। এ এখানে কি করছে? এও কি এখানে পরিবেশ দূষণ করছে না?'' এরকমভাবেই ইউ জী সবসময় আমাদের হাতেনাতে দেখিয়ে দেন আমাদের নিজেদের রূপটা, বিশেষ করে আমরা যখন নিজেদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ভাবি, এমন একটা ভান করি যেন আমরা অন্যদের থেকে উচ্চমানের কিছু একটা।

সন্ধ্যার শেষে কথোপকথনের কিছু অংশ ঃ

''সমস্ত পরিণতি নির্বিশেষে আপনার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো হিম্মত নেই। আপনিই আপনার 'ডেস্টিনি'র রূপকার এবং নিজের ভাগ্যের নির্মাতা – একথাই আমি দৃঢ়বিশ্বাস করি। যেইমাত্র আপনার জীবনে একজন মহিলার আবির্ভাব ঘটল বা পুরুষের – আপনার জীবনেও কম্প্রোমাইজের শুরু হয়ে গেল। এখান থেকেই শেষের শুরু।''

সারাদিনের ঘটনাবলীর সমন্বয় করে বব মন্তব্য করলেন, ''আজ আত্মহত্যা করার জন্য একটা সুন্দর দিন,'' আমরা হাসলাম। কিন্তু তার মন্তব্য কোনওকিছু

হালকাভাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করল না।

২৮ জুলাই ... উনিশ দিন

স্মৃতি হল কেটে যাওয়া দিনগুলোর অবশিষ্টাংশ। এসব আপনাকে দমবন্ধ করতে থাকে, অবশেষে জীবন্ত মুহূর্তগুলোকে গভীর নিঃশ্বাসে উপভোগ করার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আমি কি মৃত অতীতের পুনরাবর্তন এবং মানবজাতির কোটি কোটি গতকালের অনন্ত প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু?

আজ আমাদের পরস্পরের সুপ্রভাত অভিবাদনের সমাপতন হল। ইউ জী জানালার দিকে তাকিয়ে 'আজ বৃষ্টি হচ্ছে ...' বলে আমার উনিশতম কফি বানাতে এগিয়ে গেলেন। নতুন ফ্যাক্স মেশিন আনা হয়েছে। সেটা চালু হওয়ার আওয়াজে আমাদের নিস্তব্ধ ঘর মুখরিত হয়ে উঠল। ইউ জী এই নতুন যন্ত্রের ব্যবহার শেখার প্রচেষ্টা করছেন। তিনি 'কম্পিউটার উইজার্ড' ন'বছরের ছেলে কিরণের থেকে পাঠ গ্রহণ করছেন। কিরণ, নারায়ণমূর্তি এবং ওয়েন্ডি'র পুত্র। ''আমাকে এই যন্ত্র ব্যবহার করাটা তোমাকেই শেখাতে হবে'' অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন ইউ জী এবং আর একটা বাক্য জুড়ে দিলেন, ''আমি কিন্তু খুব খারাপ ছাত্র।''

কোনও কিছু গ্রহণ করার আগে নিজেকে রিক্ত হতে হবে। আমার কানের কাছে মাছির ভনভন শব্দ আমার শারীরিক অবস্থান কেউ দখল নিচ্ছে বলে মনে হল। এক বালকসুলভ বিস্ময় আমার সমগ্র অস্তিত্বকে গ্রাস করে রেখেছে। ''মনের শূন্য অবস্থার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা একমাত্র সম্ভব ওই সব তথাকথিত ধার্মিক লোকদের বিবরণের মাধ্যমে। আপনি যা জানেন না তাকে অভিজ্ঞতার আওতায় আনা একেবারেই অসম্ভব। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে আপনার তথাকথিত শূন্য মনের মধ্যে একজন বসে আছে যে বলছে আপনার শূন্য মনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে?'' অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন ইউ জী।

শূন্যমনের অভিজ্ঞতা মনে করে যে উপভোগ হয় তার সঙ্গে মনোরম সহবাসের কথা মনে পড়ার আনন্দের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

জুলী আসার সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রভাত যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ''জুলী, আপনি কেন এখানে এসেছেন?'' ঘরে পা রাখতে না রাখতেই ইউ জী চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন। ''আমি জানতে এসেছি আমার সঙ্গে এখানে কেউ জেনিভা যেতে চায় কিনা,'' যদিও তিনি জানেন তার এই মিথ্যা অজুহাত এখানে কাজ

করবে না। ‘‘আমার সঙ্গে এই কপট খেলা বন্ধ করুন, জুলী।’’ একথা বলে ইউ জী যেন জ্বলে উঠলেন। ইউ জী-র আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য জুলী তড়িঘড়ি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইউ জী অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে আবার বলে উঠলেন, ‘‘আমার জন্য এখানে আপনাকে কোনও কিছু আনতে হবে না।’’ বুঝতে পেরেছিলেন জুলী রান্নাঘরে কিছু রাখছেন। জুলী যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে উত্তর দিলেন, ‘‘ময়লা ফেলার কয়েকটা ব্যাগ এনেছিলাম ...।’’

‘‘আপনি কেবল তাই আনতে জানেন, ময়লা রাখার ব্যাগ। টাকাপয়সা কোনওদিন আনবেন না ...। এখান থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যান।’’ চিৎকার করে আদেশ দিলেন ইউ জী। ‘‘আমি কি করেছি?’’ আবার জিজ্ঞাসা করলেন জুলী। ‘‘আমি চাই এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান, ব্যাস। আপনি কি করেছেন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু আপনি যে ধরনের মানুষ, তাতে আমার ঘৃণাবোধ হয় এবং আপনি পরিবর্তিত হোন এমন প্রত্যাশাও আমি করি না। যে মানুষের টাকাপয়সার ব্যাপারে এমন ধ্যানধারণা তার এখানে কোনও স্থান নেই।’’ একথা বলে ইউ জী প্রায় জুলীকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। জুলী অগত্যা চলে গেলেন। আমার তথাকথিত শূন্য মনে ইউ জী বিস্ফোরণের প্রত্যাঘাত অনুরণিত হতে লাগল।

নতুন ছবির কথোপকথন নিয়ে কাজ করতে আজকাল আমার খুব মজা লাগছে। এ কাজ আমার ভীষণ সহজ বলে মনে হচ্ছে। ‘‘কিন্তু আপনি কি জানেন কেন?’’ একগাল দন্তহীন হাসি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন বব কার। (এক সময় বব হলিউডের মনোরঞ্জনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, পরবর্তীকালে ছোটখাটো এক গুরুতে পরিণত হন এবং ইউ জী-র সঙ্গে সাক্ষাতের কিছুকাল পরে সবকিছু পরিত্যাগ করেন।) আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, ‘কেন?’ উত্তরে বব বললেন, ‘‘কারণ আপনি একাজ মনপ্রাণ দিয়ে করতে চান বলে।’’

কোনও আনন্দ চিরস্থায়ী করতে চাওয়া এক নিদারুণ বেদনা। আমাদের সমস্ত দুর্ভোগের কারণ হল জীবনকে জোর করে বৃদ্ধি করতে চাই বলে। আমাদের হওয়া উচিত ছিল আরও সব জন্তু-জানোয়ারের মতন – দশ, কুড়ি বছর আয়ু, ব্যস! ‘‘আপনার মৃত্যু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হবে পল,’’ বললেন ইউ জী। ‘‘এত সব নিয়মিত দৌড়ঝাঁপ, আপনার সব যোগাভ্যাস, সকালবেলা হাঁটাচলা, এত রকমের স্বাস্থ্যকর খাদ্য, কোনওকিছুই আপনাকে চিরস্থায়ী করতে পারবে না।’’ পল সেমপে, ৭৩

বছর বয়সের অবসরপ্রাপ্ত মার্সালেজ জাহাজের ক্যাপ্টেন, নিজেই নিজেকে ইউ জী–র গ্রীষ্মকালীন গাড়িচালক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। তিনি দার্শনিক দেকার্তের ভক্ত এবং গান্ধীজিকে খুব ভালোবাসেন। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে যে তিনি কীভাবে হাসিমুখে ইউ জী–র সমস্ত গালাগাল হজম করেন। তবে খুব কাছ থেকে দেখলে বোঝা যাবে, ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ভাঙতে শুরু করে দিয়েছে।

‘‘আপনারা কেন একজন নেশাখোরকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করেন, অথচ ধ্যানের কৌশলে আনন্দ পাওয়া লোকদের কি একটা হাতিঘোড়া বলে ভাবেন। ড্রাগ এবং অ্যালকোহল যে শরীরকে ক্ষতি করে সেসব মাপা যায় এবং শরীরকে পুনরুদ্ধার করা যায়। অথচ দীর্ঘদিন ধ্যান করলে যে ক্ষতি হয় তা মাপাও যায় না এবং তাকে ঠিক করাও যায় না। আমি লোকজনের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করি তা যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে অবশ্যই আপনি এখান থেকে চলে যেতে পারেন। জুলীকে আমার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাকে তার প্রয়োজন আছে। আপনাদের সকলের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক আছে তা পুরোপুরি একতরফা। আপনারা পরস্পরের সঙ্গে যে সম্পর্কের খেলা করেন তাতে দুজনের যে ভূমিকা আছে তাতে একজনের যখন অন্যকে বেশি প্রয়োজন, তখন অন্যজন বেশি নিয়ন্ত্রণ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে এসব খেলা চলবে না। আমার সঙ্গে কোনওরকমের সম্পর্ক স্থাপন করা অসম্ভব। এই সম্পর্কের খেলা আরও নোংরামিতে পরিণত হয় যখন যৌনতা এসে পড়ে। আপনি সেটা খুব ভালো করে জানেন ...’’ রাত নেমে আসার মধ্যেই ইউ জী এসব কথা বললেন।

২৯ জুলাই ... কুড়ি দিন

ফিরে আসার দিন গোনা শুরু হয়ে গেছে। আর মাত্র ন’টা দিন বাকি আছে। আশা করি তখন আমি এই জায়গা থেকে চলে যেতে পারব। সুদূর অতীতের গন্ধ এবং শব্দ তীব্র বেগে অন্ধকার পরদা ভেদ করে আমার শূন্য মস্তিষ্কে বয়ে চলেছে।

আর একটা দিন শুরু হল। মানুষে কেন এত লেখালেখি করে? প্রকৃতপক্ষে কেন তারা আদৌ লেখে? তাহলে কি তারা অত্যন্ত একাকী এবং অনুশোচনায় ভরপুর? অথবা এর কারণ হল লেখার মাধ্যমে মন চেষ্টা করে সেসব জিনিসকে ধরে রেখে চিরকালের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে, যখন সে জানে যে সেসব আসলে

হারিয়ে গেছে। লেখা মানুষের চিরস্থায়িতার অনুসন্ধান মাত্র।

হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর তলিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলো ধীরে ধীরে কবর থেকে উঠে এসে নিজেরাই লিখতে শুরু করে। আমি আমার চিত্র কথোপকথনের উপর একটানা কাজ করে চলেছি, প্রতিটি দৃশ্যে নিজের সব কিছু ঢেলে দিয়েছি।

''সমস্ত বোঝাবুঝি আপনারই। লেখার প্রক্রিয়া আপনি যে পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হতে চান তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। আপনি শুধু যে রংগুলো ছিল, তাদের মিশিয়ে মিশিয়ে নতুন রং সৃষ্টি করে চলেছেন। যদি ওই তথাকথিত নতুন এবং মৌলিক রংগুলো আবার ভাঙতে শুরু করেন তাদের আদি সংগঠনের মূল উপাদানে, তাহলে দেখতে পাবেন আপনি সবকিছু প্রকৃতি থেকেই নকল করছেন। যাই হোক এগুলো সবই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। আসল সত্য হল আমাদের চোখ দুটো কোনও রং দেখতে পায় না। এবং রং ছাড়া সবকিছু সাদা-কালো সেও সত্য নয়'' বললেন ইউ জী। তাঁর বিস্ময়জনক মন্তব্যে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ''তাহলে জিনিসটা কি?'' ''সেসব আপনি কোনওদিন জানতে পারবেন না।'' একথা বলে ইউ জী আলোচনার সমাপ্তি ঘটালেন।

সকালের শেষে যখন গেস্টাডের রং-বেরং উপত্যকার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হল, তখন ইউ জী-র স্বর আমার ভেতর যেন বজ্রধ্বনিতে পরিণত হল। আমি কি তৈরি? ইউ জী যা বলেছেন তা স্বীকার করতে? কিছুতেই না। যদি আমি পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করি তাহলে তার ফল আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে। এই যে পেন দিয়ে কাগজে লিখছি এই প্রক্রিয়া পর্যন্ত পাথরের মতো নিথর হয়ে যাবে। কোনও সাদা কাগজ থাকবে না যার উপর লেখা যায়, কোনও কালো কালি থাকবে না, যা দিয়ে লেখা যায়, কোনও আলো থাকবে না, কোনও অন্ধকার থাকবে না। শব্দগুলো যেন হৃদয়বিদারকভাবে এলোমেলো এবং অবোধ্য। যে কাজের জন্য তাদের অস্তিত্ব সেকাজেই তারা অপারগ – তা ভাবের আদান প্রদান।

আমার এই দিনলিপি একজন চিত্রনির্মাতার অনুতপ্ত আত্মজীবনী বলা যেতে পারে। হয়তো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবয়সের বিরতি এবং প্রতিফলন। এই ছেচল্লিশ বছর বয়সে অসহায়ভাবে বুঝতে পারছি যা ভেবেছিলাম সব ভুল। এখন যখন পিছনের দিকে তাকাই, তখন মনে হয় নিজের অতীতকেই আর পড়তে পারছি না। গেস্টাডে থাকাকালীন মনে হচ্ছে অতীত যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে সেগুলো নিজে

নিজে পরিষ্কার করে সারাবার এক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই লেখার মাধ্যমে আমি নির্দয়ভাবে জৈবিক প্রক্রিয়ার এক ফাঁদ যাকে বলে জীবন তাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি এবং এরই একটা অংশ আমরা, মানুষরা চিরকাল ধরে এক অদ্ভুত সংকটের মধ্যে পড়ে থাকি, কারণ জীবনের ঘাত–প্রতিঘাতে আমাদের মধ্যে এক রাসায়নিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বলে।

... যখন আমি ইউ জী নামের এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি এবং ধারণা করার চেষ্টা করি তখন মনে হয় একটা ছোট আলো নিয়ে আমি সূর্যকে দেখতে এসেছি।

৩০ জুলাই ... একুশ দিন

নিউ ইয়র্ক টাইমস–এর পুস্তক নিরীক্ষণ এবং সমালোচনা পড়ছি। একটা বই সম্পর্কে লেখা হয়েছে তার নাম 'দ্য এনজিন অফ রিজন, দ্য সিট অফ দ্য সোল'। এই বইটা মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে এক দার্শনিক ভ্রমণ। পল এম চাটল্যান্ডের লেখা। দর্শনের উপর এই কাজটির মাধ্যমে লেখক অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য সহযোগে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে মানুষের মন তা যতই ব্যক্তিগত বলে মনে করা হোক না কেন, একে মস্তিষ্কের যান্ত্রিক কার্যপ্রণালীতে রূপান্তরিত করা যাবে। ''এই বই আরও বেশি করে একথাই প্রমাণ করে যে দার্শনিকরা তাদের বোঝাপড়ার শেষ প্রান্তে এসে বিজ্ঞানের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর মধ্যে তাদের তথ্যের প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যা কিছু আপনি দেখছেন তাই আপনাকে যার দিকে তাকিয়ে আছেন তার থেকে বিভক্ত করে দিচ্ছে। এবং এটা আপনার জ্ঞানের একটা প্রেক্ষণ মাত্র। যিনি বই লিখেছেন তিনি একজন মেটাফিজিসিয়ান। নতুন বিজ্ঞানভিত্তিক শব্দ প্রয়োগে তিনি নিজেকে এবং পাঠকদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে তাঁর অসাধারণ একটা অন্তর্দৃষ্টির প্রাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি এসব গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি না। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এসব বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্বকথা, একটা নতুন খেয়াল ছাড়া আর কিছুই না। লোকজন এসব কেনে, ঠিক যেরকম তারা নতুন ধাঁচের দাদুমার্কা জামা কেনে বা নতুন মডেলের গাড়ি কেনে সেরকম। তারা এসব করে নিজেদের বলার জন্য যে তারা সমসাময়িক চিন্তাভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যা কিছু আপনি লেখেন, যা কিছু আপনি শিক্ষা দেন সব কিছু ব্যবহারিক। যে জগৎ আপনারা তৈরি করেছেন

সেখানে ব্যবহার করার জন্যই সমস্ত শিক্ষা–দীক্ষা এবং তার প্রয়োগ। এবং এসব কিছুই প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।'' চাটল্যান্ডের পুস্তককে ধরাশায়ী করে উত্তর দিলেন ইউ জী।

যা কিছু আপনি ইউ জী নামক এই অগ্নিতে সমর্পণ করবেন সবকিছু জ্বলে ভস্ম হয়ে যাবে। যতই গভীর কার্য–কারণসম্পন্ন যুক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য আপনি আনুন না কেন, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে ইউ জী সেসব মুহূর্তে ধূলায় পরিণত করে দেবেন। আগুনের কাছ থেকে আর কি বা আশা করা যায়? আপনি যদি সরাসরি অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন তাহলে কি আশা করতে পারেন যে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসবেন, পারেন কি?

সারাদিন ধরে ইউ জী–র গর্জন ঃ

''সমস্ত জ্ঞানার্জন, সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা ধ্বংসাত্মক। আপনি প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, আপনার প্রতিবেশীর উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করার জন্য। এটা মানুষের অন্যদের থেকে উপরে ওঠার খেলা, আমি এর বিরুদ্ধে কোনওকিছু মন্তব্য করছি না। যা যেভাবে চলছে সেটাই বর্ণনা করছি। সমস্ত জ্ঞানার্জন, সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা 'সামরিক ক্রীড়া' ছাড়া আর কিছু নয়। আপনি শুধু সবসময় বিজয়ী হতে চান। এতেই আপনার আগ্রহ। বদান্যতা মানুষের মনের সবচেয়ে কুৎসিত আবিষ্কার – প্রথমে, আপনি যা সবার জন্য সেখান থেকে চুরি করেন; তারপর পুলিশের সাহায্য নেন বা অ্যাটমবোমার ভয় দেখিয়ে সেগুলোকে চিরকাল করায়ত্ত রাখার চেষ্টা করেন। আপনি দয়াদাক্ষিণ্য দেখান, যাতে যাদের নেই তারা যেন আপনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে না পারে। তাছাড়া দান করে আপনি আপনার পাপবোধের বোঝাটা হালকা করতে চান। যারাই ভালো কাজ করতে ভালোবাসে, তারা সবাই সেকাজ করার সময় নেশার অনুভব করে। আপনারা সবাই এখনও সেই 'বয়েজ স্কাউট' এবং 'গার্লস গাইড' এর মতন।''

এই মানুষটি অর্থাৎ ইউ জী প্রাতঃরাশ তৈরি করে রাখেন আগের দিন শুতে যাওয়ার সময় এবং মধ্যাহ্নভোজ তৈরি করেন প্রাতঃরাশের ঠিক পরে।

''মেজরকে বলবেন যেন গভীরভাবে যোগাভ্যাস না করেন। যে পিঠের ব্যথার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যোগাভ্যাস করা, সে ব্যথা আরও বেশি ভোগাবে। এসব কসরত এবং যোগাভ্যাস শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। জন্তুজানোয়ারদের মতন

আপনাদের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করা আর যৌনমিলনের জন্য দৌড়াদৌড়ি করার একমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে।'' ভারত থেকে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দূরভাষে কথা বলার সময় এসব বললেন ইউ জী। ''যে টাকাটা আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সেটা কি পৌঁছে গেছে? না? ব্যাপারটা কি, চন্দ্রশেখর? টাকাটা তাহলে এখন কোথায় আছে? কোন ব্যাংকে? সুইজারল্যান্ড না ভারতে? আমাদের টাকা দিয়ে অন্য কেউ টাকা কামাচ্ছে। বুঝতে পারছি না ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার করেছি তাও টাকা যেতে এতদিন লাগছে কেন? সুগুণাকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন এবং টাকা পাওয়া মাত্র আমাকে ফোন করে জানিয়ে দেবেন ...।''

এসব কথা বলার পর তিনি ফোন নামিয়ে রাখলেন। কিন্তু সমানে বলতে থাকলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের এইসব ব্যাংকগুলো এবং তাদের নিয়মাবলী কেমন কুটিল, অসৎ এবং অকর্মণ্য। ওদিকে ভারতবর্ষে সুগুণা তাঁর তেত্রিশ কোটি দেবদেবী এবং তাদের পুত্রকন্যাদের সমানে প্রার্থনা করে চলেছেন যেন ইউ জী সুইজারল্যান্ড থেকে সোজা ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন, অথচ ইউ জী পরিকল্পনা করছেন কীভাবে সোজা মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেবেন। ইউ জী সুগুণা এবং চন্দ্রশেখরের জীবন থেকে চিরকালের জন্য সরে দাঁড়াতে চান, যাতে তারা তাদের জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিজেরাই গ্রহণ করতে পারেন এবং নিজেদের মতন করে জীবন চালাতে পারেন। এদিকে ইউ জী ইউরোপে থাকাকালীন এমন ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছেন যাতে চন্দ্রশেখর এবং সুগুণার নিজেদের একটা বাসস্থান হয়, যেখানে ইউ জী-কে ছাড়াই তারা নিজেদের মতন করে জীবনযাপন করতে পারেন। (যে বাড়িতে তাঁরা সবাই মিলে থাকতেন, সে বাড়ির লিজ প্রায় শেষ হতে চলেছে)।

(টীকা ঃ যথারীতি ইউ জী শেষ সময়ে তাঁর ভ্রমণ পরিকল্পনা বদল করেছেন এবং এখন তিনি যাচ্ছেন চীন, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড)।

জীবনের গতি-প্রকৃতি সত্যিই আশ্চর্যজনক! ভাবতে অবাক লাগে একজন মধ্যবিত্ত ভারতীয় ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা কীভাবে একজন সুইজারল্যান্ডের পরলোকগত ভদ্রমহিলার সম্পত্তির অধিকারী হতে চলেছেন এবং এসব ব্যাপারে মধ্যস্থতা করছেন একজন দুর্বোধ্য ভারতীয় ঋষি।

আমরা আজ রাতে 'ফরেস্ট গাম্প' চলচ্চিত্র দেখার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। হঠাৎ

ইউ জী আমাকে অসম্ভব হিংস্রভাবে আক্রমণ করলেন, যেমনটা এর আগে আমি আজ পর্যন্ত কোনওদিন অনুভব করিনি, দেখিনি বা অভিজ্ঞতার আওতায় আসেনি। ‘‘উভয় দিক বাঁচিয়ে চলা এখানে একেবারেই অসম্ভব। আপনিও ঠিক জুলীর মতন। এটা আপনাকে বুঝতে হবে, এবং খুব ভালো করে বুঝতে হবে। আমার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আপনার মনমর্জিতে চলবে না। আমাদের সম্পর্কের জন্য আমার কোনও প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আপনার। আপনি একথা হাড়ে হাড়ে জানেন যে আমি যদি আপনাকে জীবনে আর কোনওদিন না দেখি তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।’’ মনে হচ্ছে আমার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে, আমি একদম চুপ হয়ে গেলাম। ঘরে এক অসাধারণ স্তব্ধতা অবতরণ করল। ইউ জী–র আক্রমণের তীব্রতা সবাইকে আঘাত করল, যদিও তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলেছিলেন। আমাকে তিনি স্তব্ধ করে দিলেন। আমি হাল ছেড়ে দিলাম।

৩১ জুলাই ... বাইশ দিন

আরও সাতদিন বাকি আছে। ‘‘ইউ জী বলে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকার জন্য প্রচণ্ড সাহস এবং অফুরন্ত ধৈর্য্যের দরকার।’’ গতকাল রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর একথা বলেছিলেন মারিসা। আমার অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদের কোনও কারণ নেই।

ঊষার প্রাক্কালে নিঃশব্দ আলোয় বসে অপেক্ষা করছি কখন ইউ জী তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসবেন। মনে হল যেন আমার অন্তরটা প্রশান্তিতে ভরে আছে। গতকাল রাতের ভয়ংকর আক্রমণের কোনওরকম চিহ্ন বা প্রত্যাঘাত নিজের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। মনে পড়ল অনেকদিন আগে ইউ জী আমাকে একবার বলেছিলেন যখন আমরা ভয়ানক উত্তেজনার সঙ্গে দুঃখ–দুর্দশা এবং হতাশা নিয়ে আলোচনা করছিলাম ঃ ‘‘এই দেহ আপনার দুঃখ–দুর্দশা এবং নিদারুণ হতাশাকে নিজেই নিজের মতো করে সামাল দিতে পারে। আপনার বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাভাবনার উপর এ একেবারেই নির্ভর করে না। এমন কোনও সুখ বা বেদনা নেই যা শরীরের মধ্যে চিরস্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। আপনার পরমানন্দ এবং গভীর দুঃখ চিরকাল বেঁচে থাকে আপনার জ্ঞান এবং চিন্তালব্ধ অভিজ্ঞতার কাঠামো দিয়ে তৈরি জগতে।’’

আমরা এখন কফি খাচ্ছি। আমি নিস্তব্ধ। গতকাল যা হয়েছে তারপর এই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও ভয় লাগছে। তারপর হঠাৎ করে আশ্চর্য

কোনও কারণে ইউ জী কথা বলা শুরু করে দিলেন, ‘‘মহেশ, প্রশ্নই প্রশ্নকর্তা, এবং শ্রোতা শুধু কটা শব্দ। বুঝলেন এ সব এক...? যেই মুহূর্তে আমি এ ঘর ছেড়ে চলে গেলাম আমার কাছে আপনার আর কোনও অস্তিত্ব নেই। আপনি কেন, আমার নিজেরই কোনও অস্তিত্ব নেই. আমি যখন শোয়ার ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকি, আমি আবিষ্কার করি বিছানার দুটো চাদরের মধ্যে কেউ নেই।’’ তিনি যা বলছেন শুনে আমার খুব ভয় লাগল। কোনওকিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। এবং ক্রমশ এটা বুঝতে পারছি বোঝাবুঝির জগতে আমার কোনও প্রগতি হয়নি।

আমরা জুরিখে যাচ্ছি। পল সেমপের সঙ্গে ইউ জী সামনের সিটে বসেছেন, আমি, বব এবং পল চাপাচাপি করে পেছনের সিটে বসে আছি। তেল ভরার জন্য পেট্রল পাম্পে দাঁড়ালাম। আমরা গাড়ি থেকে নেমে হাত–পা টান টান করলাম। বব রসিকতা করে মন্তব্য করলেন, ‘‘মহেশ, আমরা কি এমন করেছি যে আমাদের কপালে এমন কষ্টকর প্রাপ্তিযোগ?’’ ইউ জী নাক গলিয়ে বললেন, ‘‘বব, অনেক কিছু করেছেন এবং অনেক কিছু করছেন। এবং এখন যা কিছু করার চেষ্টা করছেন তাতেই আপনার কষ্ট হচ্ছে এবং অযথা দুর্ভোগকে আহ্বান করছেন। আপনার নিজেকে শান্তি এবং সুখ দেওয়ার সমস্ত কলাকৌশল বন্ধ করতে হবে। তাহলে আর সমস্যা থাকবে না, আপনি সুস্থ বোধ করবেন।’’

লুসার্ন – সাড়ে ন’টা থেকে সাড়ে দশটা অবধি আমরা এই দৃষ্টিনন্দন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। আমরা একটা পুরানো কাঠের সেতু পার হচ্ছি এবং ইউ জী আমাদের জলে ভাসমান বিভিন্ন পাখিদের খাদ্যসংগ্রহের দিকে নজর দিতে বললেন। ‘‘এই রাজহাঁসগুলোকে দেখুন। এদের সমস্ত শক্তি এরা ব্যয় করছে খাদ্যসংগ্রহের জন্য। এই দেখুন মরালশাবকটিকে, নিজেই কেমন নিজের খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে স্বাধীনভাবে। এভাবেই আপনাদের নিজেদের ছেলেমেয়েকে স্বাধীন হয়ে উঠতে সাহায্য করা উচিত।

জুরিখ – আমরা সবাই যে যার মতো বিভিন্ন দিকে চলে গেলাম এবং ঠিক হল কখন এবং কোথায় আবার আমরা সবাই একত্র হব। আমি একটা বই–এর দোকানে ঢুকলাম। একটি পৌরাণিক বই আই চিং–এর পাতা ওলটাতে লাগলাম। বইটিতে সময়ের সঙ্গে আপনার কি পরিবর্তন হতে পারে সেসব নথিভুক্ত করা আছে। আমার জীবনে ভালো সময় আসছে এরকম ইঙ্গিত পেলাম। আরও লেখা আছে যে, আমি

যে প্রগতি লাভ করব তার কারণ হল বর্তমানে আমি এক ঋষির সঙ্গলাভ করছি সেই জন্য। আমার জ্বলন্ত শরীরে ও ব্যথিত মনে বই–এর ভবিষ্যৎবাণী সামান্য স্বস্তিপ্রদান করল। নটরাজের কথা আমার অন্তরে গুঞ্জরিত হতে লাগল, ‘‘চন্দ্র আপনার জন্মগ্রহ শনির উপর দিয়ে যাচ্ছে ...।’’ কিছুক্ষণ পরে বব, পল এবং আমি জুরিখের কেন্দ্রের রাস্তার পাশের একটা বসার জায়গায় বসে পড়লাম, গতকাল কি হয়েছিল সেসব নিয়ে নানারকম আলোচনা করতে লাগলাম। বব বললেন, ‘‘ইউ জী–কে সাংঘাতিক আক্রমণাত্মক বলে মনে হচ্ছে মহেশ, আপনি এক দারুণ বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছেন, সাবধান!’’

বার্ন – আমরা গাড়ি চালিয়ে শহরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ জোরালো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ‘‘আপনি যখন গাড়ি চালান তখন চোখে যা পড়ছে তাই দেখুন, আপনার মাথা ব্যবহার করার দরকার নেই, পল! আমি আমার মাথা একদম ব্যবহার করি না, কারণ আমার মাথা বলে কিছুই নেই। আপনারা আজ পর্যন্ত যতবার গভীর পরিকল্পনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে গেছেন ততবার যুদ্ধে হেরে গেছেন। শুধু চোখ খোলা রেখে দেখুন, চিন্তা করবেন না।’’ বললেন ইউ জী। বৃষ্টি থেমে গেছে এবং বাতাস আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি বোম্বেতে টেলিফোন করলাম। কর্মক্ষেত্রে সমস্ত কিছু যেন উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে – অস্বাভাবিক ব্যাপার।

পয়লা আগস্ট ... ২৩ দিন

ঘুম ভাঙল অসম্ভব মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। লেকের জলে রাজহাঁসের সমস্ত মনোযোগ দিয়ে খাবার সন্ধান করার দৃশ্যটা মনের পরদায় বার বার ভেসে উঠছে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে খাবার খুঁজে বেড়ানোর জন্যই হয়তো সেই রাজহাঁসটির চলনে এক অপরিসীম মাধুর্য। পরে বাড়িতে ফিরে এসে যখন ইউ জী ব্রকোলি সেদ্ধ করছিলেন তখন তাঁকে বললাম, আমার মানসপটে ভেসে ওঠা রাজহাঁসের প্রতিচ্ছবির কথা। ‘‘ব্যস, জীবনের এটাই হল অতি প্রকৃতি – খাওয়ার জন্য শিকার খুঁজে বেড়ান। এছাড়া জীবনের আর কোনও তাৎপর্য নেই। এক ধরনের জীবন অন্য আর এক ধরনের জীবনের উপর নির্ভরশীল। এমনকী সমস্ত শাকসবজি ফলমূলও এক ধরনের জীবন ...’’ নিরামিষাশী হবার জন্য যারা নিজেদের উর্ধ্বতর বা বিবর্তিত বলে মনে মনে অহমিকা পোষণ করেন তাদের প্রতি একটা সরাসরি আঘাত হানলেন ইউ জী।

খাদ্য এবং সুখভোগের উপর ইউ জী-র মন্তব্য

''মানুষ উপভোগ করার জন্য খাওয়াদাওয়া করে। আপনার খাওয়ার সময়ে দারুণ সুখানুভূতির সঙ্গে যৌনমিলনের সময়কার সুখানুভূতির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। মানুষ প্রায় সমস্ত কিছু করে সুখ অনুভব করার জন্য। এবং সুখভোগের জন্য আপনাকে চিন্তার ব্যবহার করতেই হবে। সমস্যার সূত্রপাত্র এখানে যে আপনি যন্ত্রণা ছাড়া কিছুতেই সুখভোগ করতে পারবেন না। একটানা সুখভোগ করা শরীরের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তখন ধর্মীয় লোকজন এসে উপদেশ দেওয়া শুরু করেন, ''আপনাকে চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। এবার আপনি ভাবতে শুরু করলেন চিন্তাহীন অবস্থা যেন এক অসাধারণ সুখকর অবস্থা। এজন্যই আপনারা চিন্তামুক্ত অবস্থায় যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। চিন্তা ছাড়া কোনওরকম সুখভোগ অসম্ভব। আপনারা এক অবাস্তব ভাবজগতে বাস করেন তাই ভাবনাচিন্তা আপনাদের কাছে এক মহামূল্যবান জিনিস। প্রকৃতপক্ষে আপনি আপনার ভাবনার এক পরিণতি।''

সুইজারল্যান্ডে থাকাকালীন আমি সত্যি সত্যি আমার প্রয়োজনীয় খাদ্য আবিষ্কার করে ফেলেছি। এটা অত্যন্ত সুবিধাজনক খাদ্য এবং এই খাদ্যই আমাকে আমার স্ত্রী এবং রাঁধুনীর উপর নির্ভরশীলতার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারবে। খাদ্যটা হল একটু পাউরুটি আর একগ্লাস জল। ''জলটা যদি একটু গরম হয় তাহলে পাউরুটি মুখে তাড়াতাড়ি গলে যাবে,'' বললেন ইউ জী। লাখ, লাখ ভারতবাসী রুটি আর জল খেয়ে বেঁচে আছে। তারা অনেক কম অসুস্থ হয়, বিশেষ করে যারা নিয়মিত বিশ রকমের পদ দিয়ে ভোজন করেন তাদের তুলনায়। মনে পড়ল আশির দশকে নিউইয়র্কে থাকাকালীন আমার যে অবস্থা হয়েছিল তার কথা। সেখানে একমাস ডাল ছাড়া খাওয়াদাওয়া করতে আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ডালের প্রত্যাহারজনিত শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগেছি। ইউ জী বলেন, ''লোকজন ঝাল-মশলায় পর্য্যন্ত অত্যাসক্ত হয়ে পড়েন, এমনকী খাদ্যদ্রব্যও আসক্তির জিনিস। কিন্তু নিজেকে বিবর্তিত বলে প্রমাণ করার জন্য তেল-মশলা পরিত্যাগ করা মূর্খতার নামমাত্র।''

তার অগ্নিগর্ভ কথাবার্তার যে মূল ভাবটি আজকাল নজরে আসছে তা হল এরকম, ''তথাকথিত সর্বজ্ঞরা যেসব বলে গিয়েছেন তার মধ্যে এমন কিছুই নেই।

তার মানে এই নয় যে আমি কিছু বলছি। তারা যা বলে গেছেন তার পরিবর্তে আমি যা বলছি তাকে উপস্থাপন করারও কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই।"

১ আগস্ট ঘটনাচক্রে ভ্যালেন্টাইনের জন্মদিন। বাঙ্গালোরে চন্দ্রশেখর এবং সুগুণা যে স্কুলে একটা ছোট অনুষ্ঠান করছেন সেই স্কুলের নাম "দ্য ভ্যালেন্টাইন মডেল স্কুল।" ইউ জী বলেন, ভ্যালেন্টাইন ছিলেন একজন ধর্মযাজকের মেয়ে কিন্তু কোনওদিন গির্জায় প্রবেশ করেননি এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানকে রীতিমতো ঘৃণা করতেন। এটাই হল সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে সেই ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুর পর তার নামে একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বোম্বে থেকে মুকেশ আমায় টেলিফোন করে জানাল যে, আমি যে জনগণের মতামত সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ লেখার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছি সেসব নিয়ে ভারতে তুমুল হইচই এবং বিক্ষোভ হচ্ছে। ভারতবর্ষের যে সমস্ত পত্রপত্রিকা আমাদের বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছিল, তারাই এখন নির্লজ্জভাবে বলছে যে সস্তা প্রতারণাপূর্ণ কৌশলের সহযোগে জন মতামত সংগঠিত করাটা খুবই নিন্দনীয়। "আমেরিকাতেও তারা এভাবেই ব্যাবসা করেন," বললেন ইউ জী। "দ্য টাইম নামের সাময়িক পত্রিকায় ধূমপানের অপকারিতা সম্পর্কে অনেক লেখালেখি হচ্ছে, অথচ সে পত্রিকাতেই গোটা এক পাতা জুড়ে সিগারেটের রঙিন বিজ্ঞাপন দেখা যাবে।"

আজ সুইজারল্যান্ডে স্বাধীনতা দিবস। চারিদিকে একটা আনন্দ উৎসবের মেজাজ। এমনকী গেস্টাডের মতন নিস্তরঙ্গ শহরটাও নব পরিধানে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। "এই দেশটা তৈরি করতে অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। নিচে টেনিস কোর্টের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কীভাবে সবাই আনন্দে নাচগানে মেতে আছেন। আপনি মারা যাবার পর কে আপনার আত্মত্যাগের এবং রক্তদানের কথা মনে রাখবে?"

হঠাৎ চারিদিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। নিচে সবাই যেখানে আনন্দোৎসবে জমায়েত হয়েছিলেন সেখানে এক হতাশার ছায়া নেমে এল। মনে হল যেন প্রকৃতি জননী আজ উৎসব ভেঙে দিলেন।

"যখনই আমি মুখ খুলি তখনই আমার মনে হয় যেন আমি শুধু আমার সম্বন্ধেই কথা বলছি।" ইউ জী-র সঙ্গে বসার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে এ কথা বললেন ড. লেবোয়ার। ইউ জী-র যথারীতি সম্বোধনসূচক প্রশ্নের "সব কেমন চলছে?"

উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি। ‘‘কথা বলার আর কেই বা আছে? যদিও আপনি যখন মনে করেন আপনি অন্য কারোর সম্পর্কে কথা বলছেন, প্রকৃতপক্ষে তখন আপনি আপনার সম্পর্কেই কথা বলেন।’’ বললেন ইউ জী। ড. লেবোয়ার স্বাভাবিক–প্রাকৃতিক প্রসবের একজন স্বনামধন্য প্রবক্তা। তিনি অবসর নেওয়ার আগে প্যারিসে ১৩,০০০ সন্তান প্রসব করান।

আজকে রাতে যে চলচ্চিত্র দেখব তার নাম হল, ‘‘হেভেন হেল্প আস।’’ এই ছবি আমার ছোটবেলায় বোম্বের ডন বসকো স্কুলে পড়ার সময়কার কথা মনে করিয়ে দিল। আমরা এখানে বেশ কয়েকটা দারুণ ভালো ছবি দেখলাম। আমরা যত ভালো ছবি দেখেছি, তার মধ্যে ইউ জী–র সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ‘দ্য লাস্ট সিডাকশন’। যখন সিনেমার কথা হয় তখন ইউ জী–র পছন্দ প্রায় সমস্ত সাধারণ দর্শকদের মতন। ‘‘খুন, জখম, ধর্ষণ এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন সিনেমা দেখতে আমার ভালো লাগে, আপনাদের প্রেমকাহিনি এবং আবেগভরা মনস্তাত্ত্বিক নাটক আমার একদম পছন্দ নয়।’’

আজ সন্ধ্যার আগে ইউ জী–কে বললাম সব ভালো সিনেমা শেষ হয়ে গেছে, আমাদের এখন খারাপ সিনেমা দেখতে হবে। ইউ জী উত্তর দিলেন, ‘‘তাতে কি এমন পরিবর্তন হবে? একটা খারাপ ছবিও প্রায় ভালো ছবির মতনই।’’ সিনেমা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত এমন মন্তব্য শোনার সুযোগ আসেনি।

২ আগস্ট ... ২৪ দিন

বোম্বে থেকে টেলিফোন কল আমাকে সারারাত ঘুমোতে দেয়নি। এখানে সুইজারল্যান্ডে এখন রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট, অর্থাৎ বোম্বেতে প্রায় সাড়ে তিনটের একটু বেশি। মুকেশ আবার নেশাগ্রস্ত। আমাদের ক্রিমিনাল ছবি বাজারে যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে মুকেশ তাকে সামাল দিতে পারছে না। এমনকী কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেপ্তার করার হুমকি দিচ্ছে। এসব দেখে ও আগে থেকেই ‘আগাম জামিন’ নিয়ে রেখেছে। ‘‘যত রকমের চাল আছে সাফল্যের জন্য সব ব্যবহার করা দরকার। সৎভাবে সাফল্য যদি আসে তো ভালো, আর তা নাহলে যদি অসৎ হওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেটাও দরকার। কিন্তু অসৎ হতে গিয়ে ধরা পড়লে তাকে মেনে নিতে হবে।’’ একবার আমাকে এসব কথা ইউ জী বলেছিলেন। কিন্তু সমস্যাটা কি জানেন, আমরা দুটোই চাই। আপনি কি জানেন না আমরা কেক খেতে চাই

এবং রেখে দিতেও চাই?

প্রত্যুষের হালকা আলোর আভায় ইউ জী একটা চেয়ারে বসে বালকসুলভ বিস্ময়ের সঙ্গে নিজের হাতের তালু দেখছেন। রবার্ট বলে একজন ভদ্রলোক ইউ জী-র জন্য একটা দাদুমার্কা জামা এনেছেন, সেটি ইউ জী-কে খুব সুন্দর মানিয়েছে। জীবনের শেষের দিকে নিজের জন্য অবশেষে অতি সুশোভন পরিচ্ছদ তিনি আবিষ্কার করেছেন। ‘‘আপনি কি ভাবতে পারেন এই যে আমি এবং আপনি রোজ সকালে এখানে বসে এত সব আজেবাজে আলোচনা করছি, একদিন এই পৃথিবীতে আর থাকব না! এই আপনার শরীর, আপনার কাছে মহামূল্যবান জিনিস একদিন চিতাভস্মে পরিণত হবে। আপনি কি এসব ভাবতে পারেন?’’ আমি যদিও সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লাম, মনে হল আমারই একটা অংশ ভিতর থেকে তারস্বরে চিৎকার করছে, ‘‘পালাও, মহেশ, পালাও!’’

আজ থেকে পনেরো বছর আগে যখন আমি কাজকর্মের অভাবে নিদারুণ হতাশায় ভুগতাম তখন ইউ জী আমাকে উৎসাহ দিয়ে একজনকে বলেছিলেন, ‘‘মহেশ অত্যন্ত প্রতিভাবান ছেলে, কিন্তু এখন খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।’’ তাঁর এই মন্তব্য আমার মধ্যে এনেছিল এক অসাধারণ আত্মবিশ্বাস। আমি মারিওকে আমার এই অভিজ্ঞতার কথা শোনালাম। কারণ তিনি বর্তমানে জীবনের এক দুর্যোগময় সময়ের মধ্যে আছেন। আমার কাহিনি শুনে তার চোখ দু’টো আশার আলোয় ঝলমল করে উঠল।

‘‘আমি আপনাকে একটা বড়সড় ব্যাগ দিচ্ছি, আপনার সবকিছু তাতে ধরে যাবে। কিন্তু আপনাকে ব্যাগের দাম দিতে হবে। আমার মতো দরিদ্র ভারতবাসী কেন আপনার মতো একজন ধনী ভারতীয়কে বিনা পয়সায় কিছু দেবে?’’ একথা বলে ইউ জী একটা সুন্দর রঙিন ব্যাগ বের করে আমার হাতে দিলেন। ‘‘একশ ফ্রাঙ্ক নগদা নগদ!’’ বলে তার খোলা হাত আমার মুখের সামনে তুলে ধরলেন। আমি ঝটপট আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা একশ ফ্রাঙ্কের নোট বার করে ইউ জী-কে দিয়ে লেনদেনের পাট চুকিয়ে দিলাম। এবার ইউ জী তাঁর টেবিলের দিকে যেতে যেতে বললেন, ‘‘আসলে ব্যাগটার দাম ষাট ফ্রাঙ্ক। একশ ফ্রাঙ্ক নয়...’’ তারপর ফিরে এসে বললেন, ‘‘এই নিন আপনার চল্লিশ ফ্রাঙ্ক, এরসঙ্গে কিছু খুচরো আছে, বোনাস আপনার খেলার জন্য।’’ রবার্ট হর্নকোল আমেরিকান ফটোগ্রাফার।

যিনি আজ পর্যন্ত ইউ জী-র যত ছবি দেখেছি তারমধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছবি তুলেছেন। আমাদের এই নাটক মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলেন।

'শুভরাত্রি', বলে যথারীতি ইউ জী তার ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একবার যখন তিনি ঘরের মধ্যে চলে যান তখন আপনার মনে হবে সারা বাড়িতে যেন কেউ নেই। আমি আমার বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে ঘুমের অপেক্ষায় সময় কাটাতে লাগলাম। সবে একটু চোখ ধরে এসেছিল, টেলিফোনের শব্দে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। ''আমি নাগার্জুন বলছি ... আমি কি আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করলাম, স্যার?'' ''না, না মোটেই না'', বললাম নিজেকে শান্ত দেখানোর জন্য। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, ''ক্রিমিনাল ছবির প্রিমিয়ার শো কেমন হল?'' ''খুব ভালো। আমরা মনে হয় সমস্যার জাল থেকে বাইরে চলে এসেছি। যেভাবে দর্শকদের মধ্যে প্রথম শো-তে সাড়া জেগেছে, সেটা বিচার করে বলা যেতে পারে, এই ছবিটা 'বি-প্লাস' শ্রেণির ছবি। অবশেষে আমি স্বস্তিবোধ করলাম। তার কথা শুনতে শুনতে নিজেকে বললাম, ''সমস্ত সাফল্য একটু দেরি করা বিফলতা মাত্র।'' মনে পড়ছে ইউ জী আমাকে সর্বদা যা বলেন, ''মহেশ, প্রত্যেক বারবণিতার একটা ভালো সময় থাকে। আপনাদের মতন মনোরঞ্জনের ব্যবসায়ীরা প্রায় সকলেই বারবণিতার মতন। ভালো সময়ের সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। কিছু কিছু টাকা জমিয়ে রাখা দরকার, যাতে ভবিষ্যতে আপনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন। এবং যখন আপনি আপনার পদমর্যাদার তুঙ্গে, তখনই আপনার অবসরগ্রহণ করা উচিত।'' আশা করি তার উপদেশ পালন করার মতো অবস্থা আমি তৈরি করতে পারব।

৩ আগস্ট ... ২৫ দিন

লেখকের জীবন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। দিনের পর দিন শূন্য কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকা বেশ শক্ত কাজ। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অত্যন্ত ব্যক্তিগত জিনিস তুলে এনে শূন্য কাগজে ছড়িয়ে দিয়ে জগতের সামনে তুলে ধরা যেন আরও সমস্যার কাজ।

আজ সকালে আমার আর ইউ জী-র মধ্যে কোনও বাক্যালাপ হয়নি। আমরা সারা সকাল চুপচাপ সামনাসামনি বসে কাটিয়ে দিলাম। তাঁর চোখদুটো সারাক্ষণ মুদিত ছিল। আজ তাকে দেখতে যে কি সুন্দর লাগছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। এক অপার্থিব সৌন্দর্যে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। আমার যেহেতু কিছুই করার নেই

তাই তাঁকে নকল করার জন্য আমিও দু'চোখ বুজে ফেললাম। ধীরে ধীরে আশপাশের সমস্ত শব্দ গোচরে এল – ট্রেন, মোটর গাড়ি, পাখির কোলাহল, সোফার মচমচ শব্দ। সাময়িকভাবে এক অনাবিল শান্তি অনুভব হল। তারপর হঠাৎ মুখের সামনে মাছির ভনভন আমার শান্তি ভঙ্গ করে দিল। আমাকে স্থির দেখে তারা মহানন্দে আমার মুখমণ্ডলে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। আমার শরীরটা বর্তমানে তাদের খাদ্যভাণ্ডার। যেই মুহূর্তে আমি হাত তুলি সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর থেকে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু প্রায় পর মুহূর্তে তারা তাদের অসমাপ্ত কাজ সাঙ্গ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে চলতে লাগল অনেকক্ষণ। অবশেষে আমি চোখ খুললাম, তারা আমায় কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে দিল না। দেখি ইউ জী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। তারপর দুষ্টুমিমাখা মুখভঙ্গি করে বললেন, ''মাছি জ্বালাতন করল!'' মনে পড়ল এর আগে একদিন কি বলেছিলেন ঃ ''এমন কি আপনার মধ্যে এরকম ভাবনার জন্ম দিল যে আপনার জীবন টেবিলে বসা মক্ষিকাদের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ?'' জুলী তখন উপদেশ দিলেন, ''আপনি আপনার এই বইটির নাম দিতে পারেন, 'দ্য ফ্লাই অন দ্য টেবিল।' ধারণাটি মন্দ নয়, ভাবলাম মনে মনে।

ইউ জী সারা ইউরোপ থেকে আসা মোক্ষ অনুসন্ধানকারীদের সঙ্গে বসার ঘরে বসে আছেন। তাদের মধ্যে কিছু জার্মান, কিছু ইতালিয়ান, কিছু ফরাসি এবং একজন আমেরিকান ছিলেন। হঠাৎ ইউ জী তাদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন, ''আপনাদের ভারতের লোকদের এইসব পশ্চিমের লোকদের ভারতে ঢুকতে দেওয়া বন্ধ করা উচিত। যখন এইসব লোকেরা ভারতীয় কনস্যুলেটের দরজায় ভিসার জন্য হাজির হন, তখন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আপনারা কি জানেন কেন তারা আপনাদের দেশে আসতে চায়? তারা আপনাদের দেশে আসে কারণ পাউন্ড, ডলার বা মার্ক দিয়ে ভারতে টিকে থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ। একবার যখন তারা ভারতে এসে পড়েন তখন নিজেদের কেউকেটা বলে ভাবতে শুরু করে দেন। সেসব নয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু এসব লোকেরা তাদের টাকা ভাঙান কালোবাজারে, ভারত সরকার এদের কাছ থেকে কিছুই পান না। ভারতবর্ষের এই ভ্রমণকারীদের টাকার কোনও প্রয়োজন নেই। রাশিয়া এবং চীন ভ্রমণকারীদের আমদানি ছাড়াও কীভাবে তাহলে টিকে আছে।''

ইউ জী-র এই বক্তব্য ঘরের সবাইকে অস্বস্তিজনকভাবে স্তম্ভিত করে দিল।

ইউ জী ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নতুন কর্মপন্থার প্রতিবাদে এসব বলছেন। কারণ এই পলিসির জন্য অধিকাংশ ভারতীয় ভ্রমণকারীদের ইউরোপে বিভিন্ন দেশে যাওয়ার ভিসা আবেদন নাকচ হয়ে গেছে। আমরা জানি যে সুইজারল্যান্ড দক্ষিণ ভারতীয়দের ভিসা দেয় না, এমনকী যদি কোনও ব্যক্তির দক্ষিণ ভারতীয় নাম হয় তাহলে পর্যন্তও ভিসা দিতে নারাজ। তাদের বক্তব্য হল বর্তমানে শ্রীলঙ্কা থেকে প্রচুর পরিমাণে উদ্বাস্তু তাদের দেশে ঢুকে পড়ছে। ইউ জী-র শ্যালক ড. শেষগিরি রাও, ভারতবর্ষের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক, কিছুতেই আমেরিকা থেকে সুইজারল্যান্ডের ভিসা পেলেন না যখন তিনি গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাচ্ছিলেন আমেরিকায়। গেস্টাডে ইউ জী-র সঙ্গে দেখা করার সমস্ত রকম প্রোগ্রাম বাতিল করতে বাধ্য হন। ইউ জী যখন তার মন্তব্য প্রকাশ করছিলেন, তখন আমার মনে হয়েছিল একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে এই ঘটনা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা দরকার। পাশ্চাত্য দেশের এ ধরনের ব্যবহার কোনও আত্মসম্মানসম্পন্ন ভারতীয় নাগরিকের মুখ বুজে সহ্য করার কোনও যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না।

‘‘জীবন-মৃত্যুর প্রতিযোগিতায় জীবনের পরাজয়ে রাশিয়া আশ্চর্যান্বিত।’’ আজকের হেরাল্ড ট্রিবিউনের প্রথম পাতার বড় খবর। খবরটা বিস্তারিতভাবে পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, বৈজ্ঞানিক এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না কেন রাশিয়াতে মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কালের এমন অসাধারণ অবনতি ঘটেছে। আমি অবশ্য আরও বেশি আশ্চর্য হলাম এই একই সংবাদপত্রের দশের পাতায় স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের একটি খবর পড়ে, উল্লেখ করা হয়েছে, ‘‘জীবন প্রকৃতই রহস্যময় – অবর্ণনীয়, অপরিমেয়। পৃথিবীর যা কিছু মানুষের চেতনা রূপ দিতে সক্ষম, তাতে জীবন হয়তো সর্বশেষ জিনিস যার পরিপূর্ণ সত্তার উন্মোচন ঘটবে না।’’ অথচ একই জায়গায় আর একটি খবর, ‘‘এই প্রথম মানুষ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন্ত প্রাণীর জিনের পরিপূর্ণ বর্ণনা এবং সম্পূর্ণ রাসায়নিক সংগঠন আবিষ্কারের মাধ্যমে জীবনের নিখুঁত সংজ্ঞা দিতে সক্ষম হল। এই জীবন্ত প্রাণীটি হল একটা সাধারণ ব্যাকটেরিয়া, যার নাম ‘হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা’। কিন্তু এর স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকার সমস্ত উপাদান এবং ক্ষমতা আছে। এই প্রথম বৈজ্ঞানিকরা সম্পূর্ণরূপে দেখতে পেলেন প্রতি

অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের কোষসমূহ কীভাবে সংগঠিত, কীভাবে বেঁচে থাকে, কীভাবে বৃদ্ধি পায় এবং কেমন করে কোষের বংশবৃদ্ধি ঘটে …।'' তাহলে ব্যাপারটা কি সত্যিই অবাস্তব নয় যে একদিকে বৈজ্ঞানিকরা কোনও মতে বুঝতে পারছেন না কেন হঠাৎ মৃত্যুর হার এমন বৃদ্ধি পেল, অথচ একই সময়ে অন্যত্র বৈজ্ঞানিকরা দাবি করছেন যে তারা জীবনের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছেন।

আজ মধ্যাহ্ন ভোজনে আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক চমৎকার অতিথি। ভদ্রলোকের নাম ডোনাল্ড ইনগ্রাম স্মিথ। অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত এই ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঁচাশির কাছাকাছি। এক সময়ে তিনি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির সচিব হিসাবে কাজ করেছিলেন। গেস্টাডে তিনি জে কৃষ্ণমূর্তি আলোচনা সভায় বক্তা হিসাবে আমন্ত্রিত। গত তিন সপ্তাহ ধরে এই শিবির চলছে। ইউ জী যখনই অস্ট্রেলিয়া যান ডোনাল্ড ইনগ্রাম স্মিথ তাঁর সঙ্গে দেখা করে সময় কাটান। ইউ জী–র মতানুসারে ডোনাল্ড খুব ভালো হাত দেখতে পারেন, অর্থাৎ হস্তরেখাবিদ। খাওয়া–দাওয়ার পরে উইলো গাছের তলায় বসে ডোনাল্ড অনেকদিন পরে আবার ইউ জী–র হাত দেখলেন। এলেন কৃষ্টাল যিনি এক সময়ে বুব্বা ফ্রি জনের অন্দরমহলের সদস্য ছিলেন, ডোনাল্ডের মন্তব্য খাতায় লিখে রাখলেন।

ডোনাল্ড ভবিষ্যৎবাণী করলেন ইউ জী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন জন্মভূমির বাইরে, অর্থাৎ বিদেশের মাটিতে। ইউ জী–র সুদর্শন শিরোভাগ থেকে অবিরাম কিছু একটা নির্গত হচ্ছে এবং 'এ প্রবাহ যেমন বহির্মুখী তেমন অন্তর্মুখী', বললেন ডোনাল্ড। আবার বোঝালেন, 'একটা এমন দরজা যেখান থেকে আপনি অনায়াসে ঢুকতেও পারেন এবং বেরোতেও পারেন।' ইউ জী উত্তরে বললেন, ''আমি একজন তস্কর। যে কেউ আমার দুয়ারে আসেন তাকে আমি আপ্যায়ন করে অন্দরমহলে নিয়ে আসি এবং অবশেষে সর্বস্ব হরণ করে নিই!'' এরপর ইউ জী গল্প করতে করতে বললেন, একবার তাঁর স্ত্রী হীরের আংটি হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন ইউ জী বলেছিলেন, পুলিশকে যদি খবর দিয়ে অন্দরমহলে আনা হয় তাহলে স্ত্রীকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। ইউ জী–র স্ত্রী বাড়িতে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে কোনও একজন আংটি নিয়েছেন বলে দোষারোপ করেছিলেন। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল তিনি নিজেই ভুল করে অন্য কোথাও রেখে দিয়েছিলেন। ইউ জী–র আশপাশে পুলিশ আসার কোনও অনুমতি নেই …। ইউ জী আরও গল্প শোনালেন,

একবার নিউ ইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে কোনও একজন তাঁর পকেট কেটে টাকা চুরি করেছিলেন এবং পকেটমার এমন দক্ষতার সঙ্গে কাজটা করেছিলেন যে ইউ জী খুশি হয়ে পকেটমারকে চার তারা হোটেলে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন।

ডোনাল্ড আরও ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে ইউ জী-র জীবনে আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটবে। ইউ জী উত্তরে জানালেন যে, 'পরের বার যখন দেখা হবে তখন বোঝা যাবে এটা সত্যি না মিথ্যা।'

ডোনাল্ড বলেন যে, ইউ জী-র অহংবোধ বলে কিছু নেই। ইউ জী নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, "আমাকে যদি অহংকারী না বলা যায় তাহলে অহংকারী কে? আমার মনে হয় না এর থেকে আর কোনও বেশি অহংবাদী মন্তব্য আছে, বাড়ির ছাদ থেকে তারস্বরে ঘোষণা করা, আজ পর্যন্ত মানব ইতিহাসের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ এবং শিশুরা যা কিছু চিন্তা করেছে, অনুভব করেছে এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তার সবকিছু আমার ভেতর থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে...।"

পরে ইউ জী আরও বললেন, বর্তমানে তাঁর জীবনের একটাই উদ্দেশ্য এবং তা হল এতদিন পর্যন্ত তিনি নিজে যা বলেছেন সেসব ছিন্নভিন্ন করে নস্যাৎ করে দেওয়া।

৪ আগস্ট ... ছাব্বিশ দিন

গতকাল রাতে যে নতুন সিল্কের জামা ইউ জী আমায় দিয়েছেন, সেটা আমি পরেছি। এটা বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁর প্রিয় জামা ছিল, "এই জামাটা আপনাকে দেবার একমাত্র কারণ হল আমি পুরানো পোশাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করতে চাই বলে।" একথা বলে তিনি আমার হাতে এই ঘিয়ে রঙের জামাটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আজ কোনও এক ব্যাখ্যাতীত কারণে আমার মনে হচ্ছে যেন নতুন করে কিছুর সূত্রপাত হল।

গতকাল হেরাল্ড ট্রিবিউনে যে দুটো প্রবন্ধ পড়েছিলাম আমি ইউ জী-কে তার ওপর মন্তব্য জানাতে অনুরোধ করলাম। "আগেকার ধর্মীয় জগত যেমন ছিল ঠিক তেমনই বর্তমানের বৈজ্ঞানিক জগৎ – একইভাবে হতবুদ্ধিসম্পন্ন। আমরা মূর্খের মতন আমাদের বিশ্বাস এবং আস্থা এদের হাতে সঁপে দিয়েছি। আমরা মনে মনে ভাবি জীবনের অর্থ এবং রহস্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই লোকগুলোর একটা বিশেষ অন্তঃদৃষ্টি আছে। এইসব নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দকোষ দিয়ে আমাদের চমক

দিয়ে, চোখ ধাঁধানোর কি অর্থ আছে বুঝি না। মানুষ নামের জীবটা হাজার হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীতে এসব বৈপ্লবিক তথ্য এবং আত্ম-প্রচারিত নতুন আবিষ্কার ছাড়াই টিকে এসেছে। যা বৈজ্ঞানিকরা নতুন বলে দাবি করেন তা কোনওটাই নতুন কিছু নয় – প্রকৃতিতে এসব তথাকথিত নতুন মাত্রা সবসময়েই ছিল। প্রকৃতভাবে তাহলে তারা কি সাফল্য লাভ করল? নোবেল একাডেমি এসব বৈজ্ঞানিকদের পিঠ চাপড়ে পুরস্কারে ভূষিত করতে পারে, এ সমস্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে যন্ত্রবিদ এবং শিল্পপতিরা পরস্পরকে ধনী হতে সাহায্য করবেন। পৃথিবীর অত্যন্ত মুষ্টিমেয় কিছু লোকজন এসব উন্নতির ছোঁয়া পাবেন। কিন্তু আমি বলে রাখছি মানুষ এসব শিক্ষা এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করবে প্রতিবেশীকে দাবিয়ে রাখার জন্য।''

''এমনকী ফার্মাসিস্ট এবং সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগৎ আপনার ভয়কে খোরাক করে দিব্যি জীবন কাটাচ্ছেন এবং প্রচার মাধ্যম তাদের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে এই ভীতিকে মানুষের মধ্যে প্রচার করে চলেছেন। যেহেতু আপনি কোনও রোগের একটা গালভরা নাম দিয়ে দিলেন, তার মানে এই নয় যে আপনি তার নিরাময় করে ফেললেন। আপনি শুধু জ্ঞানভাণ্ডারে শব্দসংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন আর কিছু নয়। আজ আমাদের যত বাক্যবাণ আছে তার থেকে শেক্সপিয়রের অনেক অনেক সীমিত শব্দকোষ ছিল। তার অর্থ কী এই দাঁড়াল যে এখনকার লেখার অবস্থা অনেক উন্নতমানের – তাই কি? যত ইচ্ছা আপনারা বলে যান, কোনওদিন জানতে পারবেন না জীবন কী।''

নিচে গেস্টাডের মাঠে লোকজন একটা বিশাল নীল বেলুন ফোলাচ্ছে। আবার উচ্ছ্বসিত লোকজন বেলুনে করে দূর আকাশে উড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এখানে রান্নাঘরে ইউ জী কফির মধ্যে অনেকটা ঘন দুধ ঢেলে দিলেন। আমি ইউ জী-কে প্রশ্ন করলাম, ''কেন কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন এই সময়ে এমন একটা বই ছাপলেন যাতে মনে হয় যেন তারা জে কৃষ্ণমূর্তি এবং রোজলিন্ড রাজাগোপালের গোপন প্রণয়লীলাকে যথাযথা বলে মেনে নিয়েছেন।'' (এক ইস্তাহারে কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন অফ আমেরিকা রাধা স্লসের বই 'লাইভস ইন দ্য স্যাডো উইথ জে কৃষ্ণমূর্তি' সম্পর্কে জানিয়েছেন।) ''ফাউন্ডেশন শিক্ষা এবং শিক্ষককে পৃথক করতে চাইছেন। তা নাহলে ফাউন্ডেশন পুরোপুরি ভেঙে যাবে। এটা স্বীকার করতেই হবে যে রাধা স্লসের বই-এর প্রভাব তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। এটা যদি সত্যি না

হত, তাহলে এই সময়ে এমন বই ছাপানোর কোনও প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।''

মনে পড়ছে বোম্বের সানডে টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে গ্রন্থ সমালোচনায় রাধা স্লসের বই এর উপর আমার লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর, পুপুল জয়কার যাকে ভারতীয় সংস্কৃতির সাম্রাজ্ঞী বলে মান্য করা হয়, আমাকে আইনের দরবারে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। কারণ আমি নাকি 'যে ঋষি একা পথ পাড়ি দিয়েছিলেন' তাঁর সুনামকে কলুষিত করেছি – এই অভিযোগে। তিনি এবং অন্যান্য জে কৃষ্ণমূর্তি ভক্তরা আমার এবং ইউ জী-র উপর অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে ইউ জী-র উপর। কারণ আমি তাঁর তীব্র সমালোচনামূলক মন্তব্য সেই প্রবন্ধে বারবার ব্যবহার করেছিলাম। আমি যখন পুপুল জয়কারের মীমাংসাযুদ্ধের আহ্বানকে স্বীকার করে লিখেছিলাম যে জনসমক্ষে কৃষ্ণমূর্তি কেচ্ছার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেব তখন তিনি পিছিয়ে যান। আমি আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলাম পুপুল জয়কার নিজের গোপন মুখোশ খোলার ভয়ে পিছিয়ে যাবেন এবং আমাকে হুমকি দেওয়া বন্ধ করে দেবেন। কৃষ্ণমূর্তি ফাউন্ডেশন তাদের বই ছাপিয়ে আমার সন্দেহকে সত্য বলে অনুমোদন করলেন।

কথোকথনের কিছু অংশ

ব্যথা – ''শব্দ আমাদের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে শারীরিক বেদনায় রূপান্তরিত হয় ... শরীরের কাছে বেদনা বলে কিছু নেই। আপনি যখন কোনও অনুভূতিকে অনুবাদ করেন ব্যথা হিসাবে তখন ব্যথা বোধ করেন। এছাড়া ব্যথা বলতে কিছু নেই। আপনারা ব্যথাকে দূর করতে চান এবং সুখানুভূতিকে চিরকালের জন্য ধরে রাখতে চান। ধার্মিক লোকরা বলেন, এসব সম্ভব। আমি জানি এটা অসম্ভব। আপনি সারা জীবন ধরে চেষ্টা করে দেখুন একে সম্ভব করার জন্য। আমি কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আপনি কোনওদিন সফল হবেন না। একদিন আপনি নিজেই তা আবিষ্কার করবেন।''

যৌনতা – ''যৌন সহবাস এবং পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ান একই জিনিস,'' বললেন পল সেমপে। ইউ জী এই প্রথম মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর জুড়ে দিলেন, ''প্রেমে পড়া আর চকলেট খাওয়া একই জিনিস। এই দু'টো কাজ শরীরে একই ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়।'' আমি লাফিয়ে উঠে এক জায়গায় দৌড়াতে শুরু করলাম। ইউ জী জিজ্ঞাসা করলেন, ''মিস্টার, আপনি কি করছেন?'' আমি

দুষ্টু হাসি দিয়ে বললাম, ''যৌন সহবাস! এইমাত্র আপনি পল সেমপের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন, দৌড়ান এবং যৌন সহবাস একই জিনিস। তার মানে আমি এখন সহবাস করছি।'' ইউ জী হেসে ফেললেন। তিনি আজ খুব খোশমেজাজে আছেন বলে মনে হচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলা আমরা উইলো গাছের নিচে বসে গল্পগুজব করলাম। মারিসা একটা রসালো ঘটনা শোনালেন – একবার একজন সুন্দরী ইতালিয়ান ভদ্রমহিলা একদম ইউ জী–র মুখোমুখি বসেছিলেন। ভদ্র ভাষায় বলা যেতে পারে ইউ জী–র শক্তি ভদ্রমহিলাকে উত্তেজিত করে তোলে। এইভাবে অনেকক্ষণ চলতে থাকে। তারপর যখন ভদ্রমহিলা প্রায় চলে যাচ্ছিলেন, তখন ইউ জী তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''শুনুন! আপনি যা অনুভব করেন আমিও ঠিক তাই অনুভব করি। কিন্তু দুঃখিত যে কিছু করা যাবে না।''

যৌনতা নামক সুস্থ বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন আমি আর একটা ঘটনার কথা বলি – একবার এক ভদ্রমহিলা ইউ জী–র কাছে এসে সরাসরি তাঁর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করেন, ''আমি যদি আপনাকে কামাসক্ত করার চেষ্টা করি তাহলে আপনার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হবে?'' ইউ জী উত্তরে বলেন, ''চেষ্টা করে দেখুন, নিজেই জানতে পারবেন আপনার উত্তর কি?'' সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা ক্ষমাপ্রার্থনা করে ঘর থেকে পালিয়ে যান। আর কোনওদিন ইউ জী–র মুখোমুখি হননি।

আজ রাতে যে সিনেমা দেখা হবে তার নাম 'থেলমা অ্যান্ড লুইজ।' 'ব্লেড রানার' সিনেমাটা যেমন চোখ–ধাঁধানো ছিল এটা সেরকম নয়। রিডলি স্কটের এই ছবিটা সে তুলনায় খুব সরল ধাঁচের। 'থেলমা অ্যান্ড লুইজ' কিন্তু বাজারে দারুণ চলেছে, 'বিগ হিট' বলা যেতে পারে। এমনকী 'ব্লেড রানার'–এর থেকেও অনেক বেশি হিট করেছে। ''ভালো করে কথা বলার কলাকৌশলের কি মূল্য আছে তার কাছে, যার বলার আর কিছুই নেই,'' একথা ইউ জী আমায় বলেছিলেন বহুদিন আগে, সেই আশির দশকে। এই উক্তি আমায় সিনেমা সম্পর্কে সমস্ত ধারণা পালটে দিয়েছিল।

৫ আগস্ট ... সাতাশ দিন

দু–দুটো মাকড়সা আমার বাথটব দখল করে বসে আছে। আমি মাকড়সা একদম পছন্দ করি না। আমি ওসবে আতঙ্কগ্রস্ত। আমি ধারাস্নানের হাতলটা শক্ত করে ধরে

তাদের দিকে জলের ফোয়ারা চালিয়ে দিলাম। যাতে গা-শিরশির করা পোকাগুলো ভয় পেয়ে চলে যায়। ফোয়ারার জল এমন তীব্রভাবে চালু হয়ে গেল যে তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার বদলে, অসহায় পোকা দুটোকে আমি জলে ভাসিয়ে দিলাম। চোখের সামনে নিরীহ, অসহায় পোকা দুটোকে বাথটবের ছিদ্রে হারিয়ে যেতে দেখে আমার দারুণ খারাপ লাগল। এ ঘটনায় যা শিখলাম সেটা পরিষ্কারভাবে এরকম – আপনি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে আপনার প্রতিবেশীকে হত্যা করেন।

স্নানের ঘর এবং মাকড়সা যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই মাকড়সা এবং স্নানের ঘরের মধ্যে যেন কিছু একটা আছে। জুলী আমায় বলল, বেশ কয়েক বছর আগে যখন তিনি কোনও এক গ্রীষ্মকালে এখানে থাকতেন, তখন এই বাথরুমে একটা মাকড়সা বাস করত। সেই মাকড়সাটার একটা পা খসে গিয়েছিল, কিন্তু তবুও আশপাশে ঘুরে বেড়াত। কখনও তাকে ছাদের নিচে, কখনও হাত ধোয়ার সিঙ্কে, আবার কখনও কখনও বাথটবে দেখা যেত। জুলীর সঙ্গে মাকড়সাটার এক সখ্যতা গড়ে ওঠে। তারপর গ্রীষ্মের শেষে যখন যাওয়ার সময় এগিয়ে এল তখন জুলীর মনে এক সমস্যা দানা বাঁধতে লাগল। যদি মাকড়সাটাকে বাথরুমে রেখে জুলী চলে যায়, তাহলে বাড়িওয়ালার লোকজন বাথরুম পরিষ্কার করার সময় ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে তাকে মেরে ফেলবে। আর যদি কোনওরকমে বাইরে এনে ছেড়ে দেয়, তাহলে ভয়ংকর শীতে মাকড়সাটা নিশ্চয় মরে যাবে। যখন নিজে কোনও সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারলেন না তখন ইউ জী-র শরণাপন্ন হলেন। ইউ জী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, ‘‘আপনি মাকড়সাটার জন্য একটা সোয়েটার বুনে ফেলছেন না কেন?’’

ইউ জী লন্ডনের এক বিশেষ জায়গার বিস্তারিত ম্যাপ এঁকে ফেললেন। আমি যখন লন্ডনে যাব তখন একটা বিশেষ বই-এর দোকানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমাকে সাহায্য করার জন্য ম্যাপটা আঁকলেন। আমি এই সাতাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ মানুষটির স্মরণশক্তি দেখে সত্যিই হতভম্ব হয়ে গেলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা একটুও আবছা হয়নি। একজন বৃদ্ধ বয়সের মানুষের ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির কোনও চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। ‘‘আমার মধ্যে কোনও প্রতিচ্ছবি নেই। যখন আমি এইচ. এম. ভি. দোকানকে ম্যাপে চিহ্নিত করি তখন আমার মধ্যে দোকানের কোনও

প্রতিচ্ছবি জেগে ওঠে না। যা আছে শুধু কতগুলো শব্দ এবং বাক্য। আমি কি বলেছি তা আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়ে উঠবে না। যদি কখনও বুঝে ফেলেন তো সেই জ্ঞানে আপনার ইতি ঘটবে।"

মারিসা, যিনি আমাদের সঙ্গে বসে ইউ জী-র কথা শুনছিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে নির্দ্বিধায় বললেন, "ইউ জী যা কিছু বলছেন আমাদের তা ব্যবহার করার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই মহেশ! যদি থাকত তাহলে আমাদের শিল্প এবং কলাবিদ্যা শেষ হয়ে যেত। আমার আর আঁকার কিছু থাকত না এবং আপনারও আর সিনেমা করার কোনও কিছু থাকত না, বন্ধু। আপনি কি এমন এক জীবনের কথা ভাবতে পারেন যেখানে মনের প্রতিচ্ছবি তৈরি করার মত আর কোনও ক্ষমতা নেই? কে চায় এসব জিনিস? সে জীবন অতি যন্ত্রণাদায়ক।" এবং ইউ জী এর সঙ্গে আরও একটু জুড়ে দিয়ে বললেন, "শুধু যে আপনি ছবি আঁকতে পারবেন না তাই নয়, আপনার পক্ষে কোনও ব্যক্তির সঙ্গে এবং কোনও বস্তুর সঙ্গে কোনও রকমের সম্পর্ক স্থাপন করা আর সম্ভবপর হবে না।"

শেষ নৈশ ভোজ

আগামীকাল লিসা আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। আজ ইউ জী-র এটা একটা ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে, সাধারণত যে রকম রান্না করেন তার থেকে অনেক বেশি লোকের জন্য রান্না করছেন। এখন তাঁর মেজাজ ভীষণ খারাপ। "আমি এইসব লোকদের রান্না করে খাওয়াতে একদম চাই না! আমি নিজেকেই রান্না করে খাওয়াতে অপছন্দ করি। আমি একটা কুকুরের মতো। আমি আপনাদের সভ্য জগতের লোকদের মতো টেবিলে বসে খাওয়ার সুখভোগে মহানন্দ অনুভব করা একদম ঘৃণা করি। আমি যথাশীঘ্র সম্ভব খাবার টেবিলটা এখান থেকে দূর করে দেব। এটা কোনও আশ্রয় নয়, খাওয়া-দাওয়া আমার প্রয়োজনের সর্বনিম্ন বস্তু।" তিনি গর্জন করতে লাগলেন। সবাই টেবিলে বসে মৌন হয়ে তাঁর কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এরপর যখন রান্না হয়ে খাবার তৈরি হয়ে গেল, তখন সবাই এক এক করে উঠে তাদের খাবার নিয়ে এসে বসে মহানন্দে খাওয়া শুরু করে দিলেন। এঞ্জেল হেয়ার পাস্তা ইউ জী রান্না করেছেন, অসাধারণ সুস্বাদু। ইউ জী একজন দুরন্ত রাঁধুনি, যেমন তাড়াতাড়ি রান্না করেন, তেমন যেন হাতে যাদু আছে। একপদের খাওয়া, পাঁচ মিনিটে রান্না করে দেবেন। তাঁর রান্না আমার কাছে অমৃত!

আজকের ছবি 'ব্লোন অ্যাওয়ে'। অভিনয়ে টম লি জোন্স এবং জেফ ব্রিজেস। এই ছবিতে সবকিছু আছে। চোখ–ধাঁধানো অ্যাকশন এবং অভিনয় – তাও দর্শকের মনে ধরেনি। কথোপকথনের মধ্যে যেন কোনও আভ্যন্তরীণ প্রগতি নেই, পার্শ্বকাহিনি একদম কাজ করেনি। হে ভগবান, একটা খারাপ ছবি দাঁড় করাতেও কত না পরিশ্রম করতে হয়।

৬ আগস্ট ... আঠাশ দিন

''তাঁরা টাকাপয়সা নিয়ে এমন হালকাভাবে কথাবার্তা বলেন যেন তাদের কাছে টাকাপয়সা খুব একটা প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। কিন্তু সত্যি কথা হল, টাকাপয়সাই তাদের জীবনের মূল মন্ত্র। এইসব ধার্মিক লোকেরা মহালোভী, হিংসুটে এবং প্রতিশোধপরায়ণ জারজ সন্তান। অন্যসব ধান্দাবাজদের মতন। আপনি যেমন আপনার কাজের মাধ্যমে আপনার সন্তানদের মাধ্যমে, চিরকাল বেঁচে থাকতে চান, ঠিক সেরকম এসব লোকেরাও তাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের নাম চিরস্থায়ী করতে চান।'' ভোরবেলা ইউ জী আমায় এসব বললেন যখন আমি তাঁকে মনে করালাম যে বাঙ্গালোর থেকে স্বামীজি ফোন করেছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। ইউ জী তখন স্নান করছিলেন। ব্রহ্মচারী শিবরাম শর্মা, সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে 'স্বামীজি' বলে ডাকেন। একজন ধার্মিক ব্যক্তি। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত এবং অসাধারণ ধনসম্পদের অধিকারী এক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের মঠাধ্যক্ষ হওয়ার কথা ছিল এই স্বামীজির। ''আমি গত পাঁচদিন ধরে আপনার লেখা ইউ জী–র জীবনী, কানাড়া ভাষায় অনুবাদ করছি।'' খুব গর্ব এবং উৎসাহের সঙ্গে আমায় জানালেন। কারণ তিনি জানেন যে এই খবর আমায় যারপরনাই আনন্দ দেবে। সত্যি সত্যি আমার দারুণ আনন্দ হয়। আমি কোনওদিন ভাবতেই পারিনি আমার লেখা ইউ জী–র জীবন কথা একদিন তেলেগু, হিন্দি, কানাড়া এবং চীনা ভাষায় অনুবাদ হবে। পরে স্বামীজি আবার টেলিফোন করলেন। ইউ জী–র সঙ্গে টাকাপয়সার ব্যাপারে পরামর্শ করতে চান। তিনি তার টাকাপয়সা নিরাপদ জায়গায় ইনভেস্ট করতে চান, যাতে ভবিষ্যতে কোনওরকম সমস্যায় না পড়েন। স্বামীজির বয়স হয়েছে, আর পাঁচজনের মতনই তিনি নিশ্চিন্ত হতে চান যেন বৃদ্ধ বয়সে বেঁচে থাকার মতো রোজগার থাকে।

ইউ জী বললেন, তিনি যেন সব টাকাপয়সা ভ্যালেন্টাইন মডেল স্কুলে ইনভেস্ট

করেন এবং ইউ জী ব্যক্তিগতভাবে কথা দিলেন যে তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করবেন যেন স্বামীজি যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা করে পাবেন। ‘‘আপনি যখন মারা যাবেন আপনার মৃতদেহ আমরা কিন্তু আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেব। কোনওরকম ধার্মিক অনুষ্ঠানের তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা আপনার মৃতদেহকে সৎকার করার দায়িত্ব নিতে পারব না। আমরা আপনার মৃতদেহ এমন জায়গায় ফেলে দেব যেখানে পোকামাকড় মহাভোজ করতে পারে। আপনার নশ্বর দেহ পেয়ে তারা মহানন্দে কিছুদিন খাওয়া–দাওয়া করবে।’’ ইউ জী রসিকতার সঙ্গে সাবধান করে দিলেন।

এলেন কৃষ্টাল আমার একদম মুখোমুখি বসে তার আধ্যাত্মিক জীবনের স্মৃতি মন্থন করলেন। ডা ফ্রি জন বলে স্বয়ং নির্বাচিত আমেরিকান অবতারের ‘দিব্য উপস্থিত থাকার গল্প’। খাদ্য এবং যৌন সহবাসের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প এবং অবশেষে গুরুর সঙ্গে রসহীন যৌনমিলনের কাহিনি শোনালেন। সেই আকর্ষণীয় অবতার ভক্তদের উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে নিজেকে অনেক নিচে নামিয়ে এনে, আধ্যাত্মিকতার পথে অনেক এগিয়ে থাকা বাছা বাছা কিছু মহিলা ভক্তের সঙ্গে তান্ত্রিক মতে যৌন সহবাস করতেন। এলেন আরও বললেন যে, ভগবান ডা ফ্রি জনের মতে সেই মিলন ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে নৈসর্গিক বন্ধনের সম্পর্ক স্থাপন করত। তার জীবনের ঘটনাগুলো আমাদের যেন খুব কাছ থেকে দেখায় ধার্মিক ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে দিব্য–প্রেমের নামে কি ধরনের প্রতারণা চলে এবং মানুষকে কেমন করে অসৎভাবে ব্যবহার করা হয়।

‘‘এই পৃথিবী ভগবান রজনীশের মতো এত বড় বেশ্যাবাড়ির দালাল কোনওদিন দেখেনি, আর কোনওদিন দেখবেও না। বেশ্যাবাড়ির দালালরা অন্তত ছেলেদের টাকা নিয়ে মেয়েদের টাকাটা দেয়। তারা সেই টাকার থেকে যা কিছু পায় তা দিয়ে জীবন ধারণ করে। কিন্তু রজনীশ ছেলেদের থেকে টাকা নিয়েছে, মেয়েদের থেকেও টাকা নিয়ে সব টাকা আত্মসাৎ করেছে।’’ যেসব রজনীশ ভক্তরা ইউ জী–কে দেখতে এসেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে ইউ জী এই আক্রমণাত্মক শব্দবাণ চালালেন।

‘‘আমি মহেশকে ধ্বংস করে দেব। তাকে বলবেন আমার কাছে এসে নিজের হাতে যেন মালাটা ফেরত দিয়ে দেয়। এটা একটা অসম্ভব বিশ্বাসঘাতকতা। এ কাজ তার করা উচিত হয়নি। আমি তার জন্য কতই না পরিশ্রম করেছি ...,’’ সেই

১৯৭৮ সালে আমার অভিনেতা বন্ধু বিনোদ খান্নাকে এই কথা বলেছিলেন ভগবান রজনীশ। আমি তখন রজনীশ আশ্রমের সন্ন্যাসী। ভগবানের নিজের হাতে পরিয়ে দেওয়া মালা পায়খানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে, তাকে পরিত্যাগ করার খবর তিনি কিছুতেই হজম করতে পারছিলেন না। কেন তিনি সমানে বক্তৃতা দিতেন শর্তহীন প্রেমের উপর, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তার আচরণ ছিল আর পাঁচজন ধাক্কা-খাওয়া প্রেমিকদের মতনই। ''রজনীশের ফাঁপা হুমকি আপনাকে ধ্বংস করে দেবে, অবশ্যই কাজ করেনি। আপনি এখনও বহাল তবিয়তে আছেন। আর তিনি মরে ভূত হয়ে গেছেন।'' ধার্মিক লোকদের সম্পর্কে কথার শেষে বললেন ইউ জী।

লুসানে পিৎজা পাওয়া যায় এমন রেস্টুরেন্ট খুঁজতে খুঁজতে আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। আজ রবিবার শহর একদম ফাঁকা। ''সব ম্যাপ পুড়িয়ে ফেলুন। হারিয়ে গেলে ক্ষতি কি? আপনি ঠিক যে পথে এসেছেন সে পথে ফিরে যেতে পারবেন। আপনি ঠিক রাস্তায় যাচ্ছেন কিনা এই দুশ্চিন্তা আপনাকে বারবার ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। দু'চোখ খোলা রেখে দেখুন! অত ভাববার দরকার নেই!'' বললেন ইউ জী, যদিও তিনি ভালো করে জানেন যে পলের মাথায় তাঁর কথা ঢুকছে না। এই কথোপকথন পল সেমপের এবং ইউ জী-র মধ্যে গত কয়েক বছর ধরে চলে আসছে। অবশেষে ইউ জী-র কুকুরের মতো স্মরণশক্তি আমাদের রাস্তা বার করে দিল।

অতীতকে মনে রাখার জন্য নথিভুক্ত করার স্পৃহা মানুষ হয়তো সবসময় অনুভব করেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে গুহার অভ্যন্তরে বাইসনের ছবি হয়তো মানব সভ্যতার প্রথম দিনলিপি। একবার ভেবে দেখুন, আমরা কাগজের উপর কিছু সংকেত বিশেষ নিয়মে তুলে ধরি আর সেসব দেখে হাজার বছর পরে ভিন্ন সভ্যতার ভিন্ন দেশের মানুষ আমাদের গভীর চিন্তাভাবনাগুলো জানতে পারবে। মানুষের লেখা সময় এবং দূরত্বের সীমা অতিক্রম করে যায়। এমনকী মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করে অধিষ্ঠান করে।

৭ আগস্ট ... উনত্রিশ দিন

সমাপ্তি – যাওয়ার সময় হয়েছে। আমার ব্যাগ গোছানো শেষ হয়ে গেছে। আগামীকাল লন্ডনের দিকে রওয়ানা দেব। ঘুমোনোর চেষ্টায় আমি বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। ঘুমোতে পারলাম না। গভীর রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে

এসে চাঁদের আলোয় আলোকিত আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। অবিদিত একটা প্রশ্ন যেন আপনগতিতে আমার মধ্যে সংগঠিত হতে লাগল। বর্তমানে আমি কে? একমাস আগে আমি বলে যে লোকটা এখানে এসেছিল তার থেকে আমি কি কোনওভাবে পৃথক? এখানে বসে আমার স্বয়ংক্রিয় প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করলাম 'আমি' বলে জিনিসটা আমার জীবনের গল্পে চিরকাল অজানাই থেকে যাবে। বোম্বে ফিরে গিয়ে সেই কর্মময় জীবনের স্রোতে মিলতে হবে, যে সমস্ত কাজ করছিলাম সেসব মনে করতে গিয়ে মনে হল অনেক বছর আগের একটা শেষ না করা উপন্যাস আবার পড়তে চলেছি। আমাদের জীবনের গল্পের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়াটা যেন কত সহজ ব্যাপার! ইউ জী-র সঙ্গে সুইজারল্যান্ডে কাটানো হাজার টুকরো কাহিনি দিয়ে জোড়া ছবিটার দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হল যেন আমি কাহিনিগুলো আসল ছবি থেকে উঠিয়ে এনে আমার ইচ্ছেমতো নতুনভাবে জুড়ে দিয়েছি। একজন লেখক প্রকৃতভাবে নিজেকে খুঁজে পায় কোনওভাবে জীবনের আঘাতে বিধ্বস্ত হওয়ার পরে। গেস্টাডে এই তিরিশ দিন, তিরিশ রাত কাটাবার পরে আমি একটা জিনিস ভালো করে বুঝতে পারছি, আমার জীবনে আর কোনওকিছু আগের মতো লাগবে না। মানুষ অনেক পয়সা খরচ করে মৃত্যুর স্বাদ পেতে চায়। আকাশ থেকে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া (স্কাই ড্রাইভিং), বাঙ্গিং জাম্পিং (কোমড়ে দড়ি বেঁধে ব্রিজের উপর থেকে ঝাঁপ দেওয়া), তারপর অ্যামিউসমেন্ট পার্কে নানারকম দমবন্ধকরা রাইড চড়া, মানুষ এসব করে নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সজাগ করতে চায়, যাতে করে জীবনের মূল্যকে বুঝতে পারে। দুঃসাহসিক ছবি বা উপন্যাস অত্যন্ত জনপ্রিয় কারণ আমরা অনেক কম ঝুঁকি নিয়েও ওই সমস্ত কাহিনির নায়ক-নায়িকার সঙ্গে একাত্ম বোধ করি, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মৃত্যুর এবং পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতা লাভ করি।

ইউ জী আমার জীবনের নায়ক। ইউ জী-র সঙ্গে সময় কাটাতে আসার কারণ হয়তো আমি কোনওভাবে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে চেয়েছি। আবার পুনর্জন্ম লাভ করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে সমস্ত অগ্নিপরীক্ষা অতিক্রম করে আসাটা যেন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে বাড়িতে ফিরে আসার মতন। আমি ইউ জী নামের এক বিশাল ব্যক্তিত্বের কাঁধে চড়ে যে পৃথিবীর এক ঝলক দেখতে পেয়েছি তা ভয়ংকর সুন্দর। এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব যাকে সবাই

ইউ জী বলে, তাকে আমি গত আঠারো বছর ধরে চিনি। আজ পর্যন্ত কোনওদিন আমি এমন অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করিনি যা এবার গ্রীষ্মে তাঁর উপস্থিতিতে উপলব্ধি করলাম। ইউ জী-র উপস্থিতি তাঁর আশপাশের মানুষের মধ্যে শারীরিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। একদিন নিস্তব্ধ সন্ধ্যাবেলায় একা একা যখন তাঁকে শারীরিক অভিজ্ঞতার কথা বললাম, তিনি উত্তরে বললেন, ''অযথা কুহেলিকা রচনা করবেন না যেন ...।'' আমি নিজের কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম কোনওদিন করব না। কিন্তু আমাদের মতো লোকেরা যারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্যোগময় দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার কাহিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, তখন শুরু হয় গল্প-বলা!

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গ্রীষ্মের ছুটির শেষে ফেরার সময় স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে উপহার আনে, তার কারণ হল একদিকে মনে করতে পারবে ভ্রমণের কথা এবং অন্যদিকে বন্ধুবান্ধবদের দেখাতে পারবে যে মহিমান্বিত ভ্রমণের জায়গায় নিজে গিয়েছিল। একটা প্রচলিত রূপকথার গল্পে দেখা যায় যে যাদুর দেশ থেকে কোনও জিনিস এনে কাউকে দেখাতে গেলে সেটা নাকি উবে যায়। কোনও পর্যটক যখন রূপকথার দেশ থেকে একবস্তা স্বর্ণমুদ্রা জিতে এনে সাধারণ জগতে খুলে দেখাতে যাবে তখন হয়তো দেখা যাবে যে এক বস্তা শুকনো পাতা পড়ে আছে। যাতে সাধারণ লোক বিশ্বাস করে যে পর্যটক স্বপ্ন দেখছিল। শুধু পর্যটক জানে যে তার অভিজ্ঞতা সত্যি ছিল। সমস্ত গভীর অনুভূতিলব্ধ আবেগে আপ্লুত অভিজ্ঞতাগুলো অন্যকে বোঝানো অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, এমনকী প্রায়শই নিজেকেও বোঝানো যায় না।

৮ আগস্ট ... তিরিশ দিন

''ভারতের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আপনারা একটা বড় থালায় সাজানো স্বাধীনতা পেয়েছেন। ভারতীয়রা এর জন্য সেরকম রক্তপাত করেনি। আপনারা ভাবেন যে আপনাদের দেশ মুক্ত হয়েছে। কারণ আপনাদের নেতারা বড় বড় বক্তৃতা দিয়েছে বলে? আসলে তা নয়, আপনাদের হিটলার এবং জার্মানিকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। রণক্লান্ত ইংরেজ যোদ্ধাদের পক্ষে উপনিবেশগুলো ধরে রাখা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সুতরাং ভারতকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এমনকী মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের তাদের বর্তমান ভালো অবস্থার জন্য হিলটারকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাবসা তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু যা হয়েছে তা যথেষ্ট হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে অশুভ জোট বেঁধে সারা পৃথিবীকে বহুদিন ধরে দাবিয়ে রেখেছে। তাদের এসব কাজকর্মের রাস্তা বন্ধ হওয়া দরকার এবং আমার দুশ্চিন্তা হল এই কাজ শুধুমাত্র করতে পারবে ইসলামে অন্ধবিশ্বাসী দেশগুলো এবং চীন,'' বললেন ইউ জী।

''ভারতবর্ষের ব্যাপারটা আমি ঠিকমতো জানি না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্য দেশগুলোর সম্পর্কে তিনি যা বললেন তা সত্যি। আমাকে কিন্তু মুখ বন্ধ রেখে বাস করতে হবে। এসব ভয়ানক বিধ্বংসী কথাবার্তা। আমার চাকরি চলে যাবে। এবং আমার দেশে যদি আমি এইসব বলি তাহলে আমাকে জেলে বন্দি করে দেবে...'' এইসব কথা বললেন জিম নামে এক ভদ্রলোক। তিনি আমেরিকান ইহুদি সম্প্রদায়ের এবং ইউরোপে চাকরি করেন। আমি যখন ইউ জী–কে প্রশ্ন করেছিলাম, ভারতের ভবিষ্যৎ কি, তার উত্তরে উপরোক্ত গভীর আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। যতই রাত নেমে আসছে ইউ জী আমাদের করুণ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর আলোকপাত করতে লাগলেন – পৃথিবী যার সম্মুখীন হচ্ছে। এসব আলোচনা আমায় নিদারুণ হতাশার কর্দমাক্ত ভূমিতে শয্যাশায়ী করে দিল।

'চায়না টাউন' ছবির কথোপকথন লিখেছেন রবার্ট টাউন, তার মতে লেখা জিনিসটা একভাবে অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলো বাইরে ফেলে দেওয়ার মতন। যেই মুহূর্তে আপনি কোনও অভিজ্ঞতা ভেতর থেকে বাইরে আনলেন, সেই মুহূর্তে তা শেষ হয়ে গেল। একবার অভিজ্ঞতাকে বাস্তবায়িত করা মানে তা অনুশীলনের পর্যায়ে চলে গেল। আর ব্যক্তিগত বলে কিছু রইল না। আপনি তাকে পরিত্যাগ করে দিয়েছেন। ঝিনুকের গর্ভে যদি কোনওভাবে একদানা বালুকণা চলে যায় তাহলে ঝিনুকের প্রতিক্রিয়া হল লালা দিয়ে বালির চারিধারে ক্রমাগত স্তর নির্মাণ করা। কালে কালে সেই বালুকণা এক অতি মনোরম মুক্তায় পরিণত হয়। মুক্তার সৌন্দর্যে ঝিনুকের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই, সে চায় যন্ত্রণার উৎস সেই মুক্তাকে পরিত্যাগ করে দিতে।

''বিদায় বার্তা গ্রহণ করার জন্য আপনি কি প্রস্তুত?'' গাড়ির সামনের সিটে

বসে ঝুঁকে সিটবেল্ট লাগাতে লাগাতে ইউ জী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ফিসফিস করে জানালাম, ‘‘আজ্ঞে হ্যাঁ!’’ তারপর ঝটপট করে একটা ছোট দিনলিপি বের করে তৈরি হয়ে গেলাম। উনি যা বলবেন সেসব লিখে রাখার জন্য।

‘‘মানবজাতি যতদিন পর্যন্ত এই নগ্ন সত্যকে মেনে না নিচ্ছে যে মানুষ কোনওভাবেই একটা সাধারণ মশা বা মেঠো ইঁদুরের থেকে এই প্রকৃতিতে অধিক প্রয়োজনীয় নয়,, ততদিন পর্যন্ত মানুষের ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর গতি নেই। এই ব্যক্তি যাকে ইউ জী বলেন, সে একটা সাধারণ প্রাণী, এর বেশি কিছুই না।’’

‘‘আমার মধ্যে যা ঘটে গিয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে আমার কোনও উন্নতি সাধন করা যাবে না এবং মানবজাতির মঙ্গলজনক কোনও ভাবনাকে উন্নীত করা যাবে না। আমি যা বলার চেষ্টা করছি তা মানুষের চিন্তার ভিত্তিমূলকে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে। কি করে মানুষের সৃষ্ট সমাজ এসবে আগ্রহী হবে? প্রকৃতি কোনও কিছুকে আদর্শ নমুনা বলে মনে করে না। যদিও আমি কোনও নির্ধারিত মন্তব্য রাখতে পারছি না, তবুও আমার বিশ্বাস আমার পক্ষে শারীরিকভাবেও ঠিক আমার মতো কিছু সৃষ্টি করা অসম্ভব। এই ব্যক্তির শুক্রাণু কোনও মহিলাকে গর্ভবতী করতে পারবে কি না তার কোনও সঠিক ধারণা আর সম্ভবপর নয়। আমার অবশ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদদের হাতে গিনিপিগ হবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কারণ আমাকে পরীক্ষা করে যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করবেন, তা দিয়ে জীবনকে ধ্বংসের কাজে লাগাবেন, এতে আমার কোনও সন্দেহ নেই। যা কিছু তাঁরা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছেন তার উপযোগে এখনও প্রত্যেকে যে সহজাত প্রতিভা এবং বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় সেটা বুঝতে কোনও সাহায্য করে না। যা কিছু তারা করে সেসব মানুষের সহজাত রোগ নিবারণের ক্ষমতাকে সত্যি কমিয়ে দেয়। সে যাই হোক, এই শরীরটার যখন মৃত্যু ঘটবে তখন প্রকৃতি একে কাজে লাগিয়ে দেবে নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য। যেরকম বাগানের শামুক মরে গেলে জমি উর্বর হয়, ঠিক সেরকমভাবে। সংক্ষেপে এই শরীরটা আর সব প্রাণীর মতো পচতে থাকবে।’’

ইউ জী কৃষ্ণমূর্তির অহম-বিধ্বংসী প্রক্রিয়া এমন সার্বিক যে আমার হাড়মজ্জায় কাঁপুনি ধরে যায়। তাঁর অবয়ব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। দেখি পূর্ণ চন্দ্রিমা অন্ধকার শীতল আকাশের দিকে সবে উঠতে শুরু করেছে।

আজ নতুন ভোরের আলোয় আকাশ ঝকঝক করছে। আমরা বর্তমানে জেনিভা থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। হঠাৎ ইউ জী আমাদের দিকে ঘুরে তাকালেন। ভোরের আলোর সোনালী আভায় তাঁর মুখ যেন দিব্যজ্যোতিতে ভরে গেল। আমরা সূর্যমুখী ফুলের বিশাল মাঠের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ইউ জী বলে উঠলেন, ‘‘আমি, বব এবং পলকে গেস্টাডে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেছি। ওরা এখানে থাকতে থাকতে তাদের পরস্পরের জীবনের পথে চলার ব্যাপারটা যেন ভালো করে বুঝে নিতে পারে, এই আমি চাই। তাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে এটা পরিষ্কার। আমি চাই সেই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হোক। আমি আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহারিক দিক দিয়ে হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারি।’’ ইউ জী বন্ধুদের জন্য যে উদ্বিগ্ন সেটা তাঁর কর্মপ্রচেষ্টায় দেখা যায়, তাঁর কথাবার্তায় পাওয়া যায়। একথা কখনই বিশ্বাস করবেন না তিনি যখন বলেন, ‘‘আপনি বিপদে পড়লে আমি কড়ে আঙুলটাকে তুলবো না, আপনি নরকে পচতে থাকলেও আমার কিছু যায় আসে না...,’’ এটা সর্ম্পূণ মিথ্যা কথা। আমার জন্য এমন উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো ব্যক্তি আমার জীবনে কোনদিনও আসেননি।

ইমিগ্রেশন অতিক্রম করছি আর ইউ জী–র সঙ্গে গেস্টাডে কাটানো অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে এক অসাধারণ স্বাদ উপভোগ করছি। হঠাৎ ইউ জী–র গলার স্বর আমার মধ্যে জেগে উঠল, ‘‘সমস্ত অভিজ্ঞতা সে যতই অসাধারণ হোক না কেন, জীবনের থেকে আপনাকে পৃথক করে দেয়। আপনি কোনওদিন জানতে পারবেন না জীবন কি – কোনওভাবেই না...।’’ আমার প্লেনটা জেনিভা এয়ারপোর্ট থেকে লন্ডন অভিমুখে রওয়ানা দিল, আমি আবার সেই একগাদা প্রাচীন প্রশ্নের মধ্যে হারিয়ে গেলাম, বাচ্চাদের মতন। জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, ‘‘আমি কে? কোথা থেকে আমি এসেছি? আমি মরে গেলে আমার কি হবে? এসবের অর্থ কি? কোথায় আমি সত্যি মানানসই? আমি কোথায় যাচ্ছি? – বাড়ি, মূর্খ! বাড়ি।’’